প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমুহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনও শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক— অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই, ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

Ì Óôìøô ‘õ¿’ ™Û ÐWë ¼ëôìë

উপাচার্য

তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ ঃ ফেব্রুয়ারি, 2013

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance
of the Distance Education Council, Government of India.

NSOU

পরিচিতি

বিষয় ঃ সহায়ক প্রাণীবিদ্যা **স্নাতক পাঠক্রম**

পাঠক্রম ঃ SZO—2
পর্যায় ঃ 01
একক ঃ 1, 2 এবং 3

	রচনা	**সম্পাদনা**
একক- 1	শ্রীমতী শান্তা আদক	ড. বুধদেব মান্না
একক- 2	শ্রীমতী মৌসুমী দাস	ড. বুধদেব মান্না
একক- 3	শ্রীমতী পাপিয়া দাস	ড. বুধদেব মান্না

ঘোষণা

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) দেবেশ রায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

SZO — 02

পর্যায় — 1

(ট্যাক্সোনোমি, পরিস্ফুরণ জীববিদ্যা, কলাসংস্থান ও জৈব রসায়ন)

একক—1 ❑ ট্যাক্সোনোমি ও পরিস্ফুরণ জীববিদ্যা

1.1 ❑ ট্যাক্সোনোমি ও সিস্টেমেটিক্স 7- 22
1.2 ❑ পরিস্ফুরণ জীববিদ্যা 23- 43
1.3 ❑ ক্লিভেজ ও গ্যাস্ট্রুলেশন 44- 61
1.4 ❑ মুরগির ভ্রূণঝিল্লি ও খরগোসের অমরা 62- 77

একক—2 ❑ কোষ-জীন বিজ্ঞান ও অনুকোষ বিজ্ঞান

2.1 ❑ প্লাজমা পর্দা 78- 86
2.2 ❑ মাইটোকনড্রিয়ার গঠন এবং কার্য 87- 97
2.3 ❑ ক্রোমোজোমের গঠন 98- 108
2.4 ❑ DNA এবং RNA-এর রাসায়নিক গঠন 109- 124
2.5 ❑ ড্রসোফিলা ও মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ 125- 134
2.6 ❑ থ্যালাসেমিয়া 135- 138
2.7 ❑ পরিব্যক্তি বা মিউটেশন 139- 147

একক—3 ❑ কলাসংস্থান ও জৈব রসায়ন

3.1	❑	প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য	149
3.2	❑	পিট্যুইটারী ও থাইরয়েড গ্রন্থির কলা— শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য এবং এদের দ্বারা নিঃসৃত হরমোনগুলির কার্যকারিতা	149- 156
3.3	❑	শ্বসনে হিমোগ্লোবিনের কার্যকারিতা	156- 159
3.4	❑	ABO রক্ত শ্রেণি ও Rh ফ্যাক্টর	159- 163
3.5	❑	স্নায়ু ও স্নায়ুসন্নিধির মধ্য দিয়ে উদ্দীপনা	163- 170
3.6	❑	সারাংশ	170- 171
3.7	❑	সর্বশেষ প্রশ্নাবলী	171
3.8	❑	উত্তরমালা	171

একক 1 ❑ ট্যাক্সোনোমি ও পরিস্ফুরণ জীববিদ্যা (Taxonomy and Embryology)

একক 1.1 ❑ ট্যাক্সোনোমি ও সিস্টেমেটিক্স—সংজ্ঞা, প্রাণী নামকরণের নীতিসমূহ, ট্যাক্সোনোমির স্তর, প্রজাতি ধারণা

গঠন

1.1.0 প্রস্তাবনা
1.1.1 উদ্দেশ্য
1.1.2 ট্যাক্সোনোমির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
1.1.3 ট্যাক্সোনোমির সংজ্ঞা ও তার ব্যাখ্যা
1.1.4 সিস্টেমেটিক্স (Systematics)
  1.1.4.1 সিস্টেমেটিক্স ও শ্রেণীবিন্যাস
  1.1.4.2 পপুলেশন সিস্টেমেটিক্স
1.1.5 প্রাণী নামকরণের নীতিসমূহ
  1.1.5.1 নামকরণ সংক্রান্ত মুখ্য বিষয়
    1.1.5.1.1 নিয়মগুলি প্রধান বৈশিষ্ট্য
    1.1.5.1.2 প্রাণী নামকরণের আন্তর্জাতিক কমিশন (International Commission on Zoological Nomenclature)
    1.1.5.1.3 প্রাণী নামকরণের আন্তর্জাতিক কোড (International Code of Zoological Nomenclature, ICZN)
    1.1.5.1.4 আন্তর্জাতিক প্রাণীবিজ্ঞান মহাসভা (International Congress of Zoology)
1.1.6 ট্যাক্সোনমির স্তর
1.1.7 প্রজাতি ধারণা (Species concept)
  1.1.7.1 প্রজাতির সংজ্ঞা
  1.1.7.2 বিভিন্ন প্রকার প্রজাতি ধারণার ব্যাখ্যা
    1.1.7.2.1 জাতিরূপভিত্তিক প্রজাতি ধারণা (Typological Species Concept)
    1.1.7.2.2 নামবাদভিত্তিক প্রজাতি ধারণা (Nominalistic Species Concept)
    1.1.7.2.3 জৈবিক প্রজাতি ধারণা (Biological Species Concept)
  1.1.7.3 প্রজাতির পপুলেশন সংক্রান্ত সংজ্ঞা
1.1.8 সারাংশ
1.1.9 প্রশ্নাবলী
1.1.10 উত্তরমালা

1.1.0 প্রস্তাবনা

পৃথিবীতে জীব সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবধি কোটি কোটি রকমের জানা ও অজানা প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে। তার বহু অংশ বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের অনেকটাই বর্তমান প্রাণীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এদের ঠিকমত নামকরণ না হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞানসাধনা শুরু হতে পারে না। ওইসব প্রাণীদের অস্তিত্ব পাওয়া যায় জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে— এরা রয়েছে হিমশীতল মেরু অঞ্চলে ও উষ্ণ মরু অঞ্চলে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এদের জীবনের বিভিন্ন দিক জানা যায় এবং কিভাবে জীবন এইসব কঠিন বাধা অতিক্রম করে পৃথিবীতে বেঁচে রয়েছে তার গবেষণা করা যায়। এই গবেষণা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানব ও অন্যান্য জীবের কল্যাণে সহায়ক হয়। যেহেতু জীবের প্রকারভেদে পরীক্ষার ফলাফল ভিন্ন হয়, তাই গবেষণার শুরুতেই প্রয়োজন প্রাণীটির প্রকৃত পরিচয়। ট্যাক্সোনোমি বিজ্ঞান তাই এত গুরুত্বপূর্ণ।

বহু প্রাচীন কাল থেকে পৃথিবীর জীব ও অজীব বস্তুর বৈচিত্র্য মানুষকে কৌতূহলী করেছে। তার আশেপাশের সব কিছুর পরিবর্তনের কারণ খুঁজে তার যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা তৈরী করেছে। সময়ের সাথে ও পরবর্তী নানা পরীক্ষার ভিত্তিতে সেইসব ব্যাখ্যার কিছু পরিবর্তনও হয়েছে। এইভাবে ট্যাক্সোনোমি বিজ্ঞানও গড়ে উঠেছে।

যেহেতু আজকের পৃথিবী কোটি কোটি বৎসর ধরে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, তাই বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন কারণে বহুবিধ প্রাণীর বিকাশ ও পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং প্রাণীকূলের বিবর্তনের ইতিহাসের মধ্যে পুরোনো না-দেখা পৃথিবীর কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীদের নিরন্তর সাধনার ফলে প্রাণীবৈচিত্র্যের কারণ জানা যায়, তাদের মধ্যে মিল-অমিল খুঁজে পুর্বপুরুষের গঠন বৈচিত্র্য ও আরও পূর্বেকার প্রাণী ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায়।

1.1.1 উদ্দেশ্য

প্রাণীবিজ্ঞানের এই শাখায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যায় ঃ

- পৃথিবীতে যেসব প্রাণীর অস্তিত্ব আছে বা ছিল, তাদের নামকরণ করার নিয়ম।
- এইসব প্রাণীর সনাক্তকরণ ও তার প্রয়োজনীয়তা
- শ্রেণীবিন্যাসের পদ্ধতি ও নিয়মসমূহ
- প্রাণীবৈচিত্র্য ও তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক ও বিবর্তনের গতি-প্রকৃতি।

1.1.2 ট্যাক্সোনোমির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বর্তমানে মানুষ খুব সহজেই সব জায়গার সাথে মুহূর্তে যোগাযোগ করতে পারে এবং সহজেই সেখানে পৌঁছাতে পারে। একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, প্রথমদিকে মানুষ প্রকৃতিকে জানা অদম্য কৌতূহলে সহজে স্থানান্তর গমন করতে পারতো না। সে তার ব্যাখ্যা, বর্ণনা, মন্তব্য সব লিপিবদ্ধ করে বহু কষ্ট স্বীকার করে পর্যটনের মাধ্যমে পৃথিবীর অন্য জায়গায় পৌঁছে দিত। প্রকৃতিবিদ্‌গণ নানা দেশ ঘুরতেন ও গবেষণা করতেন। দেখা গেছে একই প্রাণীর পরিচয় স্থানান্তরে ভিন্ন হয়ে গেছে। তারা প্রাণীর শ্রেণীবিন্যাস করতে গিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক প্রাণীকে একই দলভুক্ত করেছেন। এইসব অসুবিধা দূর করতে বিজ্ঞানীগণ প্রাণী নামকরণের বিজ্ঞানভিত্তিক রূপরেখা তৈরীতে সচেষ্ট হলেন।

যে সমস্ত প্রাচীন মনীষীগণ শ্রেণীবিন্যাস ও নামকরণের সূচনা করেছিলেন তাঁরা হলেন থিওফ্রেসটাস (370-285 BC), অ্যারিস্টটল (384-322 BC), জন রে (1627 - 1705), লিনিয়াস (1707-1778), ক্যানডোল (1813), বেন্থাম ও হুকার (1862-1883) প্রভৃতি। ক্যানডোল ট্যাক্সোনোমি কথাটি প্রদান করেন। এর পরবর্তী সময়ে মায়ার (1953, 1969), সিম্পসন (1901) এই পদ্ধতি ও নীতির বিশদ্ আলোচনা এবং দুরূহ অংশগুলির ব্যাখ্যা দেন।

বিজ্ঞানভিত্তিক নামকরণের ও শ্রেণিবিন্যাসের কাঠামো তৈরী হওয়ার পর এর জনপ্রিয়তা বেড়ে যায় এবং বিষয়টি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে।

1.1.3 ট্যাক্সোনোমির সংজ্ঞা ও তার ব্যাখ্যা

বিভিন্ন পুস্তকে এই সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে পাওয়া যায়। মায়ারের (1969) দেওয়া সংজ্ঞা সর্বোৎকৃষ্ট। এটি এইরূপ 'জীবসমূহের, শ্রেণীবিন্যাসের তত্ত্ব ও প্রয়োগবিধি হল ট্যাক্সোনোমি'।

শ্রেণীবিন্যাসের তত্ত্ব বলতে বোঝায় সেই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানার্জন যার দ্বারা প্রাণীগোষ্ঠীকে বিভিন্ন দিক থেকে জানা যায়। যথা, একটি প্রাণীতে কি কি বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে এবং কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যের জন্য এটি অন্যদের থেকে পৃথক; কোনগুলি পূর্বপুরুষে ছিল এবং কোনগুলি নতুন (গৌণ বা প্রাথমিক), অভিযোজন বা বিবর্তনের সাথে কোনগুলি জড়িত। এসবের ভিত্তিতে প্রাণীর শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। পূর্বেকার শ্রেণীবিন্যাসে প্রাণীর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ট্যাক্সোনোমি করা হত। বর্তমানে এর সাথে যুক্ত করেছে— অঙ্গসংস্থান সম্বলিত তথ্য, বাস্তুতান্ত্রিক, জৈবরসায়নগত, জীবাশ্মগত, জনগত, ব্যবহারগত এবং জীনগত বৈশিষ্ট্যসমূহ। অসুবিধার কথা এই যে সমস্তদিক বিবেচনা করে সব সময় সব প্রাণীর ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। সূক্ষ্মতর এবং নির্ভুল শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে তাই এইসব প্রাণী অনেক সংখ্যার দরকার। কিন্তু সংরক্ষিত ও কমসংখ্যক প্রাণীর ক্ষেত্রে এই অসুবিধা থাকছে।

1.1.4 সিস্টেমেটিক্স

প্রাণীবিজ্ঞানের এই শাখায় জীবের প্রকারভেদ ও বৈচিত্র্য নিরূপণ করা এবং জীবসমূহের সর্বপ্রকার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় (Simpson, 1961) এককথায়, এটি হল প্রাণীবৈচিত্র্যের গবেষণা।

ট্যাক্সোনোমি ও সিস্টেমেটিক্স এর পার্থক্য হল এই যে, ট্যাক্সোনোমি হল গোড়ার কথা এবং এর ভিত্তিতে সিস্টেমেটিক্সে আসা যায়। প্রথমটি নতুন প্রজাতির বর্ণনা, নামকরণ ও শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। পরবর্তীকালে আন্তঃপ্রজাতি সম্পর্কের ভিত্তিতে বিবর্তনগত ব্যাখ্যা করা হয়। কার্যক্ষেত্রে বহু বিজ্ঞানী এই দুটিকে সমার্থক করেছেন। এই দুটির পার্থক্য উল্লেখ করে হক্সওয়ার্থ ও বিসবি (Howksworth and Bisby, 1988) র মতে ট্যাক্সোনোমির পরিধি নতুন প্রজাতির নামকরণ ও বর্ণনা পর্যন্ত। অন্যদিকে সিস্টেমেটিক্সে প্রথাগত ট্যাক্সোনোমিসহ অভিব্যক্তি তত্ত্ব ও এর ব্যবহারিক বিষয়গুলি, জীনতত্ত্ব ও প্রজাতির উদ্ভব (speciation) এই সব অন্তর্ভুক্ত হবে। এইভাবে প্রাণীর জাতিজনিবিদ্যা (phylogenetics) সিস্টেমেটিক্সের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়।

1.1.4.1 সিস্টেমেটিক্স ও শ্রেণীবিন্যাস

সিস্টেমেটিক্সের আলোচনায় অপরিহার্যভাবে শ্রেণীবিন্যাসের কথা এসে যায়। শ্রেণীবিন্যাসের (Classifica-

tion) শুরু ট্যাক্সোনোমির শুরু থেকে এবং এটি বহু পথ অতিক্রম করেছে। বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে ষাটের দশকে এর দুটি শাখা পৃথকভাবে গড়ে উঠেছে। একটি হল স্নিথ ও শোকল (Sneath and Sokal, 1973) এর ফেনেটিক্স (Phenetics)। পূর্বে এটিকে সংখ্যাভিত্তিক (numerical) ট্যাক্সোনোমি বলা হত। অন্য শাখাটি প্রায় একই সময়ে গড়ে উঠেছিল এবং এটি হেনিগ এর (Hennig, 1950, 1957, 1975) ক্ল্যাডিজ্‌ম (Cladism)। এই দুটি ছাড়াও বিবর্তনগত সিস্টেমেটিক্স ও জাতিজনিত সিস্টেমেটিক্স কথাদুটিও প্রচলিত ছিল। এই সবগুলির পার্থক্য, গুণাগুণ ও পরে করা হয়েছে।

1.1.4.2 পপুলেশন সিস্টেমেটিক্স

ট্যাক্সোনোমি অথবা সিস্টেমেটিক্সের সাথে পপুলেশনের যে নিবিড় যোগ আছে তা বর্তমান যুগে অধিকতর বিচার্য বিষয় বলে গণ্য হয়েছে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে ওই বিষয়ে চিন্তাধারা ডারউইনের আগের যুগেও ছিল।

প্রতিটি প্রজাতির একাধিক পপুলেশন গোষ্ঠী থাকে। এদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই এমন পরিমাণে পার্থক্য থাকে যে প্রকৃতিবিদ্ এক একটিকে উপপ্রজাতি বলে গণ্য করতে চাইবেন। এইভাবে কোন প্রজাতির অধীনে একাধিক উপপ্রজাতি থাকে, তবে এটিকে পলিটিপিক (Polytypic) প্রজাতি বলা হয়। যদি না থাকে তবে মনোটিপিক (Monotipic) প্রজাতি বলে।

এই পলিটিপিক প্রজাতির ধারণা ট্যাক্সোনোমিকে এক নতুন আলোয় দেখতে শেখায়। এই ধারণার ফলে শ্রেণীবিন্যাস অতি সরল হয়েছে, সিস্টেমেটিক্সের অনেক প্রশ্নের সমাধান পাওয়া গেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই ধারণার জন্ম হয়।

বিজ্ঞানীগণ বুঝতে পারেন যে, প্রজাতি ট্যাক্সন বস্তুতপক্ষে ভৌগোলিক দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন পপুলেশনের সমষ্টি। ক্রমশঃ টাইপোলজিক্যাল প্রজাতি ধারণার অবলুপ্তি ঘটতে থাকে। ট্যাক্সোনোমি বিজ্ঞানী বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে নমুনা সংগ্রহ করতে থাকেন এবং একই সঙ্গে লক্ষ্য করতে থাকেন যে ঐসব বাস্তুতন্ত্রে পপুলেশনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এইগুলির সমন্বয়ে বিবর্তনের ব্যাখ্যা নতুনতর হল। এইভাবে পপুলেশন সিস্টেমেটিক্স জীববিজ্ঞানের এক প্রধান অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়।

চিরাচরিত লিনিয়াসের ট্যাক্সোনোমি থেকে সরে এসে পপুলেশন সিস্টেমেটিক্সের এই ধারণাকে হাক্সলে (Huxley, 1940) যে নতুন নামকরণ করলেন তা হল নব সিস্টেমেটিক্স, যার কিছু প্রাচীন লেখায় (প্রায় একশ পঞ্চাশ বৎসরের) পাওয়া গেছে।

উপপ্রজাতির সংজ্ঞা ও ব্যবহারিক সুবিধা ও অসুবিধা আছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, পলিটিপিক প্রজাতিগুলির মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় বৈচিত্র্য থাকে এবং বিজ্ঞানীগণের মধ্যে ঐ মাত্রা নির্ধারণের কোন মানদন্ড না থাকায় উপপ্রজাতি নির্বাচনের ভিত্তি অজানা। আবার দেখা যায় যে নিকট সম্পর্কবিশিষ্ট প্রজাতি, যাদের বাস্তুসংস্থানগত প্রয়োজন একই প্রকারের, তারা ভৌগোলিক দিক থেকে একে অপরকে প্রতিস্থাপিত করে। অথচ তারা উপপ্রজাতি নয়।

বিজ্ঞানী মায়ার (1964) নব সিস্টেমেটিক্সের বর্ণনায় এই কথাগুলি বলেছেন—

(a) ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যের সংখ্যার ব্যবহার ও তার ফলে শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কী (key) বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা হ্রাস।

(b) অতি সহজে গ্রহণযোগ্য নতুন বৈশিষ্ট্যের ব্যবহার, যেমন- প্রাণীর আওয়াজ, প্রজননকালের ব্যবহার, প্রোটিন বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও কম্প্যুটারের ব্যবহার।

(c) শ্রেণীবিন্যাস ধারণার ব্যাখ্যা, যথা— উপপ্রজাতিকে ক্যাটেগোরী (category) মর্যাদা দান, ট্যাক্সন ও ক্যাটেগরীর পৃথক করা এবং ট্যাক্সার (ট্যাক্সন এর বহুবচন) মিল অমিলের কারণ বুঝতে পারা।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে নব সিস্টেমেটিক্স ঠিক কোন নতুন পদ্ধতি নয়, বরং নতুন দৃষ্টিকোণ যার শুরু প্রাচীনকালে হয়েছিল।

1.1.5 প্রাণী নামকরণের নীতিসমূহ

প্রাণীনামকরণ ব্যতীত প্রাণীবিজ্ঞান অস্তিত্বহীন। নামকরণ করার সময় কয়েকটি নীতি ও নিয়ম মেনে চলতে হয়। পূর্বে প্রচলিত বেশ কিছু নিয়ম প্রাণীবিজ্ঞানের সদুদ্দেশ্যে পরিবর্তিত / পরিমার্জিত / সংযোজিত হয়েছে। নীতিগুলি সংখ্যায় অনেক হলেও প্রধান ও সরলগুলি এখানে আলোচিত হবে। অনেক সূক্ষ্মনীতি আছে যেগুলি শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানী গণের গবেষণায় ব্যবহৃত হয়। বিস্তারিত নীতিগুলি নিয়ে জেফ্রি (1989) আলোচনা করেছেন।

1.1.5.1 নামকরণ সংক্রান্ত মুখ্য বিষয়

নামকরণের নীতিসমূহ আলোচনার পূর্বে এগুলির বৈশিষ্ট্য, দ্বিপদ নামকরণের জন্য যে কমিশন ও তাদের কোড রয়েছে সেগুলি জানা প্রয়োজন।

1.1.5.1.1 নিয়মগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(a) অদ্বিতীয়তা (Uniqueness) : একই জাতীয় প্রাণীর একাধিক নাম বাতিল হয়ে শুধু একটিই গ্রাহ্য হবে। নামটি এমন হবে যে একটি প্রাণীর ক্ষেত্রে একবারই ব্যবহৃত হয়েছে।

(b) বিশ্বজনীনতা (Universality) : প্রতিটি নাম বিশ্বের বৈজ্ঞানিক দ্বারা স্বীকৃত একটি ভাষায় হবে। একটি প্রাণী বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায় পরিচিত হলেও তা বিজ্ঞানসম্মত নয়।

(c) অপরিবর্তনশীলতা (Stability) : যে কোন নামকরণ একবার হওয়ার পর আর পরিবর্তন হবে না। (বিশেষক্ষেত্রে কমিশনের ক্ষমতা ছাড়া)।

1.1.5.1.2 প্রাণী নামকরণের আন্তর্জাতিক কমিশন (International Commission on Zoological Nomenclature)

বিভিন্ন প্রাণীগোষ্ঠীর উপর যে সব খ্যাতনামা বিজ্ঞানী রয়েছেন, তাঁরা আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রেণীবিন্যাসের বিভিন্ন দিক গিয়ে আলোচনা করেন এবং মতামত দেন। এইভাবে কমিশন কাজ করে। এই কমিশন 1985 তে প্রাণী নামকরণের আন্তর্জাতিক কোড প্রকাশ করে।

1.1.5.1.3 প্রাণী নামকরণের আন্তর্জাতিক কোড (International Code of Zoological Nomenclature সংক্ষেপে ICZN)

কমিশনে গৃহীত কোডের বিশেষত্ব হল যে প্রত্যেক কোড অন্য সব কোড থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। যেমন, প্রাণীজগতে একটি গণ নাম একবারই ব্যবহৃত হবে।

কোডের ব্যবহারিক ও বিজ্ঞানগত কোন অসুবিধা থাকলে সেগুলি মহাসভায় (Congress) তুলে ধরা হয়।

1.1.5.1.4 আন্তর্জাতিক প্রাণীবিজ্ঞান মহাসভা (International Congress of Zoology)

প্রাণী নামকরণের আন্তর্জাতিক কোড প্রথম গৃহীত হয় পঞ্চম আন্তর্জাতিক প্রাণীবিজ্ঞান মহাসভায় (বার্লিন,

1901) এবং ষষ্ঠ মহাসভার (বার্লিন, 1904) পর প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এইরূপ মহাসভা অন্যান্য জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়।

কোডের বিভিন্ন অসুবিধাগুলি লণ্ডন মহাসভায় (1958) আলোচিত হয় এবং নতুন কোড (New Code) প্রকাশিত হয়।

এখানে মহাসভার (Congress) ক্ষমতা হল আইনগত বিচার করা ও রায় প্রদান করা। কোড এবং কমিশনের পরামর্শগুলি কংগ্রেসে ভোটের মাধ্যমে বিচার্য হবে।

1.1.5.2 নামকরণের প্রধান নীতিসমূহ

পঞ্চদশ আন্তর্জাতিক প্রাণীবিজ্ঞান মহাসভায় (London, 1958) গৃহীত আন্তর্জাতিক কোডের পরিমার্জিত সংস্করণ (1964) অনুসারে 86 টি আর্টিকল (Article), ভূমিকা ইত্যাদি রয়েছে। মুখ্য কয়েকটি কোড আলোচনা করা হল।

1.1.5.2.1 গ্রাহ্য নামকরণের শুরু ও স্বাধীনতা

লিনিয়াসের সিস্টেমা নাচুরীর দশম সংস্করণের (1758) পূর্বেকার সব নাম বাতিল হবে। পৃথিবীতে যে সব প্রাণী আছে বা ছিল শুধুমাত্র সেগুলির নামকরণ করা যাবে। কোন কল্পিত প্রাণী, সংকর প্রাণী বা অধো-উপপ্রজাতির (Infra-Subspecies) নাম দেওয়া যাবে না।

ওই নামকরণ পদ্ধতি অন্য যেকোনো নামকরণ পদ্ধতি থেকে পৃথক ও স্বাধীন হবে।

1.1.5.2.2 নামকরণে শব্দের ব্যাখ্যা

প্রজাতির নাম দ্বিপদ অর্থাৎ দুটি শব্দের হয়। একটি গণ নাম অন্যটি প্রজাতি নাম। সম্পূর্ণ নাম ইটালি সাইজে (italicise) করে অর্থাৎ বাঁকা হরফে হবে। হাতে লেখা বা সাধারণভাবে টাইপ মেশিনের লেখায় হলে তা আন্ডারলাইন করে দিতে হবে। গণ নামের প্রথম অক্ষর বড় হরফে (Capital letter) হবে। নামের বাকী অংশ সব ছোট হরফে হবে। দুটি শব্দের মধ্যে ফাঁক থাকবে।

প্রজাতির উপরের সবস্তরে নাম একপদের (Uninomial) হবে। কিন্তু উপগণ (Subgenus) ও উপপ্রজাতি (Subspecies) যুক্ত নামে তিনটি / চারটি শব্দ থাকে এবং এটি সম্পূর্ণায়িত করে লেখা হলে হবে এরকম ঃ

Genus (গণ)	**Subgenus (উপগণ)**	**Species (প্রজাতি)**	**Subspecies (উপপ্রজাতি)**	**Author (প্রণেতা)**	**Publication of the name (year) (প্রণয়ন সময়)**
ডেকাস	এফ্রোডেকাস	এবারেন্স	নাইগ্রিটাস	হার্ডি	১৯৫৫
Decus	Afrodacus	aberrans	nigritus	Hardy	1955

1.1.5.2.3 নামকরণের ভাষা, লিঙ্গ, পদ ও বচন

নামকরণের ভাষা ল্যাটিন অথবা ল্যাটিনের মত (Latinized)। গোত্র-নাম নামবিশেষ্য, গণ-নাম বিশেষ্য, কর্তৃকারকে একবচন এবং প্রজাতি নাম গণ নামের বিশেষণ ও লিঙ্গ অনুযায়ী হবে। গণ নাম ও প্রজাতি নাম এক হতে পারে। তবে নতুন নামকরণের ক্ষেত্রে না করা উচিত। একবার প্রকাশিত নাম কখনও বাতিল হবে না।

1.1.5.2.4 পূর্বিতার আইন (Law of Priority)

একই ট্যাক্সন যদি একাধিক বৈজ্ঞানিক নামে ব্যবহৃত হয় (তা একজন বর্ণিতই হোক বা একাধিকজন বর্ণিতই

হোক) ট্যাক্সনের প্রথম প্রকাশিত নামটিই গ্রাহ্য হবে (যতক্ষণ না কোড বা কমিশন বিশেষ বিচারে তা অগ্রাহ্য করে)। একনাম (Synonymy) বা সমনাম (Homonymy) উভয়ক্ষেত্রেই এই নিয়মানুসারে ত্রুটি সংশোধিত হয়। একনামের ত্রুটি (Errors of Synonymy) বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরে যদি কোন নাম সিনিয়র সিনোনিম (Senior synonym) হিসাবে অব্যবহৃত থাকে তবে বাতিল ধরা হবে (Nomenoblitumn) এবং এর জন্য কমিশনের রায় নিতে হয়।

স্তরের (Rank) পরিবর্তনে ট্যাক্সনের নামে পূর্বিতা আইনের পরিবর্তন হয় না।

একাধিক গণকে একত্র করে যে একটি গণ-নাম (Group name) হয়, বা ঐ গণগুলির মধ্যেকার সবচেয়ে প্রথম গণ নাম হয়।

1.1.5.2.5 সমনাম (Homonymy)

একই বানানে ও একই নামে যদি একই গণভুক্ত দুটি ভিন্ন প্রজাতির নামকরণ হয়ে থাকে, তবে পরে যে নাম হয়েছে, সেটি বাতিল হবে এবং পরের প্রাণীর নতুন নামকরণ করতে হবে।

1.1.5.2.6 প্রণেতার পরিচিতি

কমিশনের নিয়ম মেনে নামকরণ করলে প্রথম প্রণেতার নাম গ্রহণ করা হবে। কোন সভার গবেষণাপত্র প্রকাশের মাধ্যমে লেখক নতুন নামকরণ করলে, তিনি প্রণেতা স্বীকৃতির (authorship) অধিকারী হয়ে থাকেন। কোন সভাপতি, পত্রকার বা যারা নামকরণের জন্য গবেষণার কাজে যুক্ত নন তারা এই স্বীকৃতির অধিকারী নন।

প্রণেতার নাম ট্যাক্সন নামের অংশবিশেষ নয়। কিন্তু কোনরকম যতিচিহ্ন ছাড়াই ট্যাক্সন-নামের পরে প্রণেতার নাম লেখা হয়। ঐ ট্যাক্সনের উপর পরবর্তীকালে গবেষণা করেছেন এমন বৈজ্ঞানিকের নাম ট্যাক্সন নামের পর কোলন (ঃ) দিয়ে লেখা চলে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নামোল্লেখে লেখকের নামে শুধু পদবী or surname টুকুর উল্লেখ দরকার এবং তা বৈজ্ঞানিক নামাংকের মত বঙ্কিম ভঙ্গীতে নয়।

যদি প্রণেতার নাম ছাড়াই ট্যাক্সন নাম প্রকাশিত হয়ে থাকে এবং পরে যদি প্রণেতার নাম জানা যায় তবে প্রণেতার নাম বর্গ-বন্ধনীর ([ ]) মধ্যে লেখা হয়।

যদি প্রজাতির নাম অন্য একটি গণে রাখা বা বদলী (Transfer) করা হয়, সেক্ষেত্রে প্রণেতার নাম প্রথম বন্ধনীর (( )) মধ্যে লেখা হয়। প্রয়োজনে পরবর্তী বিজ্ঞানীর নাম প্রথম বিজ্ঞানীর পরে রাখা যেতে পারে। কারণ উভয়েই ঐ ট্যাক্সন নিয়ে গবেষণা করেছেন।

1.1.5.2.7 টাইপ ধারণা (Type concept)

নামকরণের নীতি অনুসারে প্রজাতি নামকরণে 'টাইপ' হল সেই বিশেষ প্রাণীটি (বা প্রাণীর অংশবিশেষ, স্লাইড ইত্যাদি) যার ভিত্তিতে কোড মেনে গবেষক প্রকাশ করেছেন।

গণ-নামকরণে টাইপ হল ঐ নামযুক্ত প্রজাতি (Nominal species) এবং গোত্র নামকরণে টাইপ হল নামযুক্ত গণ (Nominal genus)। সুতরাং প্রজাতি স্তরে নামকরণে টাইপ হল বিশেষ প্রাণীটি; পরবর্তী উচ্চস্তরে পরোক্ষভাবে প্রাণীটিকে বোঝায়।

1.1.6 ট্যাক্সোনোমির স্তর (Levels of taxonomy)

প্রাণীবৈশিষ্ট্য নির্ধারণ পদ্ধতি সরল থেকে ক্রমশঃ জটিল হতে পারে। এরই ভিত্তিতে তিনটি স্তর তৈরী হয়েছে—

(a) আলফা ট্যাক্সোনোমি (Alpha Taxonomy) : কোন একটি প্রজাতি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা এবং তার বর্ণনাসহ শ্রেণীবিন্যাসই হল আলফা ট্যাক্সোনোমি। সুতরাং প্রজাতির বিশেষত্ব থাকবে যা গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই কারণে অন্য প্রজাতি থেকে পৃথক। এইভাবে নতুন প্রজাতির আবিষ্কার এই স্তরে করা হয়। অনেকসময় এই স্তরকে স্বাভাবিকভাবেই বিশ্লেষণধর্মী স্তর বা Analytical level বলে।

(b) বিটা ট্যাক্সোনোমি (Beta Taxonomy) : এই স্তরে আন্তঃ প্রজাতি সম্পর্ক নির্ণয় এবং উচ্চস্তরের নির্ধারণ ও তৎসংক্রান্ত ব্যাখ্যা করা হয়।

এই স্তর নির্ধারণে ও পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন। কারণ আন্তঃপ্রজাতি সম্পর্ক বুঝতে প্রথমে একটি গণভুক্ত সব প্রজাতিকে বুঝতে হয়, এমনকি নিকট সম্পর্কযুক্ত গণভুক্ত প্রজাতিগুলিকে জানা প্রয়োজন। এইভাবে প্রজাতিগুলিকে প্রাচীন থেকে নবীন (Primitive to recent)— এইভাবে সাজানো ও অভিযোজনগত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এর মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য সাধারণ (common) এবং পূর্বপুরুষাগত (ancestral) বলে চিহ্নিত করা যায়। এইগুলি উচ্চতর ট্যাক্সনের বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে। যেহেতু বহু বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ের কাজ এই স্তরে করা হয়, সেজন্য এই স্তরটিকে অনেকে সংশ্লেষধর্মী স্তর বা Synthetic level বলেন।

(c) গামা ট্যাক্সোনোমি (Gama Taxonomy) : বিটা ট্যাক্সোনোমি স্তরে প্রাপ্ত যে আন্তঃপ্রজাতি ও আন্তঃগণ বৈশিষ্ট্য জানা যায় তার ভিত্তিতে ঐজাতীয় প্রাণীর সামগ্রিক বিবর্তনের ধারা নির্ণয় করা এই তৃতীয় স্তরের কাজ। স্বাভাবিক কারণে বহু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ওই দুরূহ কাজ সম্পন্ন হয়। এই স্তরে ঐসব প্রাণীর পৃথিবীতে আবির্ভাবের সময়, পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্য, বিবর্তনের হার ও গতি-প্রকৃতির ব্যাখ্যা করা হয়। অনেকে এটিকে জৈবিক স্তর বা Biological phase বলেন।

1.1.7 প্রজাতি ধারণা (Species concept)

শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের প্রায় শুরুতেই একই জাতীয় প্রাণীগোষ্ঠীকে বিশেষ স্তরে পরিচিত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এজন্য ঐ স্তরটির নামকরণ করা হয় এবং তা হল প্রজাতি। কিন্তু প্রজাতির সংজ্ঞা নির্ণয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর মধ্যে মতভেদ গড়ে ওঠে। কোন একটি সম্পূর্ণ সংজ্ঞা পাওয়ার নানা অসুবিধা দেখা দেয়। এমনকি বলা হয় যে একজন পারদর্শী শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানী যাকে প্রজাতি বলবেন, তাই হল প্রজাতি। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রজাতির বৈশিষ্ট্য জানা যায় না। সুতরাং সংজ্ঞা এমন হবে যা সর্বজনগ্রাহ্য এবং ব্যবহারিক গুণসম্পন্ন। পরবর্তীকালে অবশ্য বিভিন্ন সংজ্ঞা ও সেগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়। (Ereshefsky, 1962).

নিরপেক্ষ বিচারে প্রজাতির সংজ্ঞা দুভাবে করা যেতে পারে; এক, প্রত্যক্ষ গুণাবলীর ভিত্তিতে একটি প্রাণীগোষ্ঠীকে একটি প্রজাতিভুক্ত করা যায় এবং দুই, যে পদ্ধতিতে ঐ প্রাণীগোষ্ঠীর সৃষ্টি, তার ভিত্তিতে করা যায়। এই দুটির মধ্যে প্রথমটি সহজতর ও এর ব্যবহার বেশী। কিন্তু দ্বিতীয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, জটিল এবং এটি বিবর্তনের প্রশ্নের সমাধান করে।

উদ্দেশ্য ঃ প্রজাতি ধারণা প্রাচীনকাল থেকে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। এই ধারণা সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজনগুলি নিম্নরূপ ঃ

- প্রজাতির সংজ্ঞা নিরূপণ।
- বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যেকার পার্থক্য নির্ণয় ও সেগুলির ব্যবহারিক সুবিধা ও অসুবিধা ব্যাখ্যা করা।
- প্রজাতি সংজ্ঞার পরিবর্তন কিভাবে বিভিন্ন তত্ত্বের দ্বারা আলোচিত হয়েছে।

- প্রজাতি স্তরের ও তার নিম্নস্তরের প্রকারভেদ কিভাবে করা হয়।

1.1.7.1 প্রজাতির সংজ্ঞা

প্রজাতির সংজ্ঞা নিয়ে নানামতের ব্যাখ্যা করার আগেই যদি প্রজাতির বর্তমান এবং মোটামুটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তবে অনেক অসুবিধা কম হয়। মায়ারের (1942) মতে —

'প্রজাতি একটি জীবগোষ্ঠী যা অন্তঃপ্রজাতি প্রজননক্ষম, যা জীনগত বৈষম্যের কারণে এবং প্রজনন-পৃথকতা পদ্ধতির (যথা- প্রজনন ক্ষমতাহীন সংকর জীব, গ্রহণযোগ্য বা উপযুক্ত প্রজননসঙ্গীর অভাব প্রভৃতির) দ্বারা অন্য জীবগোষ্ঠী থেকে পৃথক।'

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে প্রজাতির সংজ্ঞা ঃ প্রজাতি সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে যে ধারণাগুলি গড়ে উঠেছিল সেগুলি আলোচনা করে সীমাবদ্ধতা জানা যায়। যে তিনটি মতবাদ আছে তার মধ্যে এখন পর্যন্ত জৈবিক প্রজাতি ধারণা গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃত। সংখ্যাতত্ত্ব ও জীনতত্ত্ব দ্বারা জৈবিক প্রজাতি ধারণা উন্নত হয়েছে। এখন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রজাতির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ করা হল।

মায়ার (1963) বলেছেন শুধুমাত্র পার্থক্যই নয় বরং প্রজাতির স্বকীয়তা বিবেচনা করতে হবে। প্রজাতির যে বিভিন্ন পপুলেশন ছড়িয়ে আছে, তাদের সেই সমস্ত সদস্যের একসাথে বিচার করতে হয়। শুধুমাত্র কয়েকটির ভিত্তিতে সমগ্র প্রজাতির পরিচয় হবে না।

সিম্পসন (1945) বলেছেন যে জীনগত প্রজাতির (Genetic Species) সদস্য একটি প্রাকৃতিক গোষ্ঠী যার একটি স্বতন্ত্র জীনপুল আছে এবং কোন একটি সদস্যের বংশগত বৈশিষ্ট্য ঐ গোষ্ঠীর যে কোন অপত্যের মধ্যে প্রবাহিত হয়।

সিম্পসন (1961) জীবপ্রজাতি (Biospecies) বা বিবর্তনগত প্রজাতি (Evolutionary Species) বোঝাতে বলেছেন যে একটি প্রজাতির সদস্যদের অন্য প্রজাতির সদস্যদের থেকে পৃথকভাবে বিবর্তন হবে এবং প্রত্যেকের নিজস্ব বিবর্তনগত ভূমিকা ও স্তর থাকবে।

ডবজানস্কি (1951) একইভাবে উল্লেখ করেছেন যে প্রজাতি একটি বৃহত্তম জীবগোষ্ঠী যার সদস্যগণ একটি সাধারণ জীনপুলের অংশীদার ও যৌনপ্রজননক্ষম।

ফ্লোরকিন (1966) বলেছেন একই প্রজাতির সদস্যদের DNA-তে সমসংখ্যক পিউরিন ও পিরিমিডিন বেসের (Pyrimidine bases) সমন্বয় থাকবে; এবং অ্যামিনো অ্যাসিডে বিন্যাস একই হবে যাতে একই ধরনের প্রোটিন তৈরী হয়। এজন্যে প্রোটিন সংশ্লেষ ব্যবস্থার অপারেটর, কন্ট্রোলার ও রিপ্রেসর (Operator, Controller and Repressor) অনুগুলির সংজ্ঞা একই হবে। সুতরাং সদস্যদের গঠনগত ও কার্যগত বৈশিষ্ট্য একই হবে এবং সেগুলি পরিবেশে বেঁচে থাকার সহায়ক হয়।

1.1.7.2 বিভিন্ন প্রকারের প্রজাতি ধারণার ব্যাখ্যা

পূর্বে বলা হয়েছে যে প্রজাতি সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি প্রকৃতপক্ষে তিনটি ভাগে আলোচনা করা যায়।

1.1.7.2.1 জাতিরূপভিত্তিক প্রজাতি ধারণা (Typological Species Concept)

এই প্রজাতি ধারণার প্রবক্তা হলেন দার্শনিক প্লেটো, অ্যারিস্টটল, লিনিয়াস এবং পরবর্তীকালে কেন্ (1958) জিনসবার্গ (1938)। এই দার্শনিক চিন্তাধারাকে কখনও আবশ্যিকতাবাদ বলা হত বলে জাতিরূপভিত্তিক সংজ্ঞাকে আবশ্যিকতাবাদ সংজ্ঞাও বলা হয়। জিনস্বার্গ এই প্রজাতি ধারণার সপক্ষে নানাপ্রকার শুষ্ধ সংখ্যাগত ও গাণিতিক ব্যাখ্যা দেন।

এই ধারণা অনুসারে, পৃথিবীতে আমরা যে বহুপ্রকার জীব দেখতে পাই, তা প্রকৃতপক্ষে সীমিত কিছুসংখ্যক জীবের প্রতিফলন মাত্র। অর্থাৎ কয়েকপ্রকার জাতি (বা type) পৃথিবীতে বর্তমান এবং তাদের বিভিন্ন বহিঃ প্রকাশই জীববৈচিত্র্যের কারণ। বিভিন্ন সদৃশ জীবের মধ্যে ঐ জাতির সব গুণগুলি সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয় না বলে বৈচিত্র্য (variation) দেখা যায়। সুতরাং অসম্পূর্ণ প্রকাশের (expression) মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য ঘটে।

(a) এই মতবাদের কয়েকটি বিষয় গ্রহণযোগ্য নয়। যথা, জীববৈচিত্র্যের বিভিন্ন কারণ হতে পারে এবং একটি জাতির একাধিক সদস্যদের মধ্যে বাহ্যিক প্রভেদ ঘটতে পারে। বৈসাদৃশ্যের কারণগুলি অনেক; যথা, যৌনদ্বিরূপতা, বয়স, বহুরূপতা (polymorphism) প্রভৃতি। ওই কারণে, পূর্বে পৃথক প্রজাতি হিসাবে গণ্য বহু প্রাণী প্রজাতি মর্যাদা হারিয়েছে এবং দেখা গেছে যে তারা একই প্রজননক্ষম পপুলেশনের সদস্য ভিন্ন কিছু নয়।

(b) সিবলিং প্রজাতিগুলির (Sibling Species) বাহ্যিক গুণাবলী একই হওয়া সত্ত্বেও তারা পৃথক প্রজাতিভুক্ত।

সুতরাং বাহ্যিক বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে প্রজাতি নামকরণের সমস্যা থাকে এবং ত্রুটিপূর্ণ ধারণা তৈরী হয়। এই ধারণার বশবর্তী অনেকে সরে আসেন যদিও কিছু বিজ্ঞানী এখনও এই মতবাদে বিশ্বাসী।

1.1.7.2.2 নামবাদভিত্তিক প্রজাতি ধারণা

বৈজ্ঞানিক অক্কাস ও তাঁর যুক্তিতে বিশ্বাসী বাফন, বিশী, ল্যামার্ক প্রভৃতি মনীষীর মতে প্রকৃতি জীব সৃষ্টি করে মাত্র এবং এইসব জীব-ই পৃথিবীতে বর্তমান (অর্থাৎ তাদের অস্তিত্ব আছে) এবং প্রজাতির প্রকৃত কোন অস্তিত্ব নেই। প্রজাতি মানুষের কল্পনায় তৈরী একটি ধারণা। বিশীর মতে বহু রকমের জীবকে সমষ্টিগতভাবে উল্লেখ করার জন্য প্রজাতির আবিষ্কার করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে এই মতবাদ জনপ্রিয় ছিল। এই প্রজাতি ধারণা পূর্বে উল্লিখিত জাতিরূপ প্রজাতি ধারণায় বর্ণিত প্রকৃত বিশ্বজনীনের (real universal) অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। এইভাবে নামবাদীরা প্রজাতি অস্তিত্বহীন, মনুষ্য কল্পনামাত্র এবং প্রাকৃতিক ঘটনা নয় বলে বর্ণনা করেছেন। নামবাদভিত্তিক প্রজাতি ধারণা গ্রহণযোগ্য হয়নি। কারণ যে কোন লোকের পক্ষে বোঝা সহজ যে প্রাকৃতিক কারণেই শুধুমাত্র প্রজাতি সৃষ্টি হয় এবং মানুষ কখনও তা পারে না। বিবর্তন ও অভিযোজন প্রাকৃতিক ঘটনা এবং এর দ্বারা যে বৈচিত্র্য ঘটে তা কোন প্রজাতির অর্ন্তনিহিত বৈশিষ্ট্য। মানুষ শুধুমাত্র যুক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করে ব্যাখ্যা করে।

1.1.7.2.3 জৈবিক প্রজাতি ধারণা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে অনেক বৈজ্ঞানিক যখন অনুভব করলেন যে পূর্ববর্তী দুটি প্রজাতি ধারণা জীবজগতের ক্ষেত্রে অচল, তখন এই জৈবিক প্রজাতি ধারণার জন্ম হয়। এটি প্রথম বলেন বাফন, সেরেম, ভট্ ও ওয়ালশ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ। জর্ডন (1905) অবশ্য প্রথম পরিষ্কারভাবে এই মতবাদ প্রকাশ করেন। এই মতবাদে পূর্ববর্তী মতবাদের কিছু গ্রহণযোগ্য অংশ রয়েছে। জাতিরূপ ধারণায় বর্ণিত প্রজাতির স্বাধীন সত্ত্বা এবং নামবাদের পপুলেশনের সংখ্যাতত্ত্ব এই দুটি জৈবিক প্রজাতি ধারণার অন্তর্গত হয়েছে। আবার পূর্বোক্ত দুটি ধারণা থেকে জৈবিক প্রজাতি ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক হয়েছে। কারণ ওই ধারণা বিশ্বাস করে যে প্রজাতির স্বাতন্ত্র্য নির্ভর করে তার ঐতিহাসিকভাবে উদ্ভূত জীনপুলের বৈশিষ্ট্যের অংশের উপর।

জৈবিক প্রজাতি ধারণা সরলায়িত হয়েছে একটি সত্যের উপর এবং তা হল যে একটি প্রজাতি অন্য প্রজাতি থেকে প্রজননের অক্ষমতা দ্বারা পৃথক। অর্থাৎ শুধুমাত্র অন্তঃপ্রজাতি প্রজনন হবে এবং আন্তঃপ্রজাতি প্রজনন ঘটবে না। কারণ একটি প্রজাতির সব জীন স্বাধীনভাবে সদস্যদের মধ্যে বাহিত (flow) হয়। মায়ার (1942) প্রদত্ত প্রজাতির সংজ্ঞা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

অনেকের ধারণা আছে যে জৈবিক প্রজাতি ধারণায় 'জৈবিক' শব্দটির ব্যবহারের কারণ এই যে এই ধারণায় 'জীবের' সম্পর্কে বলা হয়। কিন্তু এটি ভ্রান্ত ধারণা। এখানে 'জৈবিক' কথার অর্থ হল যে এর সংজ্ঞায় জৈবিক বিষয় (বৈশিষ্ট্য) অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়েছে।

❑ জৈবিক প্রজাতি ধারণার তিনটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য

(a) প্রজাতি একটি প্রজননক্ষম প্রাণীগোষ্ঠী। একই প্রজাতির সদস্যগণ প্রজননের জন্য কাছে আসে ও উপযুক্ত সঙ্গী নির্বাচন করে। বিভিন্ন উপায়ে অন্তঃপ্রজাতি প্রজনন ঘটে।

(b) প্রজাতি বাস্তুতন্ত্রের একটি একক। একটি প্রজাতির সদস্যগণ কোন একটি বাস্তুতন্ত্রে ঐ বাস্তুতন্ত্রের অধীন অন্য সব প্রজাতি ও অজীব বস্তুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে।

(c) প্রজাতি জীনগত একক হিসাবে চিহ্নিত। কারণ এর সদস্যগণ একটি বৃহৎ আন্তঃযোগাযোগ বিশিষ্ট জীনপুলের (Gene pool) অংশীদার।

❑ জৈবিক প্রজাতি ধারণায় পপুলেশন জেনেটিক্স

একটি প্রজাতির অধীন সদস্যগণ একটি জীনপুলের অংশীদার। সুতরাং আন্তঃপ্রজাতি প্রজনন (বা সংকরায়ন) হলে জীনবৈশিষ্ট্য এবং বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের প্রবাহ বিঘ্নিত হবে। এমন কি অন্য প্রজাতির জীনের ক্ষতিকর অংশ প্রবাহিত হয়ে জীন দূষণ ঘটতে পারে। সুতরাং অন্তঃপ্রজাতি প্রজনন এইসব দুর্ঘটনা থেকে প্রজাতিকে রক্ষা করে। সংরক্ষিত (মৃত) প্রাণীর নমুনার ক্ষেত্রে এই বিষয় জানা যায় না এবং বহু অন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পরোক্ষ বিচার করা যায়। এইরূপ সংরক্ষিত জীনপুল আইসোলেটিং (Isolating mechanism) দ্বারা নিজের আত্মরক্ষা করে। এই জীনপুল বহু প্রজন্ম দ্বারা নির্বাচিত এবং পরিবেশের পক্ষে উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছে।

❑ জৈবিক প্রজাতি ধারণার সীমাবদ্ধতা

তিনটি বিষয়ে জৈবিক প্রজাতি ধারণা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

(a) তথ্যের অপ্রতুলতা ঃ প্রত্নতত্ত্ববিদ (Paleontologist) অন্তঃপ্রজাতি প্রজনন বিষয়ে তথ্য পেতে পারেন না। একই কথা সংরক্ষিত (মৃত) প্রাণীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

অনেক সময় বিভিন্ন পপুলেশনে একই প্রজাতি এমন বিভিন্নরূপে দেখা যায় যে প্রশ্ন জাগে যে কোনটি হয়ত অন্য প্রজাতি হবে বা শুধুমাত্র বহুরূপতার জন্য এমনটি হয়েছে। সুতরাং জীবনচক্র পাঠ করে তবেই যৌন দ্বিরূপতা, বয়সের জন্য বাহ্যিক পার্থক্য বা বহুরূপতা প্রভৃতি বিষয়ে জানা যায়। অনেকক্ষেত্রেই জীবন চক্রের পূর্ণ পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না।

(b) একপিতৃজনিত প্রজনন (Uniparental reproduction) ঃ যে সব প্রাণী স্বপরাগযোগ (Self-fertilization), পারথেনোজেনেসিস (Perthenogenesis), সিউডোগ্যামী (Pseudogamy) এবং অঙ্গজ জনন (Vegetative reproduction) দশায়, তাদের ক্ষেত্রে অন্তঃপ্রজনন বিষয় থাকে না বলে জৈবিক প্রজাতি ধারণা খাটে না।

উদ্ভিদবিদ্‌গত জৈবিক প্রজাতি ধারণা গ্রহণ করেননি। কারণ উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়ন হামেশাই ঘটে। বাউম (Baum, 1992) দেখিয়েছেন যে অনেক প্রধান বা বড় ট্যাক্সার (major taxa) ক্ষেত্রে প্রজননক্ষমতা ও নৈকট্য একই সাথে যুক্ত নাও হতে পারে। বহু উদ্ভিদ উভলিঙ্গ। বহু পরিণত সংকর উদ্ভিদ বহুদিন ধরে বংশবিস্তার করে এবং কখনও সকল স্বপরাগযোগ বা ব্যাকক্রস (Back-cross) করে। অবশ্য এই ঘটনাগুলি প্রাণীরাজ্যে ঘটে না। মায়ার (1992) উত্তর আমেরিকার স্থানীয় উদ্ভিদের 93.5% ক্ষেত্রে অবশ্য জৈবিক প্রজাতি ধারণা প্রয়োগ করেছেন।

সবচেয়ে জোরালো আপত্তি তুলেছেন বিজ্ঞানী ডোনোগে (Donoghue, 1985) এবং বলেছেন এই প্রজাতি ধারণার দ্বারা মোনোফাইলেটিক প্রজাতি ধারণা করা সম্ভব নয়। কারণ বলা হচ্ছে যে আন্তঃপ্রজাতি সংমিশ্রণ হবে না।

উপরিউক্ত অসুবিধাগুলি দূর করার স্বপক্ষে মায়ার (1963) এবং সিম্পসনের (1961) ব্যাখ্যা উল্লেখযোগ্য। দেখা গেছে এক পিতৃজনিত অপত্যদের মধ্যে বহুবিধ প্রকট ও বিচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এইগুলি প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল (মিউটেশন)। সুতরাং এই সমস্ত বাহ্যিক পার্থক্যগুলি একত্রে একটি প্রজাতির বৈশিষ্ট্য গণ্য হবে।

আবার একগুচ্ছ বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের সৃষ্টিতে পরিবেশের পার্থক্যের অবদান থাকে এবং পৃথক বিবর্তনের রেখা সৃষ্টি করতে পারে।

মনে রাখতে হবে যে ব্যাক্টিরিয়া ও প্রোটিস্টার ক্ষেত্রে জীনের আদান-প্রদান একেবারেই হয় না তা সত্য নয়। এদের ক্ষেত্রেও নিয়মিত জীন বিনিময় হয়। এজন্য জেনোস্পেসিস ধারণার (genospecies concept) উৎপত্তি হয়েছে।

সংকর প্রাণী বা উদ্ভিদ প্রকৃতিতে কম দেখা যায় অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই ঘটে না। কিন্তু কৃত্রিম অবস্থায় ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্ভিদ বা নৈকট্যের কারণে ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর সংকরায়ন ঘটে। একইভাবে সিমপ্যাট্রিক প্রাণীদের মধ্যে সহজেই প্রজনন হয়। অর্থাৎ এদের ক্ষেত্রে জীনবহতা (gene flow) খুব সহজ হয়। কিন্তু অ্যালোপ্যাট্রিক প্রাণীদের ক্ষেত্রে এটি সহজ নয় এবং প্রায় শূন্য বলা যায়। নিকট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটি সিমপ্যাট্রিক প্রজাতির প্রাকৃতিক সংকর অপত্য সাধারণতঃ নিম্নমানের হয় ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বাতিল হয়ে যায়। এই জাতীয় প্রজাতির প্রজননে নানা দৈহিক, ব্যবহারিক প্রভৃতি প্রতিবন্ধকতা তৈরী হয়।

(c) বিবর্তনের মধ্যবর্তী প্রাণীসৃষ্টি :

স্থানীয় প্রাণীগোষ্ঠীর মধ্যে থাকাকালীন একটি প্রজাতির সদস্যগণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের দ্বারা অন্য প্রজাতি থেকে পৃথক থাকে। যদি ঐ স্থানটির ব্যাপ্তি ঘটে এবং অনেক সময় অতিবাহিত হয়, তবে ধীরে ধীরে একটি প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যের আগমন ঘটে (Incipient Speciation)। এইভাবে পৃথক প্রজাতির গুণাগুণ লক্ষ্য করা যায়, যদিও তখনও পৃথক প্রজাতিতে পরিণত হয়নি। এইসব বিবর্তন মধ্যবর্তী প্রাণীদের ক্ষেত্রে চারটি ঘটনা ঘটতে পারে। যেমন—বাহ্যিক বৈসাদৃশ্য ছাড়াই প্রজননক্ষমতা লাভ (সিবলিং প্রজাতি), প্রকট বাহ্যিক বৈসাদৃশ্য অথচ প্রজনন ক্ষমতা হীনতা এবং সাময়িকভাবে প্রজনন ক্ষমতা লাভ ও সংকরায়ন।

সিমপ্যাট্রিক সংকরায়নের দুটি দিক আছে। দেখা যায় যে, পিতৃ প্রজাতিদ্বয় বহুকাল ধরে বিশাল এলাকায় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে যদিও কোন জায়গায় সংকরায়ন হয়েছে। এই ধরনের অপত্যদের নামকরণের যোগ্যতা দেওয়া হয় না। আবার কোন ক্ষেত্রে দুটি পৃথক পিতৃ প্রজাতি সম্পূর্ণরূপে মিলিত হয়ে যায় এবং নিজস্ব সত্ত্বা হারিয়েছে। যদিও এইরকমের উদাহরণ দেওয়া হয় কিন্তু কোন বিস্তারিত ও প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়নি।

চতুর্থ ক্ষেত্রটি সেমিস্পেসিস (semispecies), যার বৈশিষ্ট্য প্রজাতি ও উপপ্রজাতির মধ্যবর্তী। তবে শ্রেণীবিন্যাস ও অন্যান্য জটিলতার কারণে এইজাতীয় প্রাণীদের, তাদের নিকটস্থ প্রজাতির অন্তর্গত করা হয়। একইভাবে সার্কুলার ওভারল্যাপ (Circular Overlap) ও সীমারেখায় সন্দেহজনক প্রাণীগুলিকে তাদের গুরুত্ব অনুযায়ী বিবেচনা করা প্রয়োজন।

1.1.7.3 প্রজাতির পপুলেশন-সংক্রান্ত কয়েকটি সংজ্ঞা

ট্যাক্সোনোমি নিয়ে লেখা বিভিন্ন বইতে নানাপ্রকার প্রজাতির উল্লেখ আছে। সেগুলির উপযুক্ত সংজ্ঞা ও প্রয়োজনে ব্যাখ্যা না জানা থাকায় ভ্রান্তির অবকাশ থাকে।

(a) উপ-প্রজাতি : প্রজাতি বলতে বিস্তৃত এলাকার সদস্যগণকে বোঝায় এবং তাদের মধ্যে কখনও যথেষ্ট প্রকারভেদ গড়ে ওঠে। এইক্ষেত্রে ট্যাক্সোনোমিবিদ ঐপ্রকার বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রাণীকে উপ-প্রজাতি বলেন।

(b) পলিটিপিক প্রজাতি : যদি কোন প্রজাতির একাধিক উপপ্রজাতি থাকে, তবে ঐ প্রজাতিকে পলিটিপিক প্রজাতি বলে।

(c) মোনোটিপিক প্রজাতি : উপ-প্রজাতিবিহীন প্রজাতিকে মোনোটিপিক প্রজাতি বলে।

(d) ফরমেনক্রিস (Formenkries of Lorenz, Kleinschmidt) এবং রেজেনক্রিস (Ressenkreis of Rensch) : এ দুটি পলিটিপিক প্রজাতির অন্য নাম এবং প্রতিষ্ঠিত নয়।

(e) রেস (Race) : এই শব্দটি বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি একটি স্থানীয় পপুলেশন এবং যদি না উপ-প্রজাতি স্তরে উন্নীত হয় তবে, ট্যাক্সোনোমিতে স্বীকৃত হবে না।

উপ-প্রজাতি ও ভৌগোলিক রেস প্রায়ই সমার্থক করে ব্যবহার হয়েছে। অন্যক্ষেত্রে স্থানীয় পপুলেশনের উপ-প্রজাতির অন্তর্গত করে রেস শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

যেহেতু, যে কোন বাস্তুসংস্থানের সব বৈশিষ্ট্য হুবহু এক নয়। তাই প্রতিটি উপ-প্রজাতিকে ইকোলজিক্যাল রেস (ecological race) বলা যায়।

(f) ক্লাইন (Cline) ও আইসোফেন (Isophene) : ক্লাইন শব্দটি হাক্সলীর (1939) অবদান। একটি প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের ক্রমপর্যায় (gradient) দেখা যায় এবং প্রতিটি পর্যায় হল এক একটি ক্লাইন।

ক্লাইনের সমকোণে অবস্থিত প্রাণীগুলির বৈশিষ্ট্য একই প্রকারের হয় এবং এই প্রকারের প্রাণীর অবস্থান একটি রেখার উপর, যাকে আইসোফেন বলে।

(g) ডিম (Deme) : মায়ারের (1963) মতে, স্থানীয় পপুলেশনের মধ্যে প্রজাতির কিছু সদস্যের দ্বারা বিবর্তনের একক তৈরী হলে ঐ এককে ডিম বলে।

(h) ফেনা (Phena) : ভিন্ন ভিন্ন পপুলেশনের ভিন্ন বৈচিত্র্যের প্রাণীকে (একই প্রজাতিভুক্ত) ফেনা বলা হয়।

(i) মর্ফ (Morph) : পলিমরফিক পপুলেশনের (polymorphic population) প্রতিটি এককে মর্ফ বলে।

(a) থেকে (i) পর্যন্ত শব্দগুলি ট্যাক্সোনোমিতে স্বীকৃত না হলেও পপুলেশনের ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হয়।

1.1.8 সারাংশ

জীবজগতে প্রাণীবৈচিত্র্য অপরিসীম। প্রাচীনযুগ থেকেই প্রাণীর নামকরণ, বর্ণনা, শ্রেণীবিন্যাস ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা চলছে। ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের অন্যান্য অগ্রগতির সঙ্গে ট্যাক্সোনোমি ও সিস্টেমেটিক্স বিজ্ঞানের উন্নতি হল। ফলে, খুব শীঘ্র এই বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের পরিবর্তন ও পরিমার্জন হতে থাকে। মতামতের আদান-প্রদান, যুক্তি প্রভৃতির মাধ্যমে এবং প্রকৃতিকে আরও গভীরভাবে জানার ফলে বিভিন্ন নতুন প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে। প্রশ্ন জাগে, কেন পৃথিবীর এই প্রাণীবৈচিত্র্য। এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিবর্তনের ধারা অনুসন্ধান করে চলতে হয় এবং সিস্টেমেটিক্সের গঠনে এটি পাওয়া যায়।

বহু পরীক্ষার দ্বারা ও বহু নীতির সঠিক মূল্যায়ন ও সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আজ যেখানে ট্যাক্সোনোমি ও সিস্টেমেটিক্স এসেছে তা অনেক সরল ও যুক্তিনির্ভর হয়েছে। বিজ্ঞানীদের কাছে এর সরলীকরণ হওয়ার পর তাদের গবেষণার ফলে আরও নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ স্থান পেয়েছে। প্রাণীবিবর্তন ও শ্রেণীবিন্যাস যত ব্যাখ্যাসম্মত হয়েছে, ততই বিবর্তনের নানা অজানা, অদেখা প্রাণীর স্বরূপ অনায়াসে কল্পনা করা যায় এবং এর মাধ্যমে বিবর্তনের শূন্যস্থানের ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে।

শ্রেণীবিন্যাস ও প্রাণীর নামকরণে প্রজাতি একটি একক। প্রজাতি সম্পর্কে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ধারণার প্রয়োজন। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রজাতিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রজাতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গুণাবলীর সবকিছুই বিচার্য্য।

প্রজাতি একটি অন্তঃপ্রজননক্ষম জীবগোষ্ঠী এবং একটি বা একাধিক বাস্তুতন্ত্রে অবস্থান করে।

জাতিরূপভিত্তিক প্রজাতি ধারণায় পৃথিবীতে দৃষ্ট সমস্ত প্রাণীর মত কয়েকটি 'টাইপ' বা জীবের প্রতিনিধি থাকে। কিন্তু বৈষম্য থাকলেই প্রজাতি পৃথক নাও হতে পারে।

নামবাদভিত্তিক ধারণায় প্রজাতির অস্তিত্ব অস্বীকার করে বলা হয় যে সব কিছুই প্রাকৃতিকভাবে পৃথিবীতে বর্তমান। কিন্তু এটা সর্বজনগ্রাহ্য যে প্রজাতির বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ তার বিবর্তন ও অভিযোজনের ফলে এসেছে। এই ব্যাপারে মানুষ ব্যাখ্যা দিতে পারে, সৃষ্টি করতে পারে না।

জৈবিক প্রজাতি ধারণা সর্বজনগ্রাহ্য হলেও অযৌনজনন, পারথেনোজেনেসিস ও সংকর প্রাণীর ক্ষেত্রে অসুবিধাকর। তথাপি বিভিন্ন উপায়ে এই অসুবিধা অতিক্রম করে প্রজাতির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জৈবিক প্রজাতি ধারণায় প্রজাতি সদস্যগণ একটি জীনপুলের অংশীদার। বিবর্তনের মধ্যবর্তী প্রাণীসমূহ তাদের গুরুত্ব অনুসারে উপ-প্রজাতি স্তরে ট্যাক্সোনোমিতে স্বীকৃত হলেও অধোঃপ্রজাতি (Infra-subspecies) স্তরে স্বীকৃত নয়।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রজাতির সংজ্ঞার বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করেছেন। সেগুলি মূলতঃ অন্তঃপ্রজনন, বাস্তুসংস্থান, বিবর্তন ও জীনগত দিকগুলির নিরিখে আলোচিত হয়েছে।

পপুলেশনের একটি প্রজাতির ধীরে ধীরে নানা বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়। সেইসব বৈশিষ্ট্যের যে ধীরে ধীরে প্রকাশ হয়, তার জন্য পিতৃপ্রজাতি থেকে বৈশিষ্ট্যের কারণে পৃথক হতে থাকে। এজন্য যেসব ক্ষুদ্র পপুলেশন সৃষ্টি হয়, তাদের কয়েকটি নামে পরিচিত করা হয়েছে।

1.1.9 প্রশ্নাবলী

A. দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন :

1. কিভাবে ও কোন বিষয়গুলির বিচারে ট্যাক্সোনোমির স্তর নির্ধারিত হয়?
2. সিস্টেমেটিক্স কথাটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা কী? নব সিস্টেমেটিক্সের মূল বক্তব্য কী কী?
3. পপুলেশন সিস্টেমেটিক্সের আরম্ভ ও গুরুত্ব কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?
4. জৈবিক প্রজাতি ধারণার মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি ও সীমাবদ্ধতা কি কি?
5. বিভিন্ন বিজ্ঞানী কিভাবে প্রজাতির সংজ্ঞা দিয়েছেন?
6. জাতিরূপভিত্তিক প্রজাতি ধারণা কী ও কেন গ্রহণযোগ্য হয়নি?
7. পপুলেশন জেনেটিক্স কিভাবে জৈবিক প্রজাতি ধারণাকে সুদূর করেছে?
8. নতুন প্রজাতি সৃষ্টিতে পপুলেশনের অন্তবর্তী দশাগুলি কী কী?
9. নামকরণের নীতিসমূহ কী কী?

B. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

1. ট্যাক্সোনোমি নামটি কার দেওয়া?
2. কার লেখায় ও কোন সময়ে প্রথম প্রাণীর শ্রেণীবিন্যাসের উল্লেখ পাওয়া যায়?
3. ট্যাক্সোনোমির স্তর কী কী ও কয়টি?
4. ট্যাক্সোনোমি ও সিস্টেমেটিক্সের পার্থক্য কী?

5. হেনিগের প্রবর্তিত তত্ত্বের নাম কী?
6. পলিটিপিক ও মোনোটিপিক প্রজাতি কী?
7. প্রজাতি ও উপ-প্রজাতির সংজ্ঞা কী হওয়া উচিত?
8. জাতিরূপভিত্তিক প্রজাতি ধারণার প্রবক্তাদের নাম কী কী?
9. সিবলিং প্রজাতি কি?
10. কোন সময় ও কাদের মাধ্যমে জৈবিক প্রজাতি ধারণা গড়ে ওঠে?
11. জীনপুল কাকে বলে?
12. পূর্বিতার আইন বলতে কী বোঝ?

C. শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

1. আলফা ট্যাক্সোনোমি প্রকৃতপক্ষে একটি _____ স্তর।
2. ফেনেটিক্সের প্রবক্তা হলেন _____।
3. নব সিস্টেমেটিক্স _____ সালে _____ দ্বারা প্রবর্তিত হয়।
4. উপপ্রজাতি থাকলে ঐ প্রজাতিকে _____ প্রজাতি বলে।
5. ICZN এর পুরো কথাটি হল _____।
6. _____ প্রজাতি ধারণায় প্রজাতি মনুষ্যসৃষ্ট কল্পনা বলা হয়।
7. প্রজাতি _____ প্রজননক্ষম এবং _____ প্রজনন অক্ষম।
8. একই প্রজাতির _____ জীনপুলের অংশীদার।
9. এক-পিতৃজনিত প্রজননের ব্যাখ্যা _____ ধারণার ব্যাখ্যা করা যায় না।
10. জৈবিক প্রজাতি ধারণার বিরুধে দুজন বৈজ্ঞানিক হলেন _____ ও _____।

1.1.10 উত্তরমালা ঃ

A. 1. 1.1.6
2. 1.1.4
3. 1.1.4.2
4. 1.1.7.2.3
5. 1.1.7.1
6. 1.1.7.2.1
7. 1.1.7.2.3
8. 1.1.7.3
9. 1.1.5.1

B. 1. ক্যান্ডোল
2. থিওফ্রেসটাস, 370-285 BC
3. মোট তিনটি— আলফা, বিটা ও গামা।
4. 1.1.4
5. ক্ল্যাডিজম্

6. 1.1.4.2
7. 1.1.7.1 ও 1.1.7.3
8. 1.1.7.2.1
9. 1.1.7.2.3
10. 1.1.7
11. 1.1.7
12. 1.1.5

C. 1. বিশ্লেষণধর্মী
2. স্মিথ ও শোকল
3. 1940, হাক্সলী
4. পলিটিপিক
5. প্রাণী নামকরণের আন্তর্জাতিক কোড
6. নামবাদভিত্তিক
7. অন্তঃ, আন্তঃ
8. সদস্যগণ
9. জৈবিক প্রজাতি
10. বাউস, ডোনেগে।

একক 1.2 ❑ পরিস্ফুরণ জীববিদ্যা ঃ শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর গঠন, স্পার্মাটোজেনেসিস, ঊজেনেসিস, নিষেক সম্পর্কিত ধারণা

গঠন

1.2.0 প্রস্তাবনা

1.2.1 উদ্দেশ্য

1.2.2 শুক্রানুর গঠন ও বৈশিষ্ট্য

1.2.3 ডিম্বানুর গঠন ও প্রকারভেদ

1.2.4 জনন কোষের উৎপত্তি

1.2.5 জনন কোষের পরিবর্তন

1.2.6 স্পার্মাটোজেনেসিস

1.2.6.1 স্পার্মাটিডের উৎপত্তি

1.2.6.2 স্পার্মাটিলিওসিস

1.2.7 ঊজেনেসিস

1.2.8 স্পার্মাটোজেনেসিস ও উজেনেসিস—তুলনামূলক আলোচনা।

1.2.9 নিষেকের প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

1.2.10 নিষেকের প্রকারভেদ

1.2.11 নিষেকের ঘটনাপ্রবাহ

1.2.11.1 শুক্রানু ও ডিম্বাণুর সম্মুখীন হওয়া

1.2.11.2 শুক্রানু ও ডিম্বাণুর সংযোগস্থাপন এবং অ্যাগ্লুটিনেশন

1.2.11.3 অনুপ্রবেশ

1.2.11.4 সক্রিয়তা অর্জন

1.2.11.5 প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের পরিযান ও অ্যাম্ফিমিকসিস্

1.2.12 নিষেকের তাৎপর্য

1.2.13 সারাংশ

1.2.14 প্রশ্নাবলী

1.2.15 উত্তরমালা

1.2.0 প্রস্তাবনা

যে প্রক্রিয়ায় জনন অঙ্গ থেকে জনন কোষের উৎপত্তি হয় তাকে গ্যামেটোজেনেসিস বলে। প্রাণীদের ক্ষেত্রে যৌনপ্রজননে দুটি বিশেষ ধরনের অসম জননকোষের প্রয়োজন হয়। একটি স্ত্রী জনন অঙ্গ বা ডিম্বাশয় (ovary) থেকে সৃষ্টি হয় এবং অপরটির উৎপত্তি হয় পুরুষ জনন অঙ্গ বা শুক্রাশয়ে (Testis)। ডিম্বাশয় থেকে সৃষ্ট জনন কোষকে ডিম্বাণু (Egg) বা ওভাম (ovum) এবং শুক্রাশয় হইতে সৃষ্ট জননকোষকে শুক্রানু (spermato zoom) বলে। শুক্রানু উৎপাদন প্রক্রিয়াকে স্পার্মাটোজেনেসিস এবং ডিম্বাণু উৎপাদনকে উজেনেসিস্ বলে।

নিষেক পদ্ধতিতে শুক্রানু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটে। এটি ব্যক্তিজেনিক পরিস্ফুরণের দ্বিতীয় দশা। নিষেকের সময় থেকেই ভ্রূণের পরিস্ফুরণ আরম্ভ হয় এবং হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোসোমযুক্ত শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলিত হয়ে ভ্রূণের কোষে ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোমসংখ্যা বজায় রাখে। আপাত দৃষ্টিতে নিষেক একটি সাধারণ প্রক্রিয়া মনে হলেও নিষেক একটি খুবই জটিল প্রক্রিয়া এবং অসংখ্য ভৌত ও রাসায়নিক ঘটনার সমন্বয়ে তা সম্পন্ন হয়। ডিম্বাণুর সক্রিয়তা অর্জন ও অপত্য প্রাণীতে পিতামাতার বংশগতিজনিত বৈশিষ্ট্যগুলির সঞ্চারণ নিষেকের দ্বারা সংঘটিত হয়।

1.2.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি

- পরিস্ফুরণ জীববিদ্যা সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন।
- গ্যামেটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় কীভাবে স্ত্রী জননাঙ্গ থেকে ডিম্বাণু এবং পুংজননঅঙ্গ থেকে শুক্রাণু উৎপন্ন হয় তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।
- ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর সৃষ্টির সময় কোষ-অঙ্গানুর পরিবর্তন এবং গঠনগত ও ক্রিয়াগত তাৎপর্য বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- নিষেকের চাপ কিভাবে হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোমযুক্ত শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোমযুক্ত জাইগোট সৃষ্টি হয় বা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- নিষেককালে ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশকালে উদ্ভূত ভৌতরাসায়নিক বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জাইগোটের মাধ্যমে জীনগত প্রকরণের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

1.2.2 শুক্রাণুর গঠন ও বৈশিষ্ট্য

শুক্রাণুর আকৃতি বিভিন্ন প্রাণীদের ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ হয়। (চিত্র নং 2.1) একটি আদর্শ মেরুদন্ডী প্রাণীর শুক্রাণুর দেহ তিনটি অংশে ভাগ করা যায়, যথাঃ (a) মস্তক (Head), (b) মধ্যমাংশ (Middle Piece) এবং (c) লেজ (Tail)। শুক্রাণুর মস্তক আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন মেরুদন্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ হয়—

1. গোলাকার— অস্থিময় মাছ
2. বল্লম-সদৃশ— উভচর প্রাণী
3. সর্পিলাকার— কয়েকটি পাখি
4. বঁড়শির আকার— ইঁদুর এবং
5. চামচের আকার— মানুষ।

বৈসাদৃশ্য থাকলেও মেরুদন্ডীদের শুক্রাণুর মধ্যে গঠনগত সমতা বর্তমান। খরগোসের শুক্রাণুর গঠন আমাদের সম্পূর্ণভাবে জানা আছে। সেইজন্য খরগোসের শুক্রাণুর গঠনকে আদর্শ গঠন ধরে এখানে বর্ণনা করা হল 8-10 μm মস্তকসমেত একটি পূর্ণগঠিত শুক্রাণু দৈর্ঘ্য প্রায় (60–70 μm) (μm= মাইক্রন মিলিমিটার $1\mu m = {}^{1}/_{1000}$ mm)।

মস্তক : প্রধানতঃ নিউক্লিয়াস ও অ্যাক্রোসোম শুক্রাণুর মস্তক গঠন করে। মস্তকের অধিকাংশ অংশ নিউক্লিয়াস দ্বারা অধিকৃত। নিউক্লিয়াসটি লম্বাটে এবং ঘন ক্রোমাটিন দ্বারা পূর্ণ থাকে। নিউক্লিয়াসের অগ্রভাগে একটি দুইপ্রাচীরবেষ্টিত থলি অ্যাক্রোসোম টুপির ন্যায় অবস্থান করে। অ্যাক্রোসোম গহবরে অ্যাক্রোসোম দানা থাকে। অ্যাক্রোসোম নিউক্লিয়াসের সাথে যুক্ত থাকে এবং এর অগ্রভাগ উত্তল এবং পশ্চাদভাগটি সমতল। অ্যাক্রোসোম নিষেকের সময় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। (চিত্র নং 2.2)

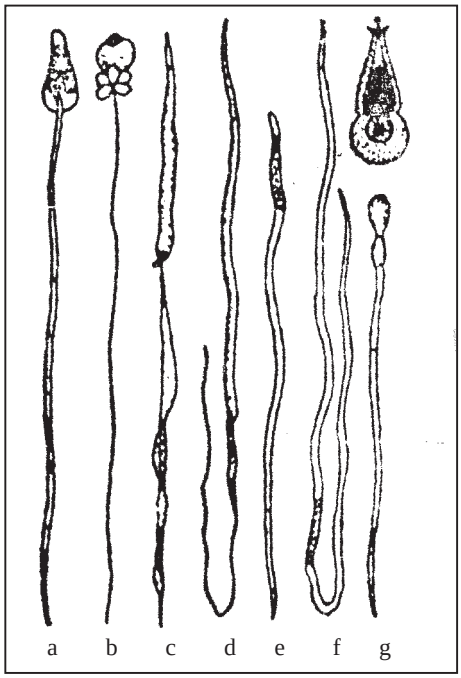

চিত্র নং 2.1 ঃ বিভিন্ন প্রাণীর শুক্রাণুর আকৃতি
(a) সি-আর্চিন, (b) অ্যাম্ফিঅক্সাস, (c) কুনো ব্যাঙ, (d) সোনাব্যাঙ, (e) মোরগ, (f) মোনোট্রিমাটা, (g) মানুষ, (h) অ্যাসকারিস।

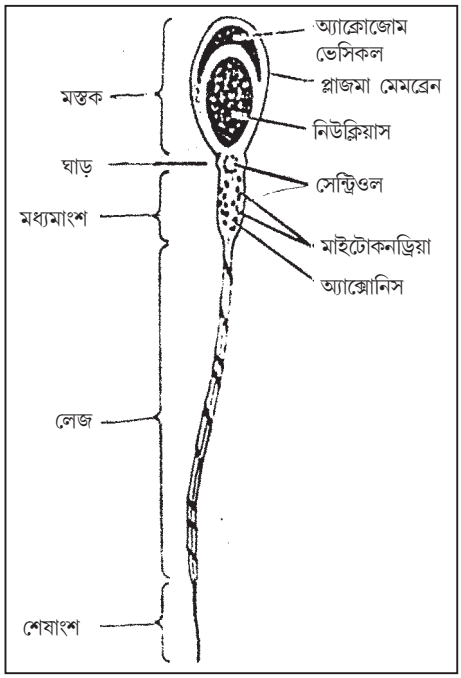

চিত্র নং 2.2 ঃ একটি আদর্শ স্তন্যপায়ী শুক্রাণুর বর্ধিত চিত্ররূপ।

মধ্যমাংশ : অ্যাকসিয়াল ফিলামেন্ট পরিবৃত মাইটোকনড্রিয়াল স্পাইরাল ও প্রক্সিমাল সেন্ট্রিওল থেকে উত্থিত নটি সূক্ষ্ম তন্তু দিয়ে মধ্যমাংশটি গঠিত। মধ্যমাংশে অবস্থিত মাইটোকনড্রিয়া থেকে প্রাপ্ত শক্তির সাহায্যে শুক্রাণুর গমনক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

লেজ : শুক্রাণুর এই বিশেষ অংশটির সঞ্চালনের ফলে গমন ক্রিয়া সম্ভব হয়। এই অংশটি সূক্ষ্ম সূত্রের চক্র দ্বারা পরিবৃত থাকে। খরগোসের শুক্রাণুর লেজের সূত্রগোষ্ঠীকে অ্যাক্সিয়াল ফিলামেন্ট বলে। অ্যাক্সিয়াল ফিলামেন্ট প্রক্সিমাল সেন্ট্রিওল থেকে লেজের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত থাকে। সূত্রগুলির সজ্জারীতি 2+9+9=20।

অপেক্ষাকৃত স্থূল নটি সূত্র লেজের শেষ পর্যন্ত প্রসারিত থাকে না এবং লেজের বিভিন্ন দূরত্বে এদের পরিসমাপ্তি ঘটে। সূত্রগুলি সংকোচনশীল।

শুক্রাণুর বৈশিষ্ট্য : আদর্শ প্রাণীকোষের তুলনায় পূর্ণগঠিত শুক্রাণুর আকৃতিগত গঠন ভিন্নরূপ। শুক্রাণুর দেহের অধিকাংশ অংশ নিউক্লিয়াস দ্বারা অধিকৃত। এর সাইটোপ্লাজম পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে গমনক্রিয়ায় নিযুক্ত। শুক্রাণুতে কোন সঞ্চিত খাদ্য এবং অতিরিক্ত আবরণ থাকে না। ডিম্বাণুকে উত্তেজিত ও কর্মক্ষম করাই শুক্রাণুর প্রধান কাজ। আয়তনে ক্ষুদ্রতর হলেও ডিম্বাণু অপেক্ষা শুক্রাণুর সংখ্যাধিক্য তাৎপর্যপূর্ণ।

1.2.3 ডিম্বাণুর গঠন ও প্রকারভেদ

ডিম্বাণুর আকৃতি ও গঠন বিভিন্ন প্রাণীদের ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ। কুসুমের পরিমাণ ও বাইরের আবরণের পার্থক্য উল্লেখ্য। মুখ্যতঃ কুসুমের পরিমাণের উপর ডিম্বাণুর আয়তন নির্ভর করে। প্রতিটি ডিম্বাণু প্লাজমা মেমব্রেন দ্বারা পরিবৃত থাকে। প্লাজমা মেমব্রেন দ্বারা আবদ্ধ সাইটোপ্লাজমকে ভাইটিলাস (Vitellus) বলে। ভাইটিলাসের মধ্যে অবস্থিত নিউক্লিয়াসটি সুস্পষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত আকারে বড়। ডিম্বাণুর প্লাজমা মেমব্রেন সংলগ্ন সংকীর্ণ সাইটোপ্লাজম স্তরটিকে কর্টেক্স (Cortex) বলে। ক্ষেত্র বিশেষে কর্টেক্সে কর্টিক্যাল গ্রানিউল (cortical granules) থাকে। নিষেকের সময় গ্রানিউলগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সাইটোপ্লাজমের মধ্যে মাইটোকনড্রিয়া, গলগিবডি এবং কুসুম থাকে। উসাইট অবস্থা থেকেই ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে কুসুম সংশ্লেষিত হয় এবং কুসুম থেকে পরিস্ফুটনরত ভ্রূণ পুষ্টিগ্রহণ করে। ডিম্বাণু কয়েকটি ঝিল্লী দ্বারা পরিবৃত থাকে। ঝিল্লিগুলি বিভিন্ন প্রাণীদের ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ (চিত্র নং 2.3)।

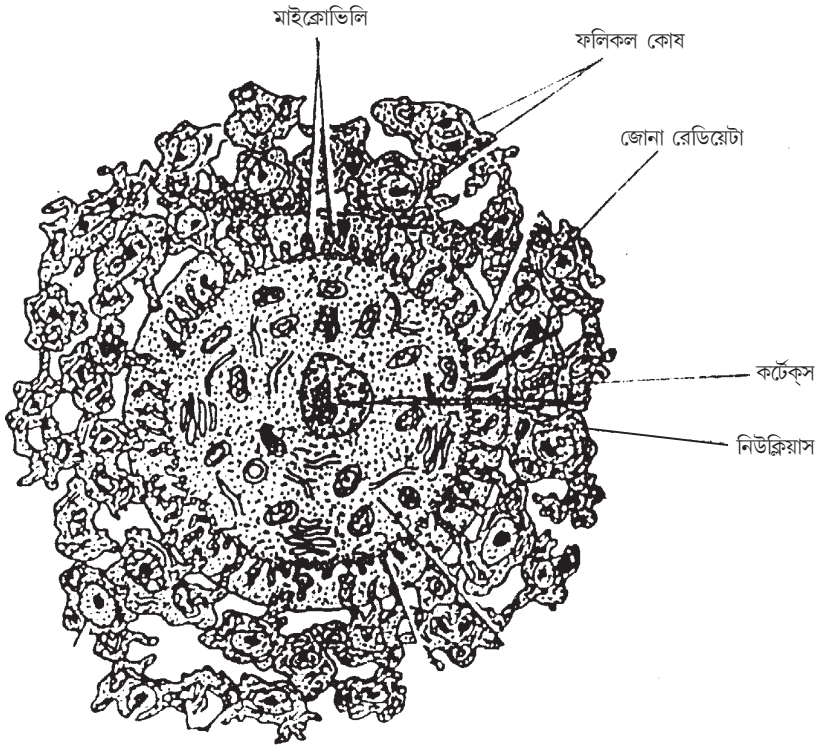

চিত্র নং 2.3 ঃ মানুষের ডিম্বাণুর বর্ধিত চিত্ররূপ

বিভিন্ন প্রাণীদের ডিম্বাণুতে কুসুমের পরিমাণ ভিন্নরূপ। কুসুমের পরিমাণ ও বিস্তারের ভিত্তিতে ডিম্বাণুকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা—

(a) আলেসিথাল (Alecithal) : কুসুমবিহীন ডিম্বাণু। উদাহরণ— অমরাযুক্ত স্তন্যপায়ী।

(b) মাইক্রোলেসিথাল (Microlecithal) : কুসুমের পরিমাণ খুবই কম। উদাহরণ— একনালী প্রাণী।

(c) মেসোলেসিথাল (Mesolecithal) : পরিমিত কুসুম বর্তমান। উদাহরণ— উভচর প্রাণীদের ডিম্বাণু।

(d) মেগালেসিথাল (Megalecithal) : যখন প্রচুর পরিমাণে কুসুম থাকে। উদাহরণ— সরীসৃপ, পাখি ও হংসচঞ্চু। এই ধরনের ডিমে কুসুম একধারে সঞ্চিত থাকে। ওই অবস্থানের জন্য এই প্রকার ডিম্বককে টিলোলেসিথাল (Telolecithal) ডিম বলে।

1.2.4 জনন কোষের উৎপত্তি

জনন কোষের উৎপত্তি উচ্চতর প্রাণীদের পরিস্ফুরণের প্রারম্ভিক দশা। জনন কোষের প্রকৃত উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে বিভিন্ন ভ্রূণতত্ত্ববিদ ভিন্ন ধরনের মতবাদ পোষণ করায় সমস্যাটি জটিল হয়েছে। পরিস্ফুরণের প্রারম্ভিক অবস্থায় জননকোষের পৃথকীকরণ সংঘটিত হয় এবং অন্যত্র সৃষ্ট জনন কোষ প্রকৃত উৎপত্তিস্থল থেকে স্থানচ্যুত হয়ে জনন অঙ্গের অংশরূপে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে। কিভাবে জনন কোষের পরিযানক্রিয়া সম্পন্ন হয় সে সম্বন্ধে নানান মতবাদ বর্তমান। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রাথমিক জনন কোষ জননঅঙ্গে পৌঁছানোর পর সেখানে অবস্থান করে এবং সক্রিয় ডিম্বাণু বা শুক্রাণুতে পরিবর্তিত হয়।

1.2.5 জনন কোষের পরিবর্তন

জননঅঙ্গে অবস্থিত প্রাথমিক জননকোষগুলিকে প্রাইমরডিয়াল জার্ম কোষ (Primordial germ cell) বলে। ঐ কোষ নানা পরিবর্তন ও রূপান্তরের মাধ্যমে পুনর্গঠিত কার্যকরী জনন কোষে পরিণত হয়। পরিবর্তন প্রক্রিয়াটি খুবই জটিল এবং তিনটি সুস্পষ্ট দশায় বিভক্ত। যথা—

(ক) সংখ্যাবৃদ্ধি দশা (Phase of Multiplication)

(খ) বৃদ্ধি দশা (Phase of Growth)

(গ) পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশা (Phase of Maturation)

উপরে উল্লিখিত তিনটি দশায় মৌলিক সাদৃশ্য থাকলেও শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ কয়েকটি বৈসাদৃশ্য থাকে।

1.2.6 স্পার্মাটোজেনেসিস (Spermatogenesis)

শুক্রাশয়ে অবস্থিত প্রাইমরডিয়াল জার্ম কোষ থেকে যে প্রক্রিয়ার শুক্রাণু উৎপন্ন হয় তাকে স্পার্মাটোজেনেসিস বলে। এই প্রক্রিয়ায় শুক্রাণুর উৎপত্তিকালে কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার এবং বিভিন্ন কোষ অঙ্গানুর বিশেষ পরিবর্তন হয়। বর্ণনার সুবিধার জন্য স্পার্মাটোজেনেসিসকে দুটি সুস্পষ্ট পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। যেমন—

(ক) স্পার্মাটিডের উৎপত্তি (Formation of spermatid)

(খ) স্পার্মাটিলিওসিস্ (Spermateleosis) বা স্পার্মিওজেনেসিস (Spermiogenesis)

1.2.6.1 স্পার্মাটিডের উৎপত্তি ঃ

স্পার্মাটিডের উৎপত্তিকালে তিনটি দশা পরিলক্ষিত হয়, যথা—সংখ্যাবৃদ্ধি দশা, বৃদ্ধি দশা এবং পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশা।

সংখ্যাবৃদ্ধি দশা ঃ শুক্রাশয়ের জার্মিনাল এপিথিলিয়ামের প্রাইমরডিয়াল জার্ম কোষগুলি (Primordial germ cell) দুবার মাইটোটিক পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে স্পার্মাটোগোনিয়া (Spermatogonia) উৎপন্ন করে। প্রতিটি প্রাইমরডিয়াল জার্ম কোষ সমবিভাজনের মাধ্যমে দুইটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে। সৃষ্ট কোষদুটিকে প্রাইমারী স্পার্মাটোগোনিয়া (primary spermatogonia) বলে। প্রতিটি প্রাইমারী স্পার্মাটোগোনিয়া কোষ পুনরায় সমবিভাজিত হয় এবং দুটি সেকেন্ডারী স্পার্মাটোগোনিয়া (Secondary spermatogonia) সৃষ্টি করে। সুতরাং সংখ্যাবৃদ্ধি দশায় প্রতিটি প্রাইমরডিয়াল জার্ম কোষ পরপর দুবার মাইটোটিক কোষবিভাজনের সাহায্যে চারটি সেকেন্ডারী স্পার্মাটোগোনিয়া সৃষ্টি করে। প্রতিটি প্রাইমরডিয়াল জার্ম কোষের নিউক্লিয়াসে ডিপ্লয়েড (2n) সংখ্যক ক্রোমোসোম (Chromosome) থাকে এবং সৃষ্ট প্রতিটি সেকেন্ডারী স্পার্মাটোগোনিয়ায় সমসংখ্যক (2n) ক্রোমোসোম বর্তমান (চিত্র নং 2.4)।

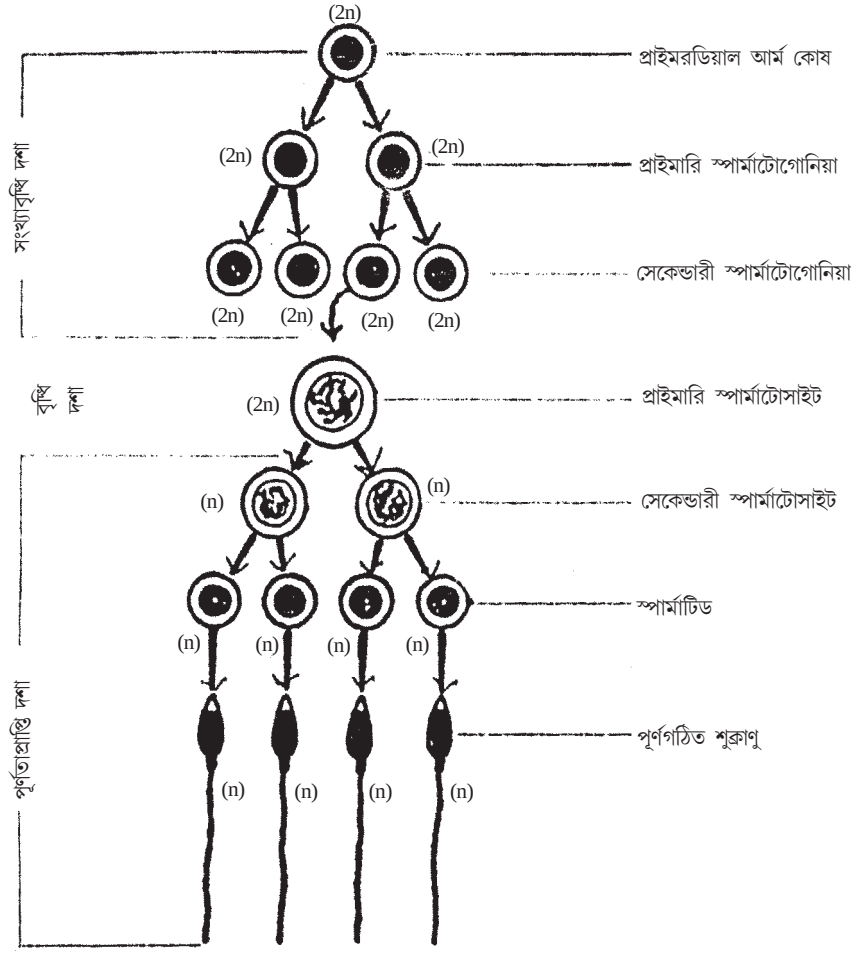

চিত্র নং 2.4 ঃ স্পার্মাটিড সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়

বৃদ্ধি দশা ঃ প্রতিটি স্পার্মাটোগোনিয়া কোষ এই দশায় পুষ্টি গ্রহণ করে আয়তনে বড় হয়। মুখ্যতঃ কোষের প্রোটোপ্লাজম সংশ্লেষের দ্বারা কোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় কোষকে প্রাইমারী স্পার্মাটোসাইট (Primary Spermatocyte) বলে এবং এর নিউক্লিয়াসে ডিপ্লয়েড (2n) সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে।

পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশা ঃ প্রতিটি প্রাইমারী স্পার্মাটোসাইট কোষ মিয়োসিস কোষ বিভাজনের সাহায্যে চারটি অপত্যকোষ সৃষ্টি করে। প্রথম মিয়োসিস বিভাজনের ফলে প্রতিটি প্রাইমারী স্পার্মাটোসাইট থেকে দুটি সেকেন্ডারী স্পার্মাটোসাইট (Secondary Spermatocyte) সৃষ্টি হয়। সৃষ্ট সেকেন্ডারী স্পার্মাটোসাইটের নিউক্লিয়াসে হ্যাপ্লয়েড (n) সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। প্রতিটি সেকেন্ডারী স্পার্মাটোসাইট দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজনের দ্বারা দুইটি সদৃশ হ্যাপ্লয়েড স্পার্মাটিড (spermatid) সৃষ্টি করে। স্পার্মাটিডে উৎপত্তির পর পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশা সমাপ্ত হয়।

1.2.6.2 স্পার্মাটিলিওসিস

পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশায় উৎপন্ন স্পার্মাটিড সক্রিয় পুংজনন কোষরূপে কাজ করতে অক্ষম। জটিল ক্রমিক পরিবর্তন ও রূপান্তরের মাধ্যমে প্লাসটিড সক্রিয় পূর্ণগঠিত শুক্রাণুতে পরিণত হয়। প্রক্রিয়াটিকে স্পার্মাটিলিওসিস বলে।

স্পার্মাটিডের গঠন একটি আদর্শ প্রাণিকোশের মত। স্পার্মাটিডের সাইটোপ্লাজমে গলগি বডি (Golgi body), মাইটোকনড্রিয়া (Mitochondria), সেন্ট্রোসোম (Centrosome) প্রভৃতি থাকে। নিউক্লিয়াসটি আদর্শ কোষের মত, কিন্তু ক্রোমোসোম সংখ্যা হ্যাপ্লয়েড। নিম্নবর্ণিত পরিবর্তন ও রূপান্তরের মাধ্যমে স্পার্মাটিড সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট পুর্ণগঠিত শুক্রাণুতে পরিণত হয় (চিত্র নং 2.5)।

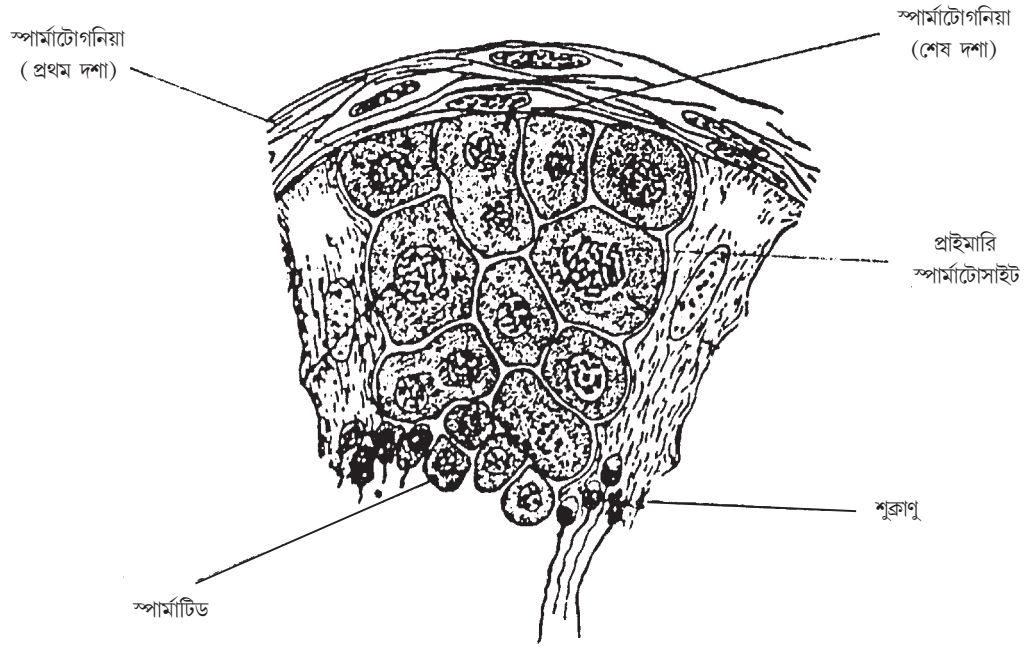

চিত্র নং 2.5 ঃ মানুষের শুক্রাশয়ের আণুবীক্ষণিক চিত্ররূপ ঃ সেমিনিফেরাস টিবিউলের মধ্যে শুক্রাণু সৃষ্টি

স্পার্মাটিলিওসিস প্রক্রিয়ার আরম্ভে সেন্ট্রোসোমের সেন্ট্রিওলটি (Centriole) বিভাজিত হয়ে দুটি সেন্ট্রিওলে পরিণত হয়। নিউক্লিয়াসের নিকটবর্তী সেন্ট্রিওলটিকে প্রক্সিমাল সেন্ট্রিওল (Proximal Centriole) এবং অপরটিকে ডিস্টাল সেন্ট্রিওল (Distal Centriole) বলে। প্রাথমিক অবস্থায় গলগিবডি জালকাকার অঙ্গানুরূপে স্পার্মাটিডের

নিউক্লিয়াসের কাছে সাইটোপ্লাজমে অবস্থান করে। প্রথমতঃ গলগিবডির মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকার থলির উদ্ভব হয় এবং প্রতিটি থলির অভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্রাকার দানার সৃষ্টি হয়। ক্রমে ক্ষুদ্রাকার থলিগুলি একত্রিত হয়ে একটি বৃহৎ থলিতে পরিণত হয়। থলিটিকে অ্যাক্রোসোমাল ভেসিকল্ (Acrosomal Vesicle) বলে। ভেসিকল্ সৃষ্টির পর দানাগুলি মিলিত হয়ে একটি বড় আকারের অ্যাক্রোসোমাল গ্র্যানিউল (Acrosomal Granule) গঠন করে।

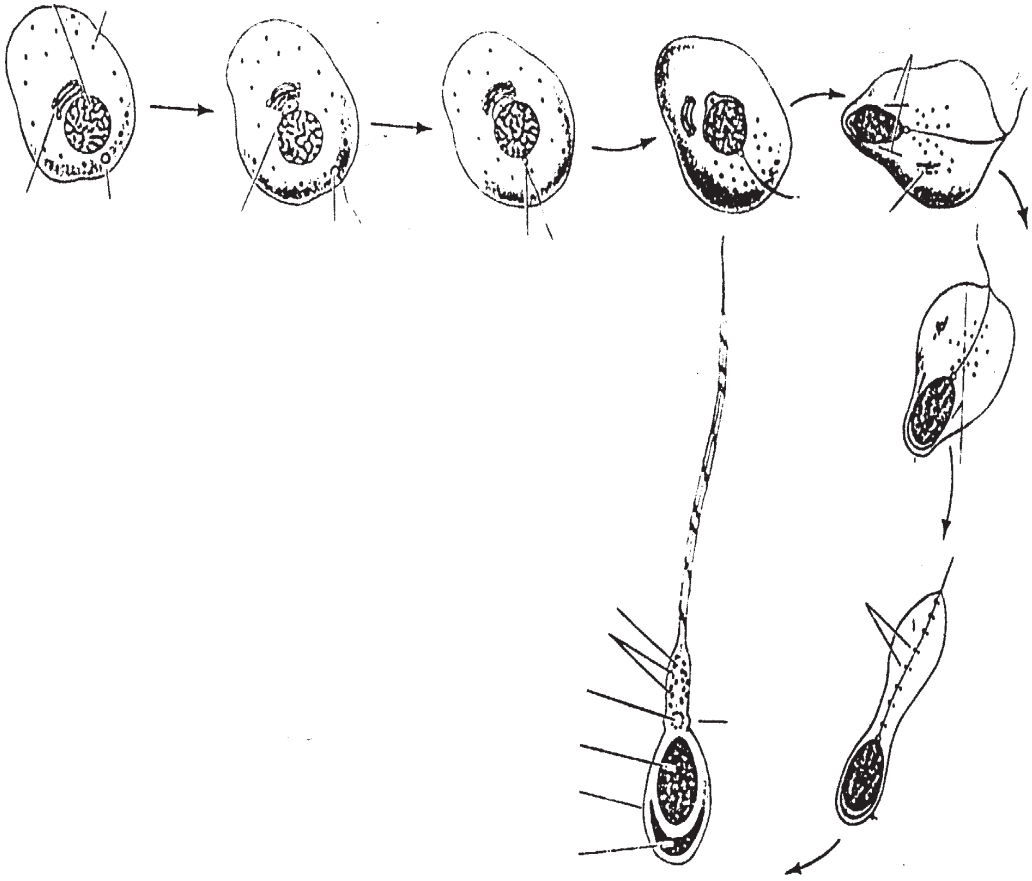

চিত্র নং 2.6 ঃ স্পার্মাটিলিওসিসের বিভিন্ন দশা ঃ (a) গলগিবডির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলির উদ্ভব। থলিগুলিকে ভেসিকল বলে। প্রতিটি ভেসিকলের অভ্যন্তরে একটি করে দানা বা গ্র্যানিউলের উদ্ভব হয়। সেন্ট্রিওল একটি লম্বা ফ্লাজেলাম তৈরী করে যা পরে শুক্রাণুর শেষভাগে পরিণত হয়। গলগিবডি পরবর্তীকালের সম্মুখভাগের অ্যাক্রোসোম ভেসিকল তৈরী করে। মাইটোকনড্রিয়া ফ্লাজেলামের চারদিকে জমা হয় হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের গোড়ায় এবং শুক্রাণুর মধ্যভাগে প্রোথিত হয়। বাকী সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াস ঘনসন্নিবিষ্ট হয়।

অ্যাক্রোসোমাল ভেসিকলটি নিউক্লিয়াসের অগ্রভাগে টুপির মত প্রসারিত হয় এবং নিউক্লিয়াসটি কোষের একপ্রান্তে স্থানান্তরিত হয় (চিত্র নং 2.5)। এই সময় সেন্ট্রিওল দুটি কোষের প্লাজমালেমার কাছাকাছি আসে এবং ডিস্টাল সেন্ট্রিওলটি প্লাজমালেমার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। সংযোগস্থল থেকে উৎপন্ন একটি সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় গঠন ক্ষুদ্র ফ্লাজেলার আকারে কোষের বাইরে প্রসারিত হয় এবং শুক্রাণুর লেজের অ্যাক্সিয়াল ফিলামেন্ট (Axial Filament) গঠন করে। পরে সেন্ট্রিওল দুটি নিউক্লিয়াসের পশ্চাৎদিকের খাঁজে নিজেকে

যুক্ত করে এবং ডিস্টাল সেন্ট্রিওলটি প্লাজমালেমাসমেত নিউক্লিয়াস আবরণী পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ফলে অ্যাকসিয়াল ফিলামেন্টটি কোষের মধ্যে অবস্থিত মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি কোষের বাইরে থাকে। অ্যাকসিয়াল ফিলামেন্ট দুস্তর প্লাজমালেমা দ্বারা পরিবৃত থাকে। অ্যাকসিয়াল ফিলামেন্ট দুস্তর প্লাজমালেমা দ্বারা পরিবৃত থাকে। প্রকসিমাল সেন্ট্রিওলটি প্লাজমালেমা ভাঁজসমেত কোষের কিনারায় আবার ফিরে আসে। সেন্ট্রিওলদ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশটি ক্রমে শুক্রাণুর মধ্যমাংশে পরিণত হয়। মধ্যমাংশে অবস্থিত অ্যাকসিয়াল ফিলামেন্টের চারপাশে মাইটোকনড্রিয়াগুলি সন্নিবেশিত হয়ে সর্পিলাকার কুন্ডলীর আকার ধারণ করে। এইভাবে মাইটোকনড্রিয়াল স্পাইরাল (Mitochondrial Spiral) গঠিত হয়। ক্রমবর্ধনের সময় শুক্রাণুটি প্রলম্বিত হয়। এর সাইটোপ্লাজম প্রায় নিঃশেষিত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ পরিত্যক্ত হয়। অ্যাকসিয়াল ফিলামেন্টটি একটি দীর্ঘ ফ্লাজেলা গঠন করে কোষের বাইরে প্রসারিত হয়। প্রকসিমাল সেন্ট্রিওল থেকে সৃষ্ট সূক্ষ্ম তন্তু অ্যাকসিয়াল ফিলামেন্টটিকে পরিবৃত করে এবং শুক্রাণুর লেজ গঠনে অংশগ্রহণ করে। এইভাবে নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিণত শুক্রাণুর বিভিন্ন অংশ গঠিত হয় (চিত্র নং 2.6)।

1.2.7 ঊজেনেসিস (Oogenesis)

যে প্রক্রিয়ায় ডিম্বাশয়ে (Ovary) অবস্থিত প্রাইমরডিয়াল জার্ম কোষ থেকে ডিম্বাণু (Ovum) উৎপন্ন হয় তাকে ঊজেনেসিস বলে। স্পার্মাটোজেনেসিসের মত ঊজেনেসিস প্রক্রিয়ায় তিনটি দশা দেখা যায়। দশা তিনটি ঃ সংখ্যাবৃদ্ধি দশা, বৃদ্ধি দশা ও পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশা।

সংখ্যাবৃদ্ধি দশা : প্রতিটি প্রাইমরডিয়াল জার্ম কোষের দুবার মাইটোটিক বিভাজনের ফলে চারটি অপত্য কোষ উৎপন্ন হয়। প্রথম বিভাজনে সৃষ্ট দুটি কোষকে প্রাইমারী উগোনিয়া (Primary Oogonia) বলে এবং দ্বিতীয় বিভাজনে প্রতিটি প্রাইমারী উগোনিয়াম (Oogonium) থেকে যে দুটি কোষ উৎপন্ন হয় তাদের সেকেন্ডারী উগোনিয়া (Secondary Oogonia) বলে। প্রতিটি জার্মকোষের নিউক্লিয়াসে ডিপ্লয়েড (Diploid) সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে।

বৃদ্ধি দশা : প্রতিটি সেকেন্ডারী উগোনিয়াম পুষ্টি গ্রহণ করে আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধি দশাটি প্রলম্বিত এবং নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ওই কোষটিকে প্রাইমারী উসাইট (Primary Oocyte) বলে। নিউক্লিয়াসটি ভীষণভাবে স্ফীত হয়ে থলির আকার ধারণ করে, তখন একে জার্মিনাল ভেসিকল (Germinal vesicle) বলে। ভেসিকলটি তরল নিউক্লিয়ার স্যাপ (Nuclear Sap) দিয়ে পূর্ণ থাকে। ওই সময় নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থিত ক্রোমোসোম গুলিতে সুস্পষ্ট পরিবর্তন এবং সাইটোপ্লাজমে ডি.এন.এ. নিয়ন্ত্রিত প্রোটিন সংশ্লেষিত হয় (চিত্র নং 2.7)।

পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশা ঃ প্রাইমারী ঊসাইট মিয়োসিস কোষবিভাজন পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়। প্রথম বিভাজনে দুটি অসম অপত্যকোষ উৎপন্ন হয় (চিত্র নং 2.7)। সৃষ্ট কোষ দুটির মধ্যে বড়টিকে সেকেন্ডারী ঊসাইট (Secondary Oocyte) এবং ছোটটিকে প্রথম পোলোসাইট (First Polocyte) বলে। সেকেন্ডারী ঊসাইট ও প্রথম পোলোসাইটের নিউক্লিয়াসে হ্যাপ্লয়েড (n) সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। দ্বিতীয় বিভাজনের সময় সেকেন্ডারী ঊসাইট থেকে আবার দুটি অসমান অপত্যকোষ উৎপন্ন হয়। সৃষ্ট কোষ দুটোর মধ্যে বড়টিকে ঊটিড (Ootid) এবং ছোটটিকে দ্বিতীয় পোলোসাইট (Second Polocyte) বলে। প্রথম পোলোসাইট বিভাজিত হয়ে দুটি সমান মাপের পোলোসাইট সৃষ্টি করে। পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশায় সৃষ্ট চারটি হ্যাপ্লয়েড কোষের মধ্যে কেবলমাত্র ঊটিড সক্রিয় ডিম্বাণুতে (Ovum) পরিণত হয়। তিনটি পোলোসাইট নিষ্ক্রিয় থাকে এবং পরে বিনষ্ট হয়। ডিম্বাণুতে পরিণত হওয়ার সময় ঊটিডের

সাইটোপ্লাজমে নানান পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রধান পরিবর্তন হল সাইটোপ্লাজমে কুসুমের (Yolk) সঞ্চয়। সঞ্চিত কুসুম ভাবী ভ্রূণের পুষ্টি প্রদান করে। ডিম্বাণু পরিবৃত ফলিকল্ কোষ থেকে কুসুম সংশ্লেষিত হয়।

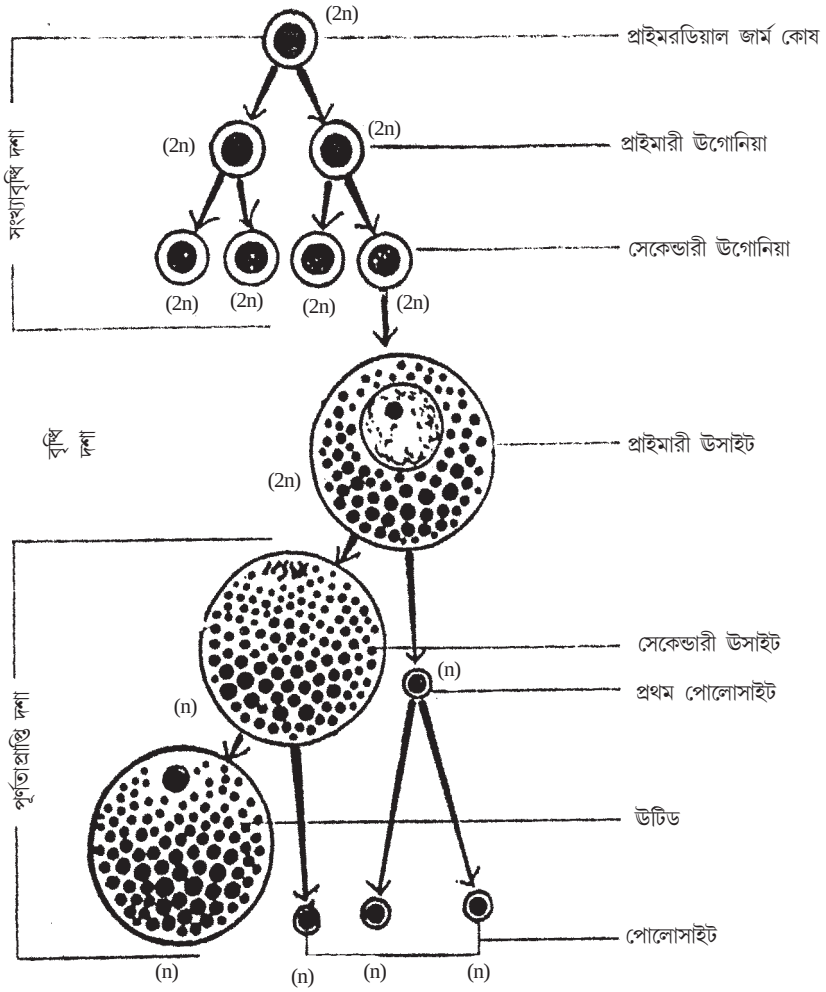

চিত্র নং 2.7 ঃ উজেনেসিসের ঘটনাপ্রবাহ

1.2.8 স্পার্মাটোজেনেসিস ও উজেনেসিস—তুলনামূলক আলোচনা

উভয় প্রক্রিয়ার প্রথম দশাটি অর্থাৎ সংখ্যাবৃদ্ধি দশাটির মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও পরবর্তী ঘটনাবলীর মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। এদের পার্থক্য নীচে দেওয়া হল।

	স্পার্মাটোজেনেসিস	উজেনেসিস
1. বৃদ্ধিদশায়	প্রাইমারী স্পার্মাটোসাইটের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের বৃদ্ধি ও সংশ্লেষ প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত।	প্রাইমারী ঊওসাইটের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমে বৃদ্ধি ও সংশ্লেষ প্রক্রিয়া বহুলাংশে বেশী।
2. পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশায়	প্রতিটি প্রাইমারী স্পার্মাটোসাইট থেকে চারটি সমআয়তনযুক্ত স্পার্মাটিড সৃষ্টি হয়। স্পার্মাটিড থেকে শুক্রাণু উৎপন্ন হয়।	প্রতিটি প্রাইমারী-ঊসাইট থেকে একটি কার্যক্ষম বৃহৎ ঊওটিড এবং তিনটি নিষ্ক্রিয় ক্ষুদ্রাকার পোলোসাইট সৃষ্টি হয়। কেবলমাত্র ঊওটিড থেকেই ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়।
(a) নিউক্লিয়াস	ক্ষুদ্রাকার থাকে।	আকার বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।
(b) নিউক্লিয়ার রস	পরিমাণ কম থাকে।	পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।
(c) নিউক্লিয়াসের পূর্ণতা	সাইটোপ্লাজমের বিভেদের পূর্বেই সংঘটিত হয়।	সাইটোপ্লাজমের বিভেদ ও নিউক্লিয়াসের পূর্ণতাপ্রাপ্তি একই সঙ্গে সংঘটিত হয়।
(d) সাইটোপ্লাজম	কোন খাদ্য সঞ্চিত থাকে না। বেশীরভাগই পরিত্যক্ত হয়।	প্রচুর পরিমাণে খাদ্যবস্তু সঞ্চিত থাকে। পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

1.2.9 নিষেকের প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

নিষেক পদ্ধতিতে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটে। এটা ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুরণের দ্বিতীয় দশা। নিষেকের সময় থেকেই ভ্রূণের পরিস্ফূরণ আরম্ভ হয় এবং হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোসোমযুক্ত শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলিত হয়ে ভ্রূণের কোষে ডিপ্লয়েড ক্রোমোসোম সংখ্যা বজায় রাখে। আপাতদৃষ্টিতে নিষেক একটি সাধারণ প্রক্রিয়া মনে হলেও এটি একটি খুবই জটিল প্রক্রিয়া এবং অসংখ্য ভৌত ও রাসায়নিক ঘটনার সমন্বয়ে তা সম্পন্ন হয়। ডিম্বাণুর সক্রিয়তা অর্জন ও অপত্যপ্রাণীতে পিতামাতার বংশগতিজনিত বৈশিষ্ট্যগুলি সঞ্চালন নিষেকের দ্বারা সংগঠিত হয়।

এই অংশটি পাঠ করে আপনি

- নিষেকের দ্বারা কিভাবে হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোসোমযুক্ত শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে ডিপ্লয়েড ক্রোমোসোমযুক্ত জাইগোট সৃষ্টি হয়, তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- নিষেককালে ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশকালে উদ্ভূত ভৌতরাসায়নিক বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জাইগোটের মাধ্যমে জীনগত প্রকরণের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

1.2.10 নিষেকের প্রকারভেদ

মিলনক্রিয়ার প্রারম্ভে পরিণত শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর পরস্পর সম্মুখীন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রাণীজগতে দুই প্রকার নিষেক পরিলক্ষিত হয়, যথা—

(ক) **বাহ্য নিষেক ঃ** মাছ, উভচর ও জলবাসী অমেরুদন্ডী প্রাণীদের নিষেক দেহের বাহিরের জলে সংঘটিত হয়। এই ধরনের নিষেককে বাহ্য নিষেক বলে।

(খ) **অভ্যন্তরীণ নিষেক ঃ** এই ক্ষেত্রে (সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণী) পরিণত ডিম্বাণু স্ত্রীদেহের ডিম্বনালীর গহবরে অবস্থান করে। যৌনমিলনের সময় পুরুষদেহ থেকে শুক্রাণু স্ত্রীদেহের নির্দিষ্ট অংশে নিক্ষেপিত হয়। এই ধরনের নিষেককে অভ্যন্তরীণ নিষেক বলে।

1.2.11 নিষেকের ঘটনাপ্রবাহ

নিষেককালীন ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে কয়েকটি পর্যায়ে বর্ণনা করা যায়।

(ক) শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর পরস্পরের সম্মুখীন হওয়া

(খ) শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সংযোগস্থাপন এবং অ্যাগ্লুটিনেশন

(গ) অনুপ্রবেশ

(ঘ) সক্রিয়তা অর্জন

(ঙ) প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের পরিযান ও অ্যাম্ফিমিকসিস্

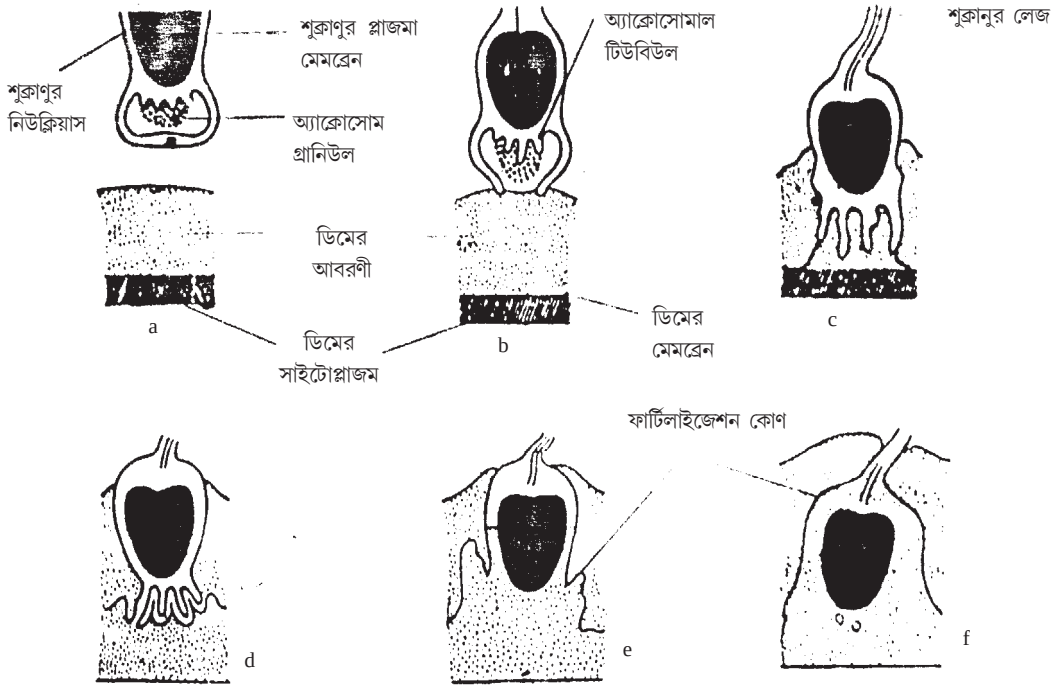

চিত্র নং 2.8 ঃ নিষেককালে (a-f) অ্যাক্রোসোম বিক্রিয়া ও ডিম্বাণুর মধ্যে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ। (a) শুক্রাণুর ডিম্বাণুর নিকটবর্তী আসা, (b) ডিম্বাণু আবরণীর সংস্পর্শে আসা শুক্রাণুর শীর্ষে পরিবর্তন (c) প্রক্ষিপ্ত অ্যাক্রোসোম প্রাচীর, (d) জনন কোষদ্বয়ের প্লাজমা-মেমব্রেনের সংযুক্তি, (e) ফার্টিলাইজেশন কোণের উৎপত্তি ও (f) শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ।

1.2.11.1 শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সম্মুখীন হওয়া

নিষেককালে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর কাছাকাছি আসা একান্ত প্রয়োজন। নানান পদ্ধতিতে গ্যামেট দুটি পরস্পরের কাছাকাছি আসে। নিষেককালে প্রচুর সংখ্যায় শুক্রাণু পরিণত ডিম্বাণুর নিকটবর্তী হয়। যান্ত্রিক প্রক্রিয়া ছাড়াও এদের আকর্ষণের জন্য রাসায়নিক বস্তুর উপস্থিতি ও কেমোট্যাকসিসের (Chemotaxis) গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ।

1.2.11.2 শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সংযোগস্থাপন এবং অ্যাগ্লুটিনেশন

শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সংযোগস্থাপন নিষেকের প্রাথমিক ঘটনা। পরিণত ডিম্বাণুর আবরণী থেকে নিঃসৃত নির্দিষ্ট রাসায়নিক বস্তু একই প্রজাতির শুক্রাণুকে ডিম্বাণুগাত্রে আটকে রাখতে সাহায্য করে। এই অবস্থায় অনেকগুলি শুক্রাণু ডিম্বাণুগাত্রে যুক্ত হয়। শুক্রাণুগুলির এই ধরনের সমবেত হবার প্রক্রিয়াকে অ্যাগ্লুটিনেশন (Agglutination) বলে। জটিল ভৌত ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর সংযোগস্থাপন ও মিলনক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ডিম্বাণুর মধ্যে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ ঘটলে প্রকৃত পরিস্ফুরণ আরম্ভ হয়। নিষেককালে ডিম্বাণু অভিমুখে শুক্রাণুর আকর্ষণের জন্য একাধিক রাসায়নিক বস্তুর উপস্থিতি প্রমাণিত। শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সংযোগস্থাপনকালে ভৌত প্রক্রিয়ার সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংযোজিত হয়। ফার্টিলাইজিন (Fertilizin) এবং অ্যান্টিফার্টিলাইজিন (Antifertilizin) নামক দুটি জটিল রাসায়নিক পদার্থের সহক্রিয়ার সী আর্চিনের ক্ষেত্রে ডিম্বাণুর মধ্যে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ গঠিত হয়।

ফার্টিলাইজিন ঃ পরীক্ষাগারে একটি কাঁচের পেট্রিডিসে সমুদ্রের জলে সী-আর্চিনের কয়েকটি ডিম্বাণু কিছু সময় ধরে রাখা হল এবং পরে অপসারিত করা হল। এরপর ঐ দ্রবণে বেশ কিছু শুক্রাণু যদি স্থাপন করা হয় তবে তাদের মধ্যে একত্রিত হবার প্রবণতা দেখা যায়। একে অ্যাগ্লুটিনেশন বলে। ফার্টিলাইজিন হল ডিম্বাণুর জেলী আবরণী থেকে ক্ষরিত এক বিশেষ ধরনের পদার্থ এবং এটি শুক্রাণুগুলির একত্রিত হবার ক্ষমতা দান করে। এর আণবিক ওজন 82,000 অপেক্ষা বেশী এবং কয়েকপ্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং পলিস্যাকারাইড সংযুক্ত থাকে।

অ্যান্টি ফার্টিলাইজিন ঃ শুক্রাণু থেকে নিঃসৃত এটি একটি আম্লিক প্রোটিন। ফার্টিলাইজিন ও অ্যান্টিফার্টিলাইজিন বস্তুদ্বয়ের বিক্রিয়ার ফলে সমসংস্থ শুক্রাণুসমূহের মধ্যে অ্যাগ্লুটিনেশন সংঘটিত হয়।

ফার্টিলাইজিন-অ্যান্টিফার্টিলাইজিন বিক্রিয়া ঃ ফার্টিলাইজিন ও অ্যান্টিফার্টিলাইজিন বিক্রিয়া অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি বিক্রিয়ার মত প্রজাতি নির্দিষ্ট। ডিম্বাণুর বহিরাবরণ থেকে ক্ষরিত ফার্টিলাইজিন মস প্রজাতির শুক্রাণুগুলিকে সক্রিয় করে এবং পজিটিভ কেমোট্যাকসিস (Positive Chemotaxis) দ্বারা ডিম্বাণু গাত্রে আটকে রাখতে সাহায্য করে। এই অবস্থায় ফার্টিলাইজিন হল মাল্টিভ্যালেন্ট এবং এদের অণুগুলি একাধিক শুক্রাণুতে আটকাতে সক্ষম। নিষেকের সময় বিপরীতধর্মী গ্যামেটদ্বয়ের সংযোগ স্থাপনে অ্যান্টিফার্টিলাইজিন এবং ফার্টিলাইজিনের বিক্রিয়া একান্ত প্রয়োজন।

1.2.11.3 অনুপ্রবেশ

পরিণত ডিম্বাণুমাত্র স্পর্শ করার পর শুক্রাণুদের গমনক্ষমতা বিলুপ্ত হয় এবং ডিম্বাণুর ভিতরে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ অ্যাক্রোসোম বিক্রিয়ার দ্বারা হয়। স্তন্যপায়ীদের শুক্রাণু থেকে নিঃসৃত হায়ালুরোনিডেজ (Hyaluronidase) নামক স্পার্ম লাইসিন (Sperm lysin) বা লাইটিক এজেন্ট ডিম্বাণুর আবরণী ভেদ করে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেয়।

অ্যাক্রোসোম বিক্রিয়া ও অনুপ্রবেশ ঃ ডিম্বাণুর ভিতরে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে নানা মতবাদ আছে। কেউ কেউ মনে করেন নিষেককালে ডিম্বাণুর প্লাজমামেমব্রেন নির্দিষ্ট পিনোসাইটোসিস (Pinocytosis) প্রক্রিয়ার শুক্রাণুর মস্তকাংশ ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে অধিগ্রহণ করে। কিন্তু ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে স্যাক্কোগ্লসাস (Saccoglossus) নামক হেমিকর্ডাটা এবং হাইড্রয়ডিস (Hydroides) নামক অঙ্গুরীমাল প্রাণীদের ডিম্বাণুর মধ্যে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশের ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানা গেছে।

পূর্বে ধারণা ছিল, নিষেককালে কেবলমাত্র শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিউক্লিয়াসদ্বয়ের মিলন সংঘটিত হয়। ইলেকট্রন

মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে নিষেক সম্বন্ধে আমাদের গতানুগতিক ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। নিষেককালে উভয় জনন কোষের সম্পূর্ণ সংযুক্তি ও মিলন ঘটে। ঘটনাটি হল—

প্রথমে শুক্রাণুর মস্তকাংশ ডিম্বাণুর ভাইটেলাইন মেমব্রেনের সংস্পর্শে আসে। শুক্রাণুর মস্তকাংশের প্লাজমা মেমব্রেন ও অ্যাক্রোসোম ভেসিকলের মেমব্রেন পরস্পর যুক্ত হলে এদের মধ্যস্থান ভেঙে যায়। ফলে অ্যাক্রোসোম গ্র্যানিউল ডিম্বাণু ভাইটেলাইশন মেমব্রেনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে এবং স্পার্মলাইসিন নামক উৎসেচক ক্ষরিত হয়। এই উৎসেচক ডিম্বাণুর আবরণীকে দ্রবীভূত করে। দ্রবীভূত অংশের মধ্য দিয়ে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ ঘটে। অ্যাক্রোসোম ভেসিকলের প্লাজমা মেমব্রেন থেকে সৃষ্ট একটি বা অনেকগুলি প্রলম্বিত অ্যাক্রোসোমাল টিউবিউল (Acrosomal tubule) ভাইটেলাইন মেমব্রেন ভেদ করে ডিম্বাণুর প্লাজমা মেমব্রেনের সংস্পর্শে আসে।

আবার ডিম্বাণুর প্লাজমা মেমব্রেন থেকে একটি বা অনেকগুলি আঙুলের মত উপবৃধ্বি বা ভিলাই উৎপন্ন হয়। অবশেষে অ্যাক্রোসোমাল টিউবিউল এবং ভিলাই পরস্পর সংযুক্ত হয়ে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করে। ক্রমে ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজম অভিক্ষেপিত হয়ে প্রথমে শুক্রাণুর মস্তক এবং ক্রমে মধ্যমাংশ ও লেজকে পরিবৃত করে। ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমের শঙ্কু যা মোচার ন্যায় অংশকে ফার্টিলাইজেশন কোন (Fertilization cone) বলে।

অবশেষে শুক্রাণুর প্লাজমা মেমব্রেন ও ডিম্বাণুর প্লাজমা মেমব্রেন একীভূত হয়ে উদ্ভূত জাইগোটের মেমব্রেন গঠন করে। অধিকাংশ প্রাণীদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র শুক্রাণুর নিউক্লিয়াস ও মধ্যমাংশ ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে। কিন্তু স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে শুক্রাণুর নিউক্লিয়াস, মধ্যমাংশ ও লেজ ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে। অ্যাক্রোসোমাল গ্রানিউলগুলি কোন সময়ই ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না। বর্ণিত ঘটনাবলী স্যাক্কোগ্নসাস ও হাইড্রয়ডিসের মত অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রে ঘটলেও কয়েকটি প্রাণীর ক্ষেত্রে অ্যাক্রোসোম থেকে সৃষ্ট অ্যাক্রোসোম ফিলামেন্ট (Acrosome filament) ডিম্বাণুর আবরণী ভেদ করে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশের পথ সৃষ্টি করে।

অনুপ্রবেশের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঃ ডিম্বাণুর মধ্যে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ মুখ্যতঃ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল। নিষেককালে এফ. আর. লিলির (F.R. Lillie, 1919) ফার্টিলাইজিন অ্যান্টিফার্টিলাইজিন মতবাদ উপস্থাপনার মত বিভিন্ন প্রাণীবিদ্ অনুপ্রবেশের রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন।

টাইলারের (Tyler) মতে শুক্রাণু থেকে নিঃসৃত হায়ালুরোনিডেজ (Hyaluronidase) নামক স্পার্মলাইসিন দ্বারা ডিম্বাণুর আবরণীর স্থানিক দ্রবীভবন ডিম্বাণুর মধ্যে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশের পথ সৃষ্টি করে। কিন্তু অধিকাংশে ভ্রূণতত্ত্ববিদ নিষেকে অংশগ্রহণকারী সকল রাসায়নিক বস্তুকে সামগ্রিকভাবে গ্যামোনস (Gamones) বলেন। শুক্রাণু থেকে উৎপন্ন অ্যান্ড্রোগ্যামোন্স (Androgamones) এবং ডিম্বাণু থেকে সৃষ্ট গাইনোগ্যামোনস্ (Gynogamones) এর ভারসাম্যের উপর স্বাভাবিক নিষেক নির্ভরশীল। আর.এন.এ. (R.N.A.) যৌগ থেকে গ্যামোনস্ উৎপন্ন হয় এবং গ্যামেটের আবরণীতে সঞ্চিত আর.এন.এ এর ঘনত্ব খুব বেশী থাকে।

1.2.11.4 সক্রিয়তা অর্জন

নিষেকের আগে ডিম্বাণুর বিপাকীয় ক্রিয়াগুলি ন্যূনতম অবস্থায় থাকে। কিন্তু নিষেকের পরই ডিম্বাণুর বিপাকীয় ক্রিয়া বৃধ্বি পায় এবং সুপ্ত ডিম্বাণু সক্রিয় হয়। শুক্রাণু অনুপ্রবেশের পর ডিম্বাণুর সংগঠনিক রদবদল বহুমুখী। উক্ত প্রক্রিয়াগুলিকে সামগ্রিকভাবে ডিম্বাণুর সক্রিয়তা বলে। সমস্ত সাংগঠনিক পরিবর্তনের মধ্যে কর্টিক্যাল বিক্রিয়া এবং ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেন গঠন উল্লেখযোগ্য।

নিষেককালে অনেকগুলি শুক্রাণু ডিম্বাণু সংলগ্ন হয়, কিন্তু কেবলমাত্র একটি শুক্রাণু ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় এবং জাইগোট গঠন করে। অবশিষ্ট শুক্রাণুগুলি বা বিলম্বিত শুক্রাণুগুলি আর ডিম্বাণুর

অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। ডিম্বাণুর প্লাজমা মেমব্রেনের বাইরে একটি বিশেষ আবরণ সৃষ্টি হয় যার জন্য ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে একাধিক শুক্রাণু প্রবেশ করতে পারে না। সৃষ্ট এই আবরণটিকে বলে ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেন (Fertilization membrane)।

নিষেকের পর ডিম্বাণুর সক্রিয়তা অর্জনের প্রথম সূচক হল ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমের কর্টেক্সে ধারাবাহিক ভৌত রাসায়নিক বিক্রিয়া (কর্টিক্যাল রিঅ্যাকসন—Cortical reaction) এবং ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেন সৃষ্টি। অধিকাংশ প্রাণীদের উক্ত গঠন পদ্ধতির মধ্যে সমতা থাকলেও সী-আর্চিন নামে এক ধরনের কণ্টকত্বক প্রাণীর কর্টিক্যাল রিঅ্যাকশন ও ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেন গঠন প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট।

সী-আর্চিনের ডিম্বাণুর আবরণটি অনিষিক্ত অবস্থায় দুটি ঝিল্লি দ্বারা গঠিত। বাইরের ঝিল্লীটিকে ভাইটেলাইন মেমব্রেন (Vitelline membrane) এবং ভিতরেরটিকে প্লাজমা মেমব্রেন বলে। প্লাজমা মেমব্রেনের তলদেশে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকার কর্টিক্যাল গ্র্যানিউল (Cortical granules) সজ্জিত থাকে। গ্র্যানিউলগুলি মিউকোপ্রোটীন দ্বারা গঠিত। কর্টিক্যাল গ্র্যানিউলগুলি প্লাজমা মেমব্রেন সৃষ্ট থলির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। উক্ত গ্র্যানিউলগুলি আপাতদৃষ্টিতে ডিম্বাণুর

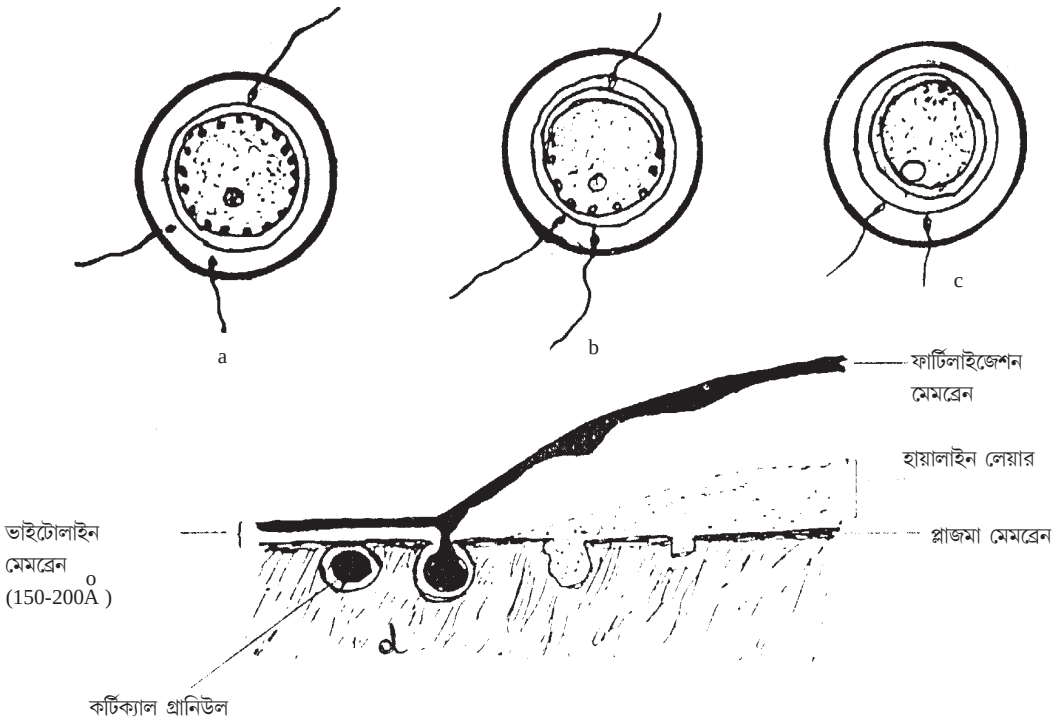

চিত্র নং 2.9 ঃ সী-আর্টিনের নিষেককালে কর্টিক্যাল গ্র্যানিউলের বিস্ফোরণ ও ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেন সৃষ্টি পর্ব। ($1\text{Å} = 10^{-1}$ nm)

প্লাজমা মেমব্রেনের অভ্যন্তরে দৃষ্ট হলেও প্রকৃতপক্ষে এরা প্লাজমা মেমব্রেনের বাইরে অবস্থিত। ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমের সাথে শুক্রাণুর সংযোগ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে কর্টিক্যাল গ্র্যানিউলগুলির পরিবর্তন সূচিত হয়। গ্র্যানিউলগুলি স্ফীত হয়ে প্লাজমা মেমব্রেন থলির মধ্যে বিস্ফোরিত হয় এবং বিচ্ছুত উপাদানগুলি ভাইটেলাইন মেমব্রেনের অঞ্চলে সংযোজিত হয়। ফলে মেমব্রেনটি পুরু হয় এবং সৃষ্ট ঝিল্লিটিকে ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেন বলে।

এই ঝিল্লিটি বিলম্বে উপস্থিত শুক্রাণুদের ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেয় না। এক বিশেষ ধরনের

তরল পদার্থের সঞ্চয়ের ফলে ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেনটি ডিম্বাণুর প্লাজমা মেমব্রেন থেকে ক্রমে আলাদা হয়ে যায়। ডিম্বাণুর প্লাজমা মেমব্রেন থেকে সূক্ষ্ম অভিক্ষেপের উদ্ভব হয় এবং এটি একটি সমসত্ত্ব হায়ালাইন স্তর (Hyaline layer) দ্বারা পরিবৃত হয়। হায়ালাইন স্তর ও ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেনের মধ্যবর্তী স্থানটিকে পেরিভাইটেলাইন স্পেস (Perivitelline space) বলে। অভেদ্য ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেন সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য হল নিষিক্ত ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে বহু শুক্রাণুর অনুপ্রবেশে বাধা সৃষ্টি করা। এই বাধাদানকে ব্লক টু পলিস্পার্মি (Block of Polyspermy) বলে।

1.2.11.5 প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের পরিযান ও অ্যাম্ফিমিক্সিস

ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মধ্যে সাইটোপ্লাজমের সেতু স্থাপনের পর সেই সেতুপথে শুক্রাণু ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের মিলন ডিম্বাণুর সক্রিয়তা অর্জনের পরবর্তী ঘটনা। প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের মিলন পদ্ধতি প্রাণীদের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সম্পন্ন হয়। আদর্শ উদাহরণ হিসাবে কোলাব্যাঙের নিষেকে প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ে পরিযান ও মিলন পদ্ধতি বর্ণনা করা হল।

শুক্রাণুর মস্তক ও মধ্যমাংশে ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অনুপ্রবেশের পর ডিম্বাণুর মিয়োসিস কোষবিভাজন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় এবং সেন্ট্রিওলটির বিলুপ্তি ঘটে। অনুপ্রবেশের পর শুক্রাণুর অংশ 180°-তে আবর্তিত হয়। ফলে শুক্রাণুর মধ্যমাংশ অগ্রভাগে এবং নিউক্লিয়াসটি পশ্চাতে অবস্থান করে। শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসটি স্ফীত হয়

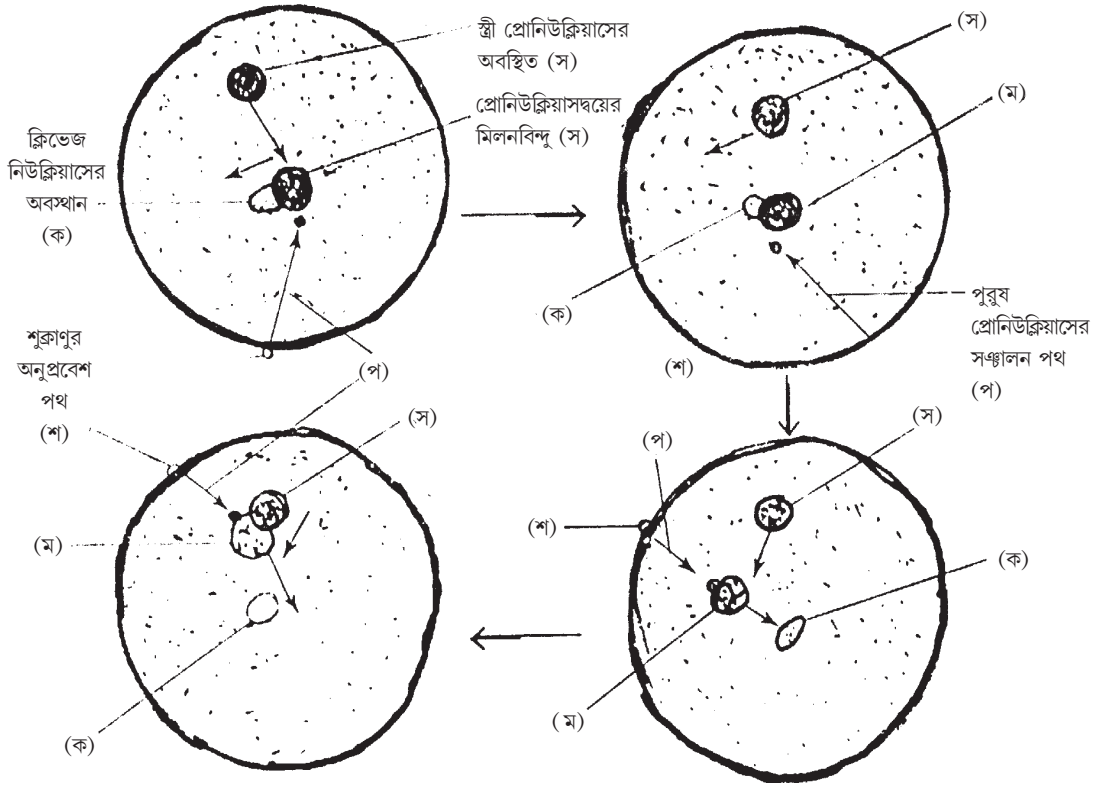

চিত্র নং 2.10 ঃ নিষেকের সময় স্ত্রী ও পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াস দ্বয়ের সঞ্চালন ও মিলন প্রক্রিয়া

এবং এর ক্রোমাটিন সূক্ষ্ম কণিকায় পরিণত হয় ও গোলাকার ধারণ করে। উক্ত নিউক্লিয়াসকে পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াস (Male Pronucleus) বলে। এই সময় পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াসটি ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অনিয়তভাবে সঞ্চালিত হয়। এই পরিযানের পথটিকে পেনিট্রেশন পথ (Penetration Path) বলে। স্ত্রী প্রোনিউক্লিয়াসটি ডিম্বাণুর পরিধির দিকে চলে যায় এবং পরে মিলনবিন্দুতে ফিরে আসে। পরে পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াসটি নিয়ন্ত্রিতভাবে সঞ্চালিত হয়ে স্ত্রী প্রোনিউক্লিয়াসের কাছে চলে আসে এবং উভয়ে মিলিত হয়। এই মিলন প্রক্রিয়াকে অ্যাম্ফিমিকসিস (Amphimixis) বলে। সঞ্চালনের এই পথটিকে কপুলেশন পথ (Copulation Path) বলে।

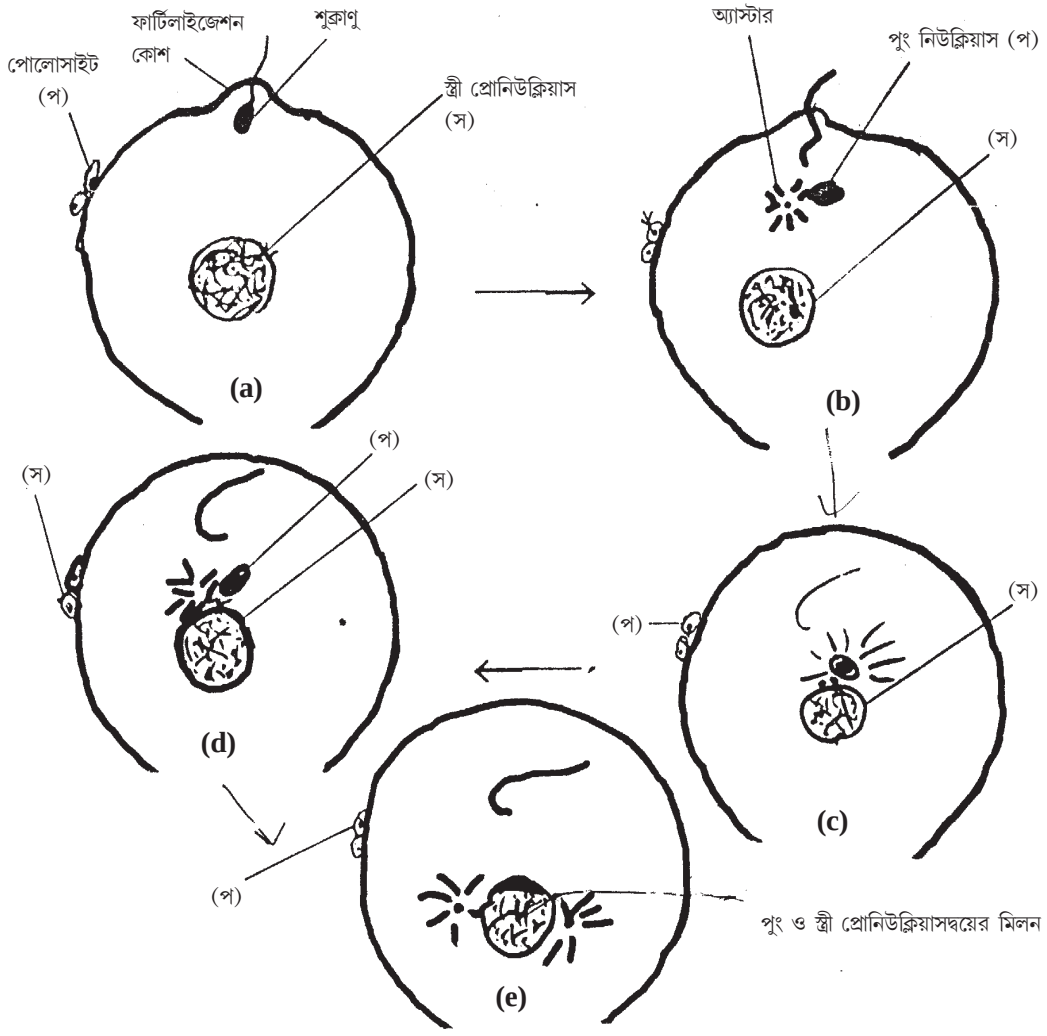

চিত্র নং 2.11 ঃ আর্বোসিয়া নামক প্রাণীর নিষেক। (a) ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে শুক্রাণুর মস্তক ও মধ্যমাংশের অনুপ্রবেশ, এর 180° আবর্তন (b) মধ্যমাংশের বিচ্ছিন্ন হওয়া ও অ্যাস্টারের সৃষ্টি (c) পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াসের স্ত্রী প্রোনিউক্লিয়াসের দিকে অগ্রসর ও নিষেক (d-e).

অ্যাম্ফিমিকসিসের পরে প্রোনিউক্লিয়াস দুটি পাশাপাশি সংলগ্ন হয়। পরবর্তীকালে নিউক্লিয়ার মেমব্রেনটি বিলুপ্ত হয় এবং ক্রোমোসোমগুলি সাইটোপ্লাজমে বিস্তৃত হয়ে যায়। এই সময় শুক্রাণুর সেন্ট্রোসোম দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে বিপরীত মেরুতে সজ্জিত হয় এবং অ্যাস্টার তৈরী করে। মাইটোসিসের মেটাফেজ দশার ন্যায় ক্রোমোসোমগুলি নিরক্ষীয় তলে অবস্থান করে। এইভাবে নিষেক সমাপ্ত হলে সৃষ্ট জাইগোটটি পরবর্তী দশার জন্য প্রস্তুত হয়।

1.2.12 নিষেকের তাৎপর্য

(ক) প্রতিটি প্রজাতির নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। নির্দিষ্ট সংখ্যাটি (2n) ডিপ্লয়েড দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। যেমন- মানুষের ক্রোমোসোম সংখ্যা হল 46 (23 জোড়া)। স্ত্রী ও পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াসে হ্যাপ্লয়েড (n) সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। নিষেককালে প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের মিলনের ফলে ডিপ্লয়েড (2n) অবস্থা প্রতিস্থাপিত হয় এবং আত্মোৎপাদনের দ্বারা প্রাণীদের নিজ নিজ প্রজাতির বংশবৃদ্ধি করে।

(খ) শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উৎপাদনকালে নানা ধরনের জীনগত প্রকরণের (Genetic variation) উদ্ভব হয়। নিষেকের সময় শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিউক্লিয়াসদ্বয়ের মিলনের ফলে জীনগত প্রকরণের হার বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

(গ) জীবনীশক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি প্রজাতির উদ্দীপনার প্রয়োজন। নিষেককালে দুটি জনন-কোষের মিলনের ফলে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় তা প্রজাতিকে পুনরুজ্জীবিত (Rejuvenate) করে।

(ঘ) ক্লিভেজ প্রক্রিয়ার জন্য ডিম্বাণুর সক্রিয়তা এবং মাইটোসিস প্রবর্তনের জন্য জাইগোটে ডি.এন.এ. (D.N.A) সংশ্লেষের হার বৃদ্ধি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

1.2.13 সারাংশ

এককোষী জাইগোট দশায় ব্যক্তিজেনিক পরিস্ফুরণ দূষিত হয়। শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে জাইগোটের সৃষ্টি হয়। জাইগোট থেকে ভ্রূণ এবং ভ্রূণ থেকে ক্রমপরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তি ঘটে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় জাইগোট দশায় জীবের পরিস্ফুরণ আরম্ভ হয়, কিন্তু পরিস্ফুরণের প্রকৃত সূত্রপাত হয় জননকোষ সৃষ্টি দশায়। জননঅঙ্গ থেকে জননকোষের উৎপত্তিকে গ্যামেটোজেনেসিস বলে। গ্যামেটোজেনেসিস প্রক্রিয়াকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা- স্পার্মাটোজেনেসিস (পুংজনন কোষ বা শুক্রাণু সৃষ্টি) এবং উজেনেসিস (স্ত্রীজননকোষ বা ডিম্বাণু সৃষ্টি)। উভয় প্রক্রিয়ায় তিনটি সুস্পষ্ট দশা বর্তমান। তিনটি দশার মধ্যে মৌলিক সাদৃশ্য থাকলেও শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

নিষেককালে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটে এবং জাইগোট সৃষ্টি হয়। জাইগোট থেকে ভ্রূণ এবং ভ্রূণের পরিস্ফুরণের দ্বারা ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুরণ সূচিত হয়। নিষেক একটি জটিল ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়া এবং এটা পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয়। যথা- শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর কাছাকাছি আসা, এদের মধ্যে সংযোগস্থাপন, ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ, ডিম্বাণুর সক্রিয়তা অর্জন, স্ত্রী ও পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের মিলন এবং জাইগোট গঠন।

ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশে ফার্টিলাইজিন ও অ্যান্টিফার্টিলাইজিনের সহক্রিয়া তাৎপর্যপূর্ণ এবং অ্যাক্রোসোম গ্র্যানিউলের সক্রিয়তা উল্লেখ্য। নিষেকের সময় ডিম্বাণুর মধ্যে নানান সাংগঠনিক পরিবর্তন সাধিত হয়। পরিবর্তনের মধ্যে ডিম্বাণুর কর্টিক্যাল বিক্রিয়া এবং ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেন সৃষ্টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া প্রাণী প্রজাতির ডিপ্লয়েড (2n) সংখ্যক ক্রোমোসোম সংখ্যা অপরিবর্তিত রাখা, নানাধরনের জীনগত প্রকরণ এর উদ্ভব ও প্রজাতিকে পুনরুজ্জীবিত করা নিষেকের মুখ্য উদ্দেশ্য।

1.2.14 প্রশ্নাবলী

1. গ্যামেটোজেনেসিস কাকে বলে? কেন গ্যামেটোজেনেসিসকে ব্যক্তিজেনিক পরিস্ফুরণের প্রথম দশা বলা হয়?
2. গ্যামেটোজেনেসিস প্রক্রিয়ার কিভাবে জনন-কোষ উৎপন্ন হয়?
3. স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ার স্পার্মাটিডের উৎপত্তি চিত্র সহযোগে বর্ণনা কর?
4. স্পার্মাটিলিওসিস কাকে বলে? স্পার্মাটিলিওসিস প্রক্রিয়ায় তাৎপর্য কি?
5. শুক্রাণুর অ্যাক্রোসোম ভেসিকল ও অ্যাক্রোসোমাল গ্র্যানিউল স্পার্মাটিডের কোন অঙ্গানু থেকে উৎপন্ন হয়?
6. একটি আদর্শ শুক্রাণুর আণুবীক্ষনীক গঠন চিত্র সহযোগে বর্ণনা করুন।
7. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ
   অস্থিময় মাছের শুক্রাণুর মস্তকাংশ _____ উভচর প্রাণীর শুক্রাণুর মস্তকাংশ _____ ইঁদুরের ও মানুষের শুক্রাণুর মস্তকাংশ যথাক্রমে _____ ও _____ মত।
8. উজেনেসিস প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি দশায় সেকেন্ডারী উগোনিয়ামের পরিবর্তন বর্ণনা করুন।
9. উজেনেসিসের পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশার বৈশিষ্ট্য কি? স্পার্মাটোজেনেসিসের পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশায় সাথে উজেনেসিসের পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশায় পার্থক্য কী?
10. স্পার্মাটোজেনেসিস ও উজেনেসিসের তুলনা করুন।
11. নিষেককে ব্যক্তিজেনিক পরিস্ফুরণের দ্বিতীয় দশা বলা হয় কেন?
12. নিষেক কয় প্রকার? উদাহরণসহ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন?
13. শুক্রাণু বা ডিম্বাণুর সংযোগস্থাপনে ফার্টিলাইজিন ও অ্যান্টিফার্টিলাইজিনের ভূমিকা কি?
14. ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশে অ্যাক্রোসোম গ্রানিউলগুলির গুরুত্ব কি?
15. নিষেককালে কর্টিক্যাল বিক্রিয়া ও ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেন গঠন প্রক্রিয়া চিত্র সহযোগে বর্ণনা করুন।
16. অ্যাম্ফিমিকসিস প্রক্রিয়া চিত্রসহ আলোচনা করুন।
17. নিষেকের তাৎপর্য কি?
18. কেন একাধিক শুক্রাণু ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না?

A. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

1. বহুকোষী জীবের _____ দশায় ব্যক্তিজেনিক পরিস্ফুরণ _____ হয়।
2. গ্যামেটোজেনেসিস প্রক্রিয়ার তিনটি দশার নাম, যথাক্রমে _____ দশা, _____ দশা, ও _____ দশা।
3. প্রাইমারী স্পার্মাটোসাইট কোষের নিউক্লিয়াসে _____ সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে, কিন্তু সেকেন্ডারী স্পার্মাটোসাইট কোষের নিউক্লিয়াসে _____ সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে।
4. শুক্রাণুর মধ্যমাংশে _____ ফিলামেন্টের চারপাশে _____ সন্নিবেশিত হয়ে _____ স্পাইরাল গঠন করে।
5. প্রাইমারী উসাইট থেকে একটি _____ সেকেন্ডারী _____ এবং একটি _____ প্রথম _____ সৃষ্টি হয়।

6. ডিম্বাণুর প্লাজমা মেমব্রেন সংলগ্ন সংকীর্ণ _____ স্তরটিকে কর্টেক্স বলে এবং এর ভিতরে _____ গ্রানিউল থাকে।
7. পরিণত ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে _____ কুসুম থেকে _____ ভ্রূণ _____ গ্রহণ করে।
8. একটি প্রাইমারী উসাইট থেকে _____ ঊটিড ও _____ পোলোসাইট সংলগ্ন হয় এবং এদের _____ সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে।
9. নিষেককালে প্রচুর সংখ্যায় শুক্রাণু _____ ডিম্বাণুর নিকটবর্তী হয় এবং ডিম্বাণু গাত্রে _____ হয়, ওই প্রক্রিয়াকে _____ বলে।
10. ফার্টিলাইজিন কয়েক প্রকার _____ _____ ও _____ সংযুক্ত থাকে এবং এর আণবিক ওজন _____ অপেক্ষা বেশী।
11. অ্যাক্রোসোম ফিলামেন্ট _____ অনুপ্রবেশের পথ সৃষ্টি করে।
12. হায়ালাইন স্তর ও ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেনের _____ স্থানটিকে _____ স্পেস বলে।
13. স্ত্রী ও পুরুষ গ্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের _____ অ্যাম্ফিমিকসিস বলে।
14. মানুষের শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসে _____ এবং জাইগোটে _____ ক্রোমোসোম থাকে।
15. সী-আর্চিনের ডিম্বাণুর বাইরের ঝিল্লীটিকে _____ মেমব্রেন এবং ভেতরেরটিকে _____ মেমব্রেন বলে।
16. শুক্রাণু থেকে উৎপন্ন গ্যামোনকে _____ এবং ডিম্বাণু থেকে সৃষ্ট গ্যামোনকে _____ বলে।

B. সঠিক উত্তরটিতে (✓) চিহ্ন এবং ভুলটিতে (×) চিহ্ন দিন।

1. স্পার্মাটিডের নিউক্লিয়াসে ডিপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। ☐
2. স্পার্মাটিডের গলজিবডি থেকে অ্যাক্রোসোম উৎপন্ন হয়। ☐
3. স্পার্মাটিড সক্রিয় পূর্ণগঠিত পুংজনন কোষরূপে কাজ করে। ☐
4. সকল প্রাণীদের শুক্রাণুর আকৃতি ও গঠন এক প্রকার। ☐
5. পোলোসাইট সক্রিয় স্ত্রীজনন কোষরূপে রূপান্তরিত হয় এবং এদের নিউক্লিয়াসে ডিপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। ☐
6. প্রাইমারী উসাইটের নিউক্লিয়াস স্ফীত হয়ে জার্মিনাল ভেসিকলে পরিণত হয়। ☐
7. ঊটিড সরাসরি ডিম্বাণুতে পরিণত হয়। ☐
8. প্লাজমা মেমব্রেন দ্বারা আবদ্ধ ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে ভাইটিলাস বলে। ☐
9. পরিণত ডিম্বাণুগাত্র থেকে অ্যান্টিফার্টিলাইজিন নামক রাসায়নিক বস্তু নিঃসৃত হয়। ☐
10. অ্যান্টিফার্টিলাইজিন এক প্রকার আম্লিক প্রোটিন। ☐
11. পরিণত শুক্রাণু থেকে ফার্টিলাইজিন ক্ষরিত হয়। ☐
12. স্পার্মলাইসিন এক প্রকার লাইটিক এজেন্ট। ☐
13. অ্যাক্রোসোম গ্র্যানিউলগুলি থেকে স্পার্মলাইসিন নিঃসৃত হয়। ☐
14. ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেন ডিম্বাণুর মধ্যে শুক্রাণু অনুপ্রবেশে সাহায্য করে। ☐
15. ভাইটেলাইন মেমব্রেন ও ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেন একই বস্তুর দুটি নাম। ☐
16. স্ত্রী ও পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের মিলন ক্রিয়াকে অ্যাম্ফিমিকসিস বলে। ☐

1.2.15 উত্তরমালা

1. 1.2.0
2. 1.2.4
3. 1.2.6
4. 1.2.6.2
5. 1.2.2
6. 1.2.2
7. গোলাকার, বল্লম-সদৃশ, বঁড়শি ও চামচের।
8. 1.2.7
9. 1.2.7
10. 1.2.8
11. 1.2.9
12. 1.2.10
13. 1.2.11.2
14. 1.2.11.3
15. 1.2.11.4
16. 1.2.11.5
17. 1.2.12
18. 1.2.11.4

A.
1. জাইগোট, আরম্ভ
2. সংখ্যাবৃদ্ধি, বৃদ্ধি, পূর্ণতাপ্রাপ্তি
3. ডিপ্লয়েড, হ্যাপ্লয়েড
4. অ্যাকসিয়াল, মাইটোকনড্রিয়া, মাইটোকনড্রিয়াল
5. বড়, উসাইট, ছোট, পোলোসাইট
6. সাইটোপ্লাজমের, কর্টিক্যাল
7. সঞ্চিত, পরিস্ফুরণরত, পুষ্টি
8. একটি, তিনটি, হ্যাপ্লয়েড
9. পরিণত, যুক্ত, অ্যাগ্লুটিনেশন
10. অ্যামাইনো অ্যাসিড, পলিস্যাকারাইড, 82,000।
11. শুক্রাণুর
12. মধ্যবর্তী, পেরিভাইটালাইন
13. মিলনকে
14. 23 টি, 46 টি।
15. ভাইটেলাইন, প্লাজমা
16. অ্যান্ডোগ্যামোনস্ গাইনোগ্যামোনস্

B. 1. ✗ 2. ✓ 3. ✗ 4. ✗ 5. ✗ 6. ✓ 7. ✓ 8. ✓ 9. ✗ 10. ✓
11. ✗ 12. ✓ 13. ✓ 14. ✗ 15. ✗ 16. ✓

একক 1.3 ❑ ক্লিভেজ ও গ্যাস্টুলেশন— অ্যাম্ফিঅক্সাস ও ব্যাঙ

গঠন

1.3.0 প্রস্তাবনা

1.3.1 উদ্দেশ্য

1.3.2 ক্লিভেজের সংজ্ঞা

1.3.3 বৈশিষ্ট্য

1.3.4 কোষবিভাজনের হার

1.3.5 ক্লিভেজ চলাকালীন রাসায়নিক পরিবর্তন

1.3.6 ক্লিভেজে কুসুমের প্রভাব

1.3.7 ক্লিভেজের তল

1.3.8 ক্লিভেজের সূত্র

1.3.9 অ্যাম্ফিঅক্সাসের ক্লিভেজ

1.3.10 ব্যাঙের ক্লিভেজ

1.3.11 অ্যাম্ফিঅক্সাস ও ব্যাঙের ক্লিভেজের তুলনামূলক তথ্য

1.3.12 গ্যাস্টুলেশনের প্রস্তাবনা, উদ্দেশ্য, সংজ্ঞা

1.3.13 বৈশিষ্ট্য

1.3.14 পদ্ধতি

1.3.15 গ্যাসটুলেশনের সময় কোষের বিচলন

1.3.16 গ্যাসটুলেশনের সংগঠকের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য

1.3.17 গ্যাসটুলেশনের কোষ গমন

1.3.18 গ্যাসটুলেশনের সময় কোষ সঞ্চরণ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ও ভাগ্য-মানচিত্র রূপায়ণ

1.3.19 ব্যাঙের গ্যাসটুলেশন

1.3.20 সারাংশ

1.3.21 প্রশ্নাবলী

1.3.22 উত্তরমালা

1.3.0 প্রস্তাবনা

বহুকোষী প্রাণীদের ডিম নিষিক্ত হলে এককোষী জাইগোট তৈরী হয়। কিন্তু এটি পরবর্তী দশায় খুব তাড়াতাড়ি বহুকোষ গঠন করে। এই কোষগঠন ভ্রূণ তৈরীর প্রাথমিক অবস্থায় খুবই জরুরী এবং বহু বিভাজনের ফলে সৃষ্ট গোলাকার কোষনির্মিত গঠনটিকে ব্লাস্টুলা (Blastula) বলে।

1.3.1 উদ্দেশ্য

- এককোষী জাইগোটের বহুকোষী ব্লাস্টুলায় রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা জানা যায়।
- কি প্রক্রিয়ায় এককোষী জাইগোট বহুকোষী ব্লাস্টুলায় পরিণত হয় জানা যায়।
- জাইগোটের আয়তন বৃদ্ধি না করে এবং কোষের সাইটোপ্লাজমের কোনও স্থানচ্যুতি না ঘটিয়ে কিভাবে ব্লাস্টুলা তৈরী হতে পারে তা বোঝা যায়।

1.3.2 ক্লিভেজের সংজ্ঞা

নিষেকের ফলে উৎপন্ন জাইগোট বিভাজিত হতে শুরু করে। এই ক্রমাগত কোষবিভাজন প্রক্রিয়াকে ক্লিভেজ (Cleavage) বলে এবং এটি ব্লাস্টুলা তৈরীর জন্য অপরিহার্য। উৎপন্ন কোষগুলিকে বলে ব্লাস্টোমিয়ার (Blastomere)। ব্লাস্টুলার মধ্যস্থ গহ্বরকে ব্লাস্টোসিল (Blastocoel) ও একস্তরে সজ্জিত কোষস্তরটিকে ব্লাস্টোডার্ম (Blastoderm) বলা হয়।

1.3.3 বৈশিষ্ট্য

(a) এককোষী জাইগোট মাইটোসিস (mitosis) প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে ব্লাস্টুলা তৈরী করে।
(b) ব্লাস্টুলার আয়তন জাইগোটের আয়তন প্রায় সমান।
(c) সাইটোপ্লাজম নানাভাবে রূপান্তরিত হয়।
(d) ক্লিভেজের প্রথম দশায় নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের অনুপাত কম থাকে। কিন্তু পরে তা শরীরের অন্যান্য দেহকোষের সমান হয়।
(e) ক্লিভেজের জন্য আকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু এর কোষে একটি গহবর বা ব্লাস্টোসিল (Blastocoel) ধরণ করে।

1.3.4 কোষবিভাজনের হার (Rate of Cleavage)

প্রাথমিক দশায় কোষবিভাজনের হার খুবই দ্রুত হলেও ক্রমশঃ এই হার কমতে থাকে।

ক্লিভেজে কোষ-বিভাজনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Cell division in Cleavage) :

যদিও ক্লিভেজে কোষ বিভাজন মাইটোসিস প্রক্রিয়াতেই হয়, তবুও এর সঙ্গে দেহকোষের বিভাজনের কিছু পার্থক্য আছে। যেমন— দেহকোষ বিভাজিত হবার পর অপত্য কোষগুলি (daughter cells) আয়তনে বাড়ে এবং সেগুলি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হলে তবেই আবার কোষ বিভাজন সম্ভব হয়। এজন্য কোষগুলির একটা গড় আয়তন (average size) বজায় থাকে। কিন্তু ক্লিভেজের সময় খুব দ্রুত এবং বারবার কোষবিভাজনের জন্য কোষগুলির

আয়তন ক্রমেই ছোট হতে থাকে। ব্রাসে (Brachet, 1950) দেখিয়েছেন যে, সী আর্চিনের (Sea-Urchin) ক্ষেত্রে নিষেকের আগে নিউক্লিয়াস-সাইটোপ্লাজমের আয়তনের আনুপাতিক হার থাকে ঃ

$$\frac{\text{নিউক্লিয়াসের হার}}{\text{সাইটোপ্লাজমের হার}} = \frac{1}{550}$$

কিন্তু ক্লিভেজের পর এই আনুপাতিক হার দাঁড়ায় 1/6 সমান।

1.3.5 ক্লিভেজ চলাকালীন রাসায়নিক পরিবর্তন (Chemical changes during cleavage)

কোষ বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে ক্লিভেজের সময় কোষগুলির মধ্যে কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ক্রমাগত সাইটোপ্লাজম থেকে নিউক্লীয় বস্তু তৈরীই শুধু নয়, প্রত্যেকবার বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াসের পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়া এবং এইসঙ্গে ক্রোমোজোমের সংখ্যা ও DNA পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়াও ক্লিভেজের বৈশিষ্ট্য।

(a) দেখা গেছে, সী আর্চিন ডিম্বাণুতে রাইবোনিউক্লিওটাইড রিডাকটেজ (ribonucleotide reductase) নামক একটি উৎসেচক প্রচুর পরিমাণে থাকে যার সাহায্যে রাইবোনিউক্লিয়টাইড থেকে ডি-অকসি-রাইবোনিউক্লিওটাইড তৈরী হতে পারে।

(b) এই সময় প্রোটীন সংশ্লেষমাত্রা অনেক বৃধ্বি পায়। অপত্য কোষগুলিতে হিস্টোন (Histone) ও DNA পলিমারেজ (DNA polymerase) অনুলিপি (Chromosome replication) সৃষ্টিতে দরকারী। এছাড়াও বেমতন্তু (Spindle fibre) তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় টিবিউলিন (Tibulin) প্রোটিনের পরিমাণও বাড়ে।

(c) ক্লিভেজের সময় RNA সংশ্লেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কোষগুলিতে এইসময় rRNA না থাকলেও mRNA ও t-RNA সংশ্লেষ হতে দেখা যায়।

1.3.6 ক্লিভেজে কুসুমের প্রভাব (Role of Yolk of Cleavage)

ডিমে কুসুমের পরিমাণ ক্লিভেজ প্রক্রিয়া ও ক্লিভেজের প্রকৃতি ও হারের (rate) ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। কোষবিভাজনের সময় সাইটোপ্লাজম, নিউক্লীয় বস্তু বিভাজনের সঙ্গে কুসুমদানাও ব্লাস্টোমিয়ারে সমপরিমাণে ভাগ হয়। কোষে কুসুমের পরিমাণ বেশী হলে ক্লিভেজ প্রক্রিয়াও ধীরে হয় বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে যায়।

কুসুম পদার্থের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে কয়েক ধরনের ক্লিভেজ দেখা যায়।

যে ডিম কুসুমহীন বা যার ডিমে অত্যন্ত অল্প কুসুম থাকে সেখানে সমান হলোব্লাস্টিক (equal holoblastic) ক্লিভেজ দেখা যায়।

যদি ডিমে কুসুম অনেকটা অংশে থাকে তবে ক্লিভেজ খাত সমস্ত ডিমকে সমানভাবে ভাগ করতে পারে না। ফলে পরে অসমকোষের সৃষ্টি হয়। এই ক্লিভেজকে বলে অসমান হলোব্লাস্টিক (unequal holoblastic)।

1. সম্পূর্ণ বিভাজন (Holoblastic cleavage or Total Cleavage) : এখানে একটি ব্লাস্টোমিয়ার সম্পূর্ণভাগে দু'ভাগ হয়। এটি দু প্রকার—

(ক) **সম-সম্পূর্ণ (equal) বিভাজন ঃ** এটি মাইক্রোলেসিথাল (microlecithal) ডিমে দেখা যায় এবং এখানে সমান আয়তনের কোষ তৈরী হয়।

(খ) **অসম-সম্পূর্ণ (unequal) বিভাজন ঃ** এটি মেসোলেসিথাল (mesolecithal) ডিমের ক্ষেত্রে দেখা যায়। সব ব্লাস্টোমিয়ারগুলি আয়তনে সমান হয় না— ছোট আকারের গুলিকে মাইক্রোমিয়ার (micromere) ও বড় আকারের গুলিকে ম্যাক্রোমিয়ার (macromere) বলে।

2. অসম্পূর্ণ বিভাজন (Meroblastic cleavage) : এক্ষেত্রে বিভাজন শুধুমাত্র ব্লাস্টোমিয়ারের এনিমাল পোলের সাইটোপ্লাজমের একটি ছোট অংশে ঘটে। এই বিভাজিত অংশকে ব্লাস্টোডিস্ক (blastodisc) বলে। কোষের বাকী অংশ কুসুমপূর্ণ থাকায় সেখানে বিভাজিত হতে পারে না। টিলোলেসিথাল (Telolecithal) ডিম আছে এমন প্রাণী যেমন হাঙর, সরীসৃপ, পাখী আর হংসচঞ্চুতে অসম্পূর্ণ বিভাজন দেখা যায়।

1.3.7 ক্লিভেজের তল (Planes of Cleavage)

কোষ-বিভাজনের জন্য ক্লিভেজের তল নির্ধারণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ডিম্বাণুর কর্টেক্সে (Cortex) তলের ধরণ স্থির করার উপাদান মজুত থাকে। এই উপাদান কোষবিভাজনের সময় মাইক্রোটিবিউল (microtubule) ও অ্যাস্টারের রশ্মির (aster fibres) বিক্রিয়ায় সাহায্য করে এবং কোষে বেমতন্তুর অবস্থান নির্ণয় করে। র‍্যাপাপোর্ট (Rappaport, 1978) দেখিয়েছেন যে অ্যাস্টাররশ্মি ক্লিভেজ খাত গঠনে বেমতন্তুর থেকে অনেক বেশী কার্যকরী। কারণ বেমতন্তু ও ডিম্বাণুর কর্টেক্সের মধ্যের সাইটোপ্লাজমে দ্রুত সঞ্চালন সৃষ্টিতে ক্লিভেজ খাত গঠনে কোনও অসুবিধা হয় না কিন্তু অ্যাস্টার রশ্মি তৈরীর আগে যদি এই সঞ্চালন সৃষ্টি হয়, তবে দেরীতে মাইটোটিক অ্যাপারেটাস (mitotic apparatus) তৈরী হয় আর ক্লিভেজতলও গঠিত হয় না।

ব্লাস্টোমিয়ার তৈরীর সময় বিভিন্ন তলের ক্লিভেজ খাত (Cleavage furrows) জাইগোটকে খন্ড-বিখন্ড করে। এই ক্লিভেজের খাতগুলি ঃ—

(a) **মধ্যতল (Meridional cleavage) :** এই বিভাজনের ফলে অ্যানিমাল ভেজিটাল অক্ষ বরাবর অর্থাৎ ডিমের মধ্যতল (meridian) দিয়ে সমানভাবে দু-খন্ডে বিভক্ত হয়।

(b) **লম্বতল (Vertical cleavage) :** এই বিভাজন ডিমের অ্যানিমাল ভেজিটাল অক্ষ বরাবর ঘটলেও কখনই ডিমের মধ্যতল দিয়ে প্রসারিত হয় না। মধ্যতলের ডান অথবা বাঁ ভাঁজ দিয়ে ঘটে থাকে।

(c) **নিরক্ষীয় তল (Equatorial cleavage) :** এই প্রক্রিয়ার ব্লাস্টোমিয়ার অ্যানিম্যাল ও ভেজিটাল পোলের মাঝের নিরক্ষরেখা ধরে দ্বি-খন্ডিত হয়।

(d) **অক্ষাংশীয় (Latitudinal cleavage) :** কোষের বিভাজন নিরক্ষরেখার ওপর বা নীচ বরাবর ঘটে থাকে।

1.3.8 ক্লিভেজের সূত্র

ক্লিভেজ ঘটনাটি কতকগুলি সূত্র দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়।

(a) **স্যাকস-এর সূত্র (Sach's rules) :** (i) কোষগুলি বিভক্ত হয়ে সমান অপত্য কোষ তৈরী করে। (ii) প্রত্যেকবার কোষ বিভাজনের তল তার আগের কোষ বিভাজনের তলটির সমকোণ বরাবর হয়ে থাকে।

(b) **হার্টউইগ এর সূত্র (Hertwig's law) :** ক্লিভেজের সময় কোষের সাইটোপ্লাজমের ওপর নিউক্লিয়াস প্রভাব বিস্তার করে।

(c) **বালফোর এর সূত্র (Balfour's law) :** ডিমের কুসুম থাকা বা না থাকার ওপর ক্লিভেজের হার ও ধরণ নির্ভর করে।

1.3.9 অ্যাম্ফিঅক্সাসের ক্লিভেজ

এই প্রাণীর ডিমে কুসুমের পরিমাণ খুবই কম থাকে। তাই এর পূর্ণ বা হলোব্লাস্টিক ক্লিভেজ হয় এবং নিষেকের 1 ঘন্টার মধ্যেই এই বিভাজন শুরু হয়।

প্রথম ক্লিভেজ ঃ অ্যানিমাল ভেজিটাল অক্ষ বরাবর ডিমের মধ্যতল দিয়ে ঘটে। ফলে জাইগোটটি দুটি সমান কোষে বিভক্ত হয়।

দ্বিতীয় ক্লিভেজ ঃ প্রথম ক্লিভেজের এক ঘন্টা পর কোষ দুটি আবার প্রথম ক্লিভেজের সঙ্গে সমকোণ করে মধ্যতলেই ঘটে। ফলে চারটি সমান ব্লাস্টোমিয়ার সৃষ্টি হয়।

তৃতীয় ক্লিভেজ ঃ এটি কোষগুলির অর্ধাংশ বরাবর বিষুবরেখার কিছু ওপর দিয়ে হয়ে থাকে (Latitudinal)। ফলে অ্যানিমাল মেরুতে চারটি অপেক্ষাকৃত ছোট মাইক্রোমিয়ার (micromere) ও ভেজিটাল মেরুতে চারটি বড় ম্যাক্রোমিয়ার (macromere) কোষ তৈরী হয়।

চতুর্থ ক্লিভেজ ঃ বিভাজনটির সময় সব কোষগুলি লম্বালম্বি মধ্যতল বরাবর বিভক্ত হয়ে আটটি মাইক্রোমিয়ার, আটটি ম্যাক্রোমিয়ার সৃষ্টি করে।

পঞ্চম ক্লিভেজ ঃ এটি অক্ষাংশ বরাবর বিষুবরেখার দুই পাশেই হয়ে থাকে। ফলে দুইস্তর মাইক্রোমিয়ার (13 টি কোষযুক্ত) আর দুইস্তর (16 টি কোষ) ম্যাক্রোমিয়ার তৈরী হয়। এই ক্লিভেজের কোষে মোট 32 টি কোষ সৃষ্টি হয়।

পঞ্চম বিভাজনের পর ক্লিভেজের কোষ বিভাজন ক্রমশঃ অনিয়মিত হতে থাকে।

ষষ্ঠ বিভাজনটি মধ্যতল বরাবর হয়। উৎপন্ন কোষগুলি মেরু বরাবর আটটি স্তরে সাজানো থাকে। এইসময় ব্লাস্টোমিয়ারগুলির মধ্যে একটি ছোট গর্ত তৈরী হয়। এটি ব্লাস্টোসিল (Blastocoel)। এই গর্ত বড় হওয়ার সঙ্গে এটি জলীয় বস্তুতে পূর্ণ হয়। গর্তযুক্ত ব্লাস্টোমিয়ারের বলকে ব্লাস্টুলা (Blastula) বলে।

1.3.10 ব্যাঙ-এর ক্লিভেজ (Cleavage in Toad)

ব্যাঙের ডিম মেসোলেসিথাল আর এর ভেজিটাল মেরুতে কুসুম থাকে। এই প্রাণীর অ্যানিমাল আর ভেজিটাল মেরুর সন্ধিক্ষণে একটি ধূসর রঙের কাস্তে আকারের অংশ দেখা যায়— এটিকে গ্রে ক্রিসেন্ট (Grey cresent) বলে। ব্যাঙে পূর্ণ বা হলোব্লাস্টিক ক্লিভেজ দেখা যায়। নিষেকের আড়াই ঘন্টার মধ্যেই ক্লিভেজ আরম্ভ হয়।

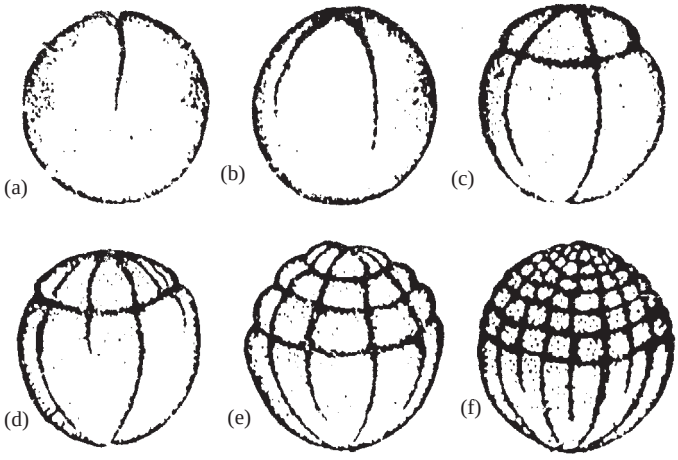

চিত্র নং 3.1 ঃ ব্যাঙের ক্লিভেজ

প্রথম ক্লিভেজ ঃ জাইগোটটি মেরু বরাবর কোষের মধ্যতল দিয়ে দ্বিখন্ডিত হয়।

দ্বিতীয় ক্লিভেজ ঃ প্রথম বিভাজনের 43 মিনিট পর শুরু হয়। এটিও মধ্যতল বরাবর হয়। কিন্তু প্রথম ক্লিভেজের সঙ্গে সমকোণে কোষগুলি বিভক্ত হয়। এর ফলে চারটি সমান কোষ সৃষ্টি হয়।

তৃতীয় ক্লিভেজ ঃ দ্বিতীয় ক্লিভেজ

শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই বিভাজন শুরু হয়। এটি অক্ষাংশ তলীয় হয় এবং কোষগুলির বিষুবরেখার কিছু ওপর দিয়ে বিভাজন হয়ে থাকে। এর ফলে অ্যানিমাল মেরুতে চারটি মাইক্রো মিয়ার ও ভেজিটাল মেরুতে চারটি ম্যাক্রোমিয়ার উৎপন্ন হয়।

চতুর্থ ক্লিভেজ ঃ এই বিভাজনের খাতটি মধ্যতলীয়। কিন্তু অ্যানিমাল মেরুর কোষ বিভাজনের হার ভেজিটাল মেরুর কোষগুলির তুলনায় অনেক দ্রুত। অর্থাৎ ওই সময় থেকেই কোষ বিভাজন হারের ওপর কুসুমের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ওই বিভাজনের শেষে অ্যানিম্যাল ও ভেজিটাল মেরুর প্রত্যেকটিতে আটটি কোষ তৈরী হয়।

পঞ্চম ক্লিভেজ ঃ এটি অক্ষাংশ বরাবর হয়ে থাকে। ওই বিভাজনের শেষে চারস্তরের মোট 32 টি কোষ সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেকটি স্তরে 8 টি কোষ থাকে।

এর পরের বিভাজনগুলি ক্রমশঃ অনিয়মিত হতে থাকে। ব্যাঙের ক্ষেত্রেও কোষগুলির মাঝে গর্ত সৃষ্টি হয় এবং বলের আকারে উৎপন্ন কোষগুচ্ছকে ব্লাস্টুলা বলে। (চিত্র নং 3.1)

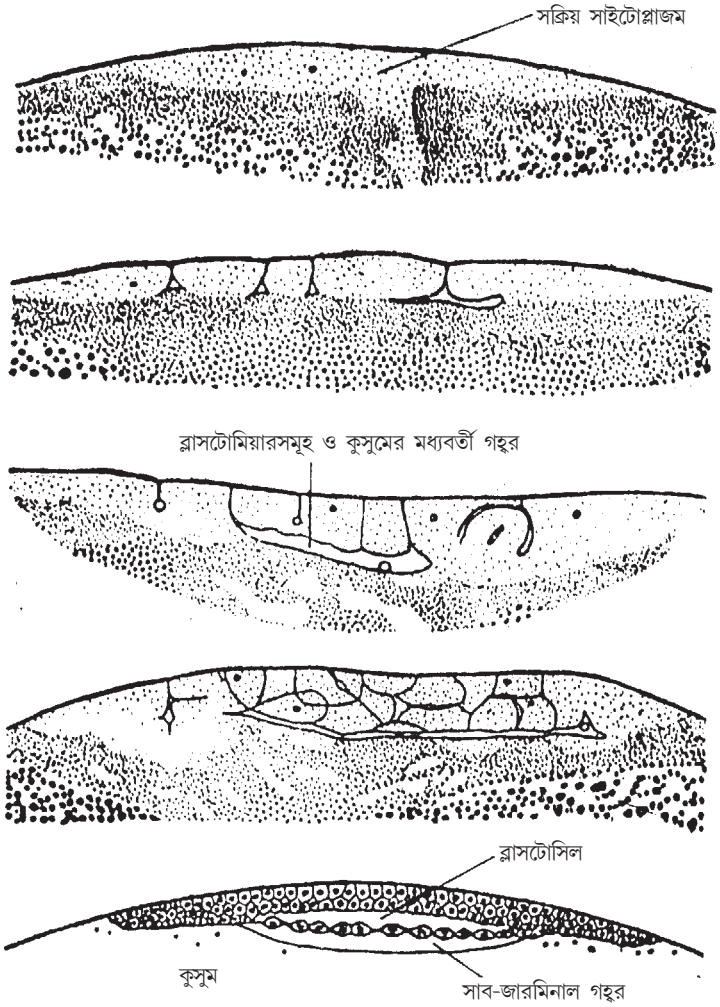

চিত্র নং 3.2 ঃ ছেদের সাহায্যে ক্লিভেজের বিভিন্ন পর্যায়; সর্বনিম্নের চিত্রে ব্লাসটোসিল ও সাবজারমিনাল গহ্বর দেখানো হয়েছে

1.3.11 অ্যাম্ফিঅক্সাস ও ব্যাঙের ক্লিভেজের তুলনামূলক তথ্য

	অ্যাম্ফিঅক্সাস	ব্যাঙ
ডিম	মাইক্রোলেসিথাল	মেসোলেসিথাল
ক্লিভেজ	হলোব্লাস্টিক সমসম্পূর্ণ	হলোব্লাস্টিক অসমসম্পূর্ণ
প্রথম বিভাজন	মধ্যতল বরাবর	মধ্যতল বরাবর
দ্বিতীয় বিভাজন	মধ্যতল বরাবর	মধ্যতল বরাবর
তৃতীয় বিভাজন	বিষুবরেখার ওপর	বিষুবরেখার ওপর
চতুর্থ বিভাজন	মধ্যতল বরাবর	মধ্যতল বরাবর
পঞ্চম বিভাজন	অক্ষাংশ	অক্ষাংশ
ষষ্ঠ বিভাজন	অনিয়মিত	অনিয়মিত
ব্লাস্টুলা	গোলাকার-একস্তরযুক্ত কোষ দিয়ে গঠিত।	গোলাকার-মাইক্রোমিয়ার ও ম্যাক্রোমিয়ার কোষস্তর যুক্ত।
ব্লাস্টোসিল	ব্লাস্টুলার কেন্দ্রে বড় গোলাকার গহবর।	গহবর-গোলাকার, ছোট অ্যানিমাল সোলের দিকে ন্যস্ত।

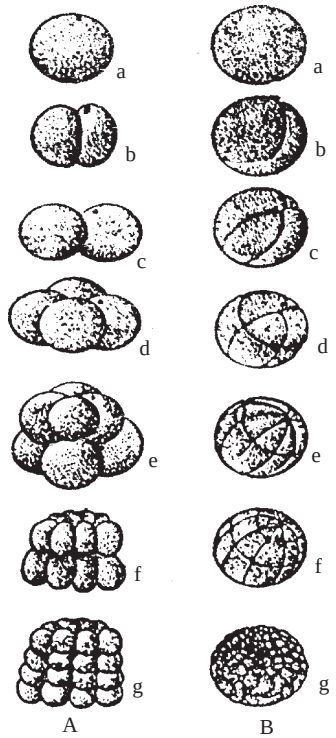

চিত্র নং 3.3 ঃ বিভিন্ন প্রকার মেরুদন্ডী প্রাণীর নিষিক্ত ডিম্বাণুর ক্লিভেজ প্রক্রিয়া।

A. আম্ফিঅক্সাস- ডিম্বাণুর আকার (a), প্রথম ক্লিভেজ (b, c), দ্বিতীয় ক্লিভেজ (d), তৃতীয় ক্লিভেজ (e), চতুর্থ ক্লিভেজ (f), পঞ্চম ক্লিভেজ (g)।

B. ব্যাঙ - ডিম্বাণুর আকার (a), প্রথম ক্লিভেজ (b), দ্বিতীয় ক্লিভেজ (c), তৃতীয় ক্লিভেজ (d), চতুর্থ ক্লিভেজ (e), পঞ্চম ক্লিভেজ (f) ও ব্লাস্টুলা (g)।

1.3.12 গ্যাস্ট্রুলেশনের প্রস্তাবনা, উদ্দেশ্য ও সংজ্ঞা

জাইগোট ক্লিভেজের মাধ্যমে ব্লাস্টুলা (Blastula) ও গ্যাস্টুলেশন (gastrulation) প্রক্রিয়ার গ্যাস্টুলার (gastula) পরিণত হয়। গ্যাস্টুলেশন ভ্রূণ তৈরীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এই সময় মাইক্রোলেসিথাল প্রাণীতে গোলাকার ব্লাস্টুলার একপাশ ভিতরের দিকে ঢুকে একটা দ্বিস্তরবিশিষ্ট কাপ (cup) তৈরী করে। এই কাপের গহবরকে গ্যাসট্রোসিল (gastrocoel) বা আরকেনটেরন (Archenteron), আর এর সামনের গোলাকার ছিদ্রপথকে ব্লাস্টোপোর (blastopore) বলে। এর ফলে একস্তরবিশিষ্ট ব্লাস্টুলা দ্বিস্তরযুক্ত হয়। বাইরের কোষস্তরটিকে এক্টোডার্ম (ectoderm) ও ভিতরেরটিকে এন্ডোডার্ম (endoderm) বলে। এই দুইস্তরের সঙ্গে গ্যাস্টুলেশনের সময় ভ্রূণের দেহে মেসোডার্ম স্তরও সৃষ্টি হয়। এই প্রত্যেকটি জনিত স্তরের অবস্থান, অঙ্গ-সৃষ্টি ক্ষমতা ও কাজ আলাদা। সুতরাং গ্যাস্টুলা গহবর তৈরীর সঙ্গে কোষর কর্মক্ষমতা পৃথকীকরণ (segregation of developmental potential) এই সময়েই হয়ে থাকে। এটি সম্ভব হয় গ্যাসটুলেশনের সময় কোষগুলি নিয়ন্ত্রিত বিচলনে সক্ষম হয় বলেই। পরিস্ফুটনের জন্য কোষসমষ্টির স্থানান্তরে গমন বা সঞ্চরনকে মরফোজেনেটিক মুভমেন্ট (morphogenetic movement) বলে। কোষ সঞ্চরণের সঙ্গে সঙ্গে নিউক্লীয় পৃথকীকরণ (differentiation) ও রাসায়নিক পৃথকীকরণ (chemo differentiation) হয়ে থাকে।

উদ্দেশ্য ঃ

- উন্নত শ্রেণির প্রাণীতে এককোষস্তরযুক্ত ব্লাস্টুলা থেকে বহু কোষস্তরযুক্ত গ্যাস্টুলায় রূপান্তর এর প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যাবে।
- ভ্রূণ তৈরীর জন্য গ্যাসটুলেশন পর্যায়টির প্রয়োজনীয় ভূমিকা ও তাৎপর্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- গ্যাসটুলেশনের সময় কিভাবে ভ্রূণের দেহে তিনটি জনিতৃ কোষস্তর তৈরী করার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ অঙ্গ রচনা হয়ে থাকে, কিভাবে কোষের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার বিভব (potential) তা সৃষ্টি হয় এবং কিভাবে কোষগুলি নিজেদের মধ্যে আবেশ বিক্রিয়ার (inductive interaction) সক্ষম হয় ও প্রধান অঙ্গ-তন্ত্রের ভিত্তি কাঠামো প্রস্তুত করে— ব্যাখ্যা করা যায়।
- কিভাবে এইসময় থেকেই মূলতঃ নিউক্লিয়াস ভ্রূণের কোষগুলির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে তা বোঝাতে পারা সম্ভব হয়।

সংজ্ঞা ঃ

গ্যাসটুলেশান ভ্রূণের পরিস্ফুটনের একটি অত্যাবশ্যক গতিশীল পর্যায়। এই প্রক্রিয়ার ক্লিভেজ পর্যায়ে উৎপন্ন ব্লাস্টোমিয়ারগুলি সঞ্চালনের দ্বারা ভ্রূণের একস্থান থেকে অন্য অংশে গমন করে উপযুক্ত স্থান দখল করে। এই সময় আরম্লেটেরন তৈরীর সঙ্গে ভ্রূণের দেহে জনিতৃ কোষস্তর সৃষ্টি হয় ও ভবিষ্যত প্রাণীর অঙ্গ কাঠামো রচনা হয়।

বিভিন্ন জনিত কোষ থেকে উদ্ভূত অঙ্গসমূহ ঃ

1. এক্টোডার্ম ঃ ত্বক ও নার্ভতন্ত্র
2. মেসোডার্ম ঃ কঙ্কাল, পেশী, সংযোগকলা, হৃদ্‌পিন্ড, বৃক্ক, বৃক্কনালী, ডিম্বাশয়, শুক্রাশয়, শুক্রনালী ইত্যাদি।
3. এন্ডোডার্ম ঃ খাদ্যনালী ও কুসুমথলি।

1.3.13 বৈশিষ্ট্য

1. কোষ সঞ্চরণের (morphegenetic movement) ফলে ভ্রূণের কোষবিন্যাস হয়। কোষের বিচরণের ফলে একগুণসম্পন্ন কোষগুলি কাছাকাছি আসে ও তাদের মধ্যে আবেশ বিক্রিয়া হয়।

2. ভ্রূণে তিনটি মূল জনিত কোষস্তর সৃষ্টি।
3. কোষবিভাজন হার সামান্য হয়।
4. ভ্রূণের আয়তন অপরিবর্তিত থাকে।
5. বিপাকজনিত পরিবর্তন ও অক্সিজেন জারণের গতিবৃদ্ধি।
6. নতুন প্রোটীন সংশ্লেষিত হয় ও ভ্রূণে প্রোটিনের পরিমাণ বাড়তে থাকে।
7. কোষগুলির নিউক্লিয়াসের মধ্যে পৃথকীকরণ ও কোষগুলির কাজের উপর জিনের নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়।
8. কোষগুলিতে গ্লাইকোজেনের পরিমাণ খুব তাড়াতাড়ি কমতে থাকে।

1.3.14 গ্যাসট্রুলেশনের পদ্ধতি (Basic mechanism of gastrulation)

কোষবিভাজন (cell division), কোষ সংযোগ (cell contact) ও কোষ সঞ্চরণ (cell movement)— মূলতঃ এই তিন সুসংহত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভ্রূণে গ্যাসট্রুলেশন সম্পন্ন হয়।

1.3.15 গ্যাসট্রুলেশনের সময় কোষের বিচলন (Cell movement during gastrulation)

গ্যাসট্রুলেশন ভ্রূণ গঠনে অতি সুনিয়ন্ত্রিত ও সক্রিয় দশা। এটি প্রধানতঃ কতকগুলি স্বতঃস্ফূর্ত আভ্যন্তরীণ (intrinsic) শক্তির সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই শক্তিগুলি ব্লাস্টুলেশন দশার কোষ ও গ্যাসটুলেশন দশার শুরুতে ভবিষ্যত অঙ্গ গঠন অঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট জৈব রাসায়নিক (Physico-chemical) অবস্থায় নিহিত থাকে। এই অর্ন্তনিহিত শক্তিগুলি আবার কিছু বাহ্যিক (extrinsic) শর্তাবলীর ওপর নির্ভরশীল।

গ্যাসটুলেশনের সময় সাধারণতঃ দুইরকম কোষ পরিযান দেখা যায়— এপিবলি (epiboly) ও এমবলি (emboly)। এই দুই ধরনের কোষের গমনকে একত্রে আকৃতি নির্দেশক (morphogenetic) কোষ বিচলন বলে।

এপিবলি ও এমবলি প্রক্রিয়া কোষের বিচরণের সঙ্গে আরও অনেক ক্রিয়াকলাপ জড়িত। এদের মধ্যে বিশেষ কয়েকটি ঃ

1. কোষসমূহের পরিযান (morphogenetic movement)
2. সংগঠক এবং তাদের প্রভাব (organiser and its influence)
3. কোষসমূহের রাসায়নিক পৃথকীকরণ (Chemmodifferentiation of cells).

গ্যাসটুলেশন দশায় কোষগুলির সুশৃঙ্খল চলনক্ষমতা ভ্রূণের অঙ্গগঠনের জন্য প্রয়োজনীয়। তবে কোন বিশেষ শক্তির বশে রাসায়নিক অথবা যান্ত্রিক কোষগুলি চলনক্ষমতা অর্জন করে তা জানা যায়নি।

ব্লাস্টুলা দশায় কোষেই এই চলনক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়। কোষগুলি একটি নির্দিষ্ট পথে পরিযান করে প্রাথমিক গ্যাসট্রুলার মধ্যে প্রবেশ করে। যে শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে কোষগুলি অভিযান করে সেই নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিকে (guiding force) প্রাইমারী অরগানাইজার (primary organiser) বলে। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ভ্রূণতত্ত্ববিদরা প্রমাণ করেছেন, ব্যাঙের গ্যাসট্রুলেশনে পৃষ্ঠীয় ওষ্ঠের (dorsal dip) মধ্যে ওই সংগঠক (organisation centre) থাকে।

1.3.16 গ্যাসট্রুলেশন প্রক্রিয়ায় সংগঠকের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য (Importance of organiser in gastrulation and its special feature)

গ্যাসটুলেশনের সময় বিভিন্ন ধরনের বিচলন পদ্ধতির মাধ্যমে কোষ বিচলন ঘটে। এই চলনকে সংগঠন করার

জন্য আভ্যন্তরীণ শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বিভিন্ন অঙ্গ তৈরীর জন্য বিভিন্ন কোষের মধ্যের ভৌত রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য এই শক্তির উৎস। এই শক্তিকেই সংগঠক (Organizer) বলা হয়। শুধুমাত্র স্পীমান (Spemann) এবং তাঁর ছাত্র ম্যানগোল্ড (Mangold) প্রভৃতি ভ্রূণতত্ত্ববিদরা প্রমাণ করেছেন ব্লাস্টোপোরের পৃষ্ঠীয় ওষ্ঠ অঞ্চলের ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়া গ্যাসটুলেশনের কোষ অভিযানে নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হিসাবে কাজও করে। আরও দেখা গেছে যে পৃষ্ঠীয় ওষ্ঠ পৃষ্ঠীয় অক্ষীয় অঙ্গ— যেমন নোটোকর্ড, নিউরাল টিউব, সোমাইট ইত্যাদির গঠনেও প্রভাব বিস্তার করে।

বৈশিষ্ট্য ঃ

1. এই কোষগুলির স্বপৃথকীভবন (autodifferentiation) ক্ষমতাসম্পন্ন।
2. এদের স্ব-সংগঠনক্ষমতা (self organisation) আছে।
3. এরা অন্য কোষের গঠনকে প্রণোদিত (induce) করে।

সংগঠকের এইসব গুণাবলীর উৎস সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিভেদ আছে। অনেকের মতে কোষের গ্লাইকোজেন বা স্টেরয়েড এর উৎস। অনেকের মতে DNA, RNA বা প্রোটীন জাতীয় পদার্থের উপস্থিতির জন্যই কিছু কোষ এই বিশেষ ক্ষমতা লাভ করে।

1.3.17 গ্যাসট্রুলেশন কোষ গমন (Types of cell movement during gastrulation)

ধরণ অনুযায়ী এপিবলি ও এমবলি প্রক্রিয়ায় কোষ গমন নানান রকম।

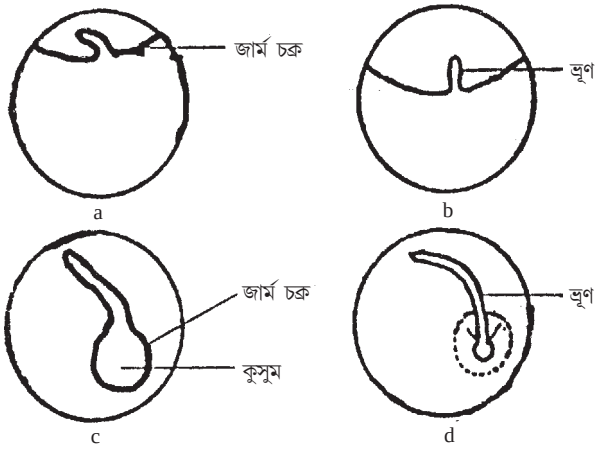

চিত্র নং 3.4 ঃ এপিবলি ঃ পূর্ণাস্থি মাছের ভ্রূণ বৃদ্ধির চারিটি দশা (a-d), এবং কুসুম বস্তুর চারিদিকে জার্মরিং বা ব্লাস্টোপোর ওষ্ঠ সৃষ্টি চিত্ররূপ

1. **এপিবলি (Epiboly) :** এটি বর্হিমুখী কোষ সঞ্চরণ প্রক্রিয়া। এক্টোডার্ম কোষগুলির সংখ্যাবৃধ্বির সঙ্গে তাদের অগ্রপশ্চাৎ অক্ষবিন্যাস ও পার্শ্ববিন্যাসকে এপিবলি বলে। (চিত্র নং 3.4)

2. **এমবলি (Emboly) :** এটি অন্তর্মুখী কোষ বিচরণ প্রক্রিয়া। এর ফলে কোষগুলি খুব তাড়াতাড়ি বিভাজিত হয়ে ভ্রূণের দেহের ভিতর কোষ-সঞ্চরণ করে। এটি আবার কয়েকপ্রকার হতে পারে।

a) ইনভ্যাজিনেশন (Invagination or Caving in) : যদি এমন একটি ব্লাস্টুলা কল্পনা করে নেওয়া যায় যার একদিকে আছে অ্যানিমাল মেরু (animal pole), অন্যদিকে ভেজিটাল মেরু (Vegetal pole) এবং ভিতরে ফাঁকা ব্লাস্টোসিল (blastocoel)। এই ব্লাস্টুলার ভেজিটাল মেরুর দিকটায় যদি চাপ দেওয়া যায় এটি একটি দ্বিস্তরযুক্ত কাপের আকার নেয় এবং ভিতরের গহবরটি আরকেনটেরন (archenteron) সৃষ্টি করে। আরকেনটেরন গহবরটি বাইরের তলের সঙ্গে যে ছিদ্রপথে যুক্ত থাকে তাকে ব্লাস্টোপোর (blastopore) ও এর কিনারাকে ব্লাস্টোপোরের ওষ্ঠ (lip of blastopore) বলে। আরকেনটেরনের গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে

ব্লাস্টোপোরের ওষ্ঠ দুপাশে প্রসারিত হয়ে পৃষ্ঠীয় ওষ্ঠ (dorsal lip) ও অঙ্কীয় ওষ্ঠ (ventral lip) তৈরী করে। অ্যাম্ফিঅক্সাস ও ব্যাঙের ব্লাস্টুলায় এই পদ্ধতি দেখা যায় (চিত্র নং 3.5)।

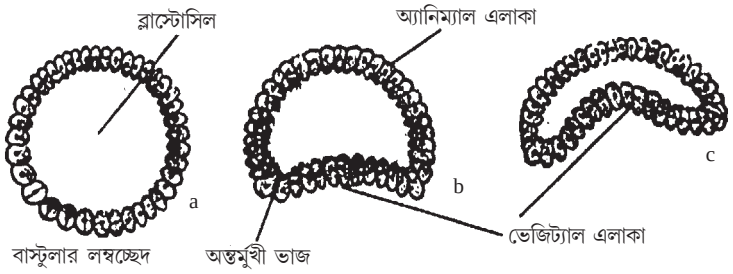

চিত্র নং 3.5 ঃ ইনভ্যাজিনেশনের চিত্ররূপ (a-c)

b) ইনভলুসান (Involution or rolling under) : ঘন কুসুমযুক্ত টেলোলেসিথাল (Telolecithal) ডিমের বৈশিষ্ট্য। ব্লাস্টোডার্মের কোনও বিশেষ বিশেষ কিনারা থেকে কোষগুলির অন্তর্মুখী চলন শুরু হয়। এই কোষগুলি ডিমের কুসুমের ওপর বিস্তৃত না হয়ে সেগমেনটেশন গহবরে (Segmentation Cavity) বিচলন করে এন্ডোডার্ম গঠন করে (চিত্র নং 3.6)।

c) কনভারজেন্স (Convergence) : ব্লাস্টোডার্মের কোষগুলির সমকেন্দ্রাভিমুখী চলনের ফলে এরা গ্যাস্টুলায় এক জায়গায় জড় হয় ও মাঝ বরাবর একটা অক্ষ গঠন করে। তাই উভচর প্রাণী ও মুরগীর বৈশিষ্ট্য (চিত্র নং 3.7)।

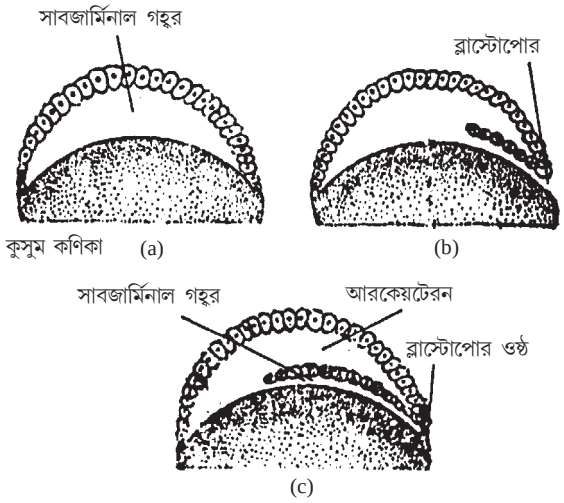

চিত্র নং 3.6 ঃ ইনভ্যাজিনেশনের চিত্ররূপ (a-c)

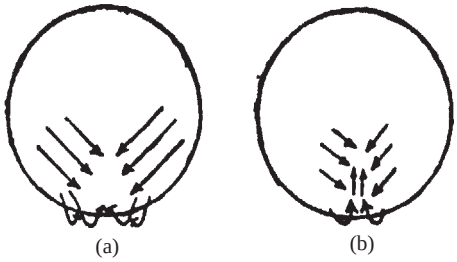

চিত্র নং 3.8 ঃ কনভারজেন্সের চিত্ররূপ a) আরম্ভে ব্লাস্টোডার্মের পৃষ্ঠ (b) প্রক্রিয়ার শেষে।

d) ডাইভারজেন্স (Divergence) : ওই পরিযান প্রক্রিয়া কনভারজেন্স প্রক্রিয়ার বিপরীত। এই প্রক্রিয়ার অন্তর্মুখী কোষগুলি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে তাদের ভারী নির্দিষ্ট অবস্থানে পৌঁছায়। উদাহরণ মুরগীর গ্যাস্টুলায় হাইপোব্লাস্ট কোষের বিচরণ।

e) ডিলামিনেশন (Delamination) : পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর পরিস্ফুরণে এই চলন দেখা যায়। ব্লাস্টোমিয়ারগুলি প্রথমে ছোট ছোট গুচ্ছ বা দলে বিভক্ত হয় ও পরে

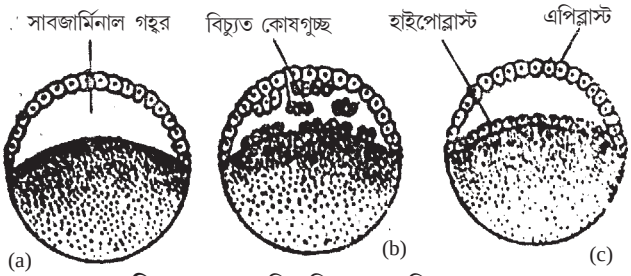

চিত্র নং 3.7 ঃ ডিলামিনেশনের চিত্ররূপ (a-c)

পরস্পরের থেকে পৃথকভাবে নীচে জমা হয়ে একটি স্তর গঠন করে (চিত্র নং 3.8)।

f) এক্সপ্যানশন (Expansion) : এই প্রক্রিয়ার অ্যানিমাল মেরুর কোষগুলির পরিব্যাপ্তি ঘটে ও এরা ক্রমশঃ ব্লাস্টোপোর অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়।

g) কনক্রিসেন্স (Concrescence) : এই চলন অনেকটাই কনক্লুরেন্স বা কনভারজেন্স ধরনের। এটে কেবলমাত্র অক্ষরেখা বরাবর হয়। পাখীর পরিস্ফুটনে দেখা যায় (চিত্র নং 3.9)।

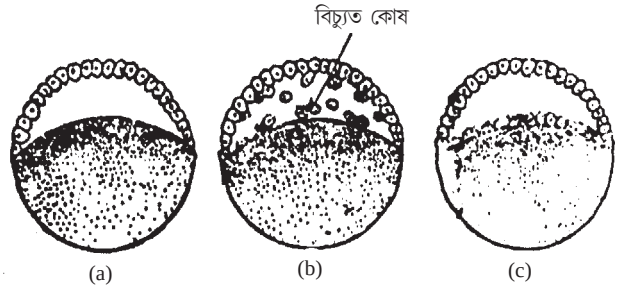

চিত্র নং 3.9 ঃ ইনফিলট্রেশনের চিত্ররূপ; (a-c)।

h) ইনফিলট্রেশন (Infiltration) : পাখী, স্তন্যপায়ী প্রাণীতে ব্লাস্টোডার্ম থেকে কিছু কোষ ছাড়া ছাড়া ভাবে নিচে সাবজার্মিনাল গহবরের তলায় কুসুমের ওপর জমা হয়ে হাইপোব্লাস্ট স্তর তৈরী করে (চিত্র নং 3.10)।

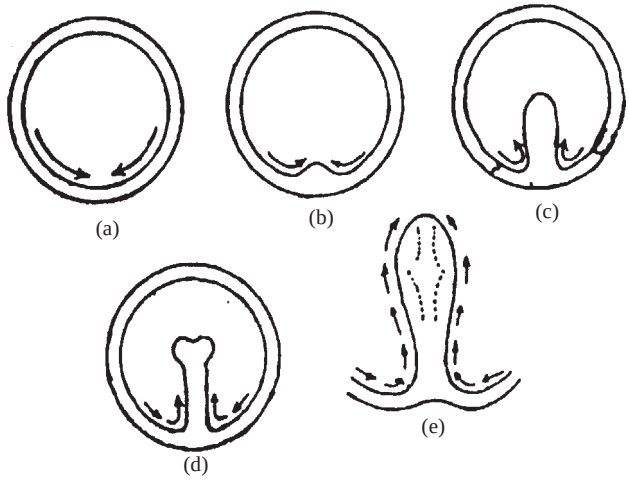

চিত্র নং 3.10 ঃ কনক্রিসেন্স; a) ভ্রূণ সৃষ্টির পূর্বে জাম রিং, b) কনফ্লুয়েন্স বা কনক্রিসেন্স আরম্ভ, c) জার্ম রিং হইতে ভ্রূণ সৃষ্টি হচ্ছে, d) ও e) ভ্রূণ সৃষ্টির পরবর্তী দশা।

1.3.18 গ্যাসট্রুলেশনের সময় কোষ সঞ্চরণ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ও ভাগ্য-মানচিত্র রূপায়ণ (Methods to study the cell movement mechanism during gastrulation and drawing of fati map) :

পরিস্ফুটনের সময় গ্যাসট্রুলেশনে কোন কোষ থেকে কি কলা (tissue) ও অঙ্গ (organ) তৈরী হবে তার

কাঠামো স্থির হয়। এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ভ্রূণতত্ত্ববিদ্‌গণ বিভিন্ন প্রাণীর ভ্রূণের ভাগ্য-মানচিত্র (fate map) তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। গ্যাসট্রুলেশন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে ভাগ্য-মানচিত্র বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভাগ্য-মানচিত্র তৈরীর পদ্ধতি ঃ—

1. **চেতন রঞ্জক প্রক্রিয়া (Vital stain method) :** ভোগ্‌ট উভচর প্রাণীতে প্রথম ওই কৌশল ব্যবহার করেন। যিনি নিউট্রাল রেড (Neutral red), এনিলিন ব্লু (Aniline blue), জেনাস গ্রীন বি (Janus green B) প্রভৃতি ভাইটাল স্টেন (যা কোষের কোনও ক্ষতি না করে কোষকে রঞ্জিত করে) ব্যবহার করেন। এই রঞ্জকগুলি ব্লাস্টুলার বিশেষ বিশেষ কোষকে বিশেষ রং-এ রঞ্জিত করে। গ্যাসট্রুলেশনের সময় তাদের স্থানান্তরে বিচরণ ও বিন্যাস সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায়। ভোগট্ (Vogt) এইভাবে বম্বিনেটর (Bombinator) নামে ব্যাঙের ভাগ্য-মানচিত্র তৈরী করতে সক্ষম হন।

2. কার্বন-কর্ণিকা প্রক্রিয়া (Drawling of fate map by application of carbon particles) : পরবর্তীকালে স্প্র্যাট (Spratt, 1946) ভ্রূণের কোষগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য সূক্ষ্ম কার্বন-কণিকা প্রয়োগ করেন। কার্বন কণিকাগুলি কোষের গায়ে আটকে যায় ও পরবর্তীকালে তাদের অভিযান অনুসরণ ও পর্যবেক্ষণ সহজ হয়। এইভাবে তিনি মুরগীর ভাগ্য মানচিত্র তৈরী করতে সক্ষম হন।

3. তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার (Use of radioactive particles) : বর্তমানকালে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে রোজেনক্যুইস্ট (Rosenquiest, 1966) ও নিকোলেট (Nicholet, 1970) পাখীর ভাগ্য-মানচিত্র তৈরী করেন। ব্লাস্টোডার্মের কোষগুলি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ দিয়ে চিহ্নিত হয় (3H থাইমিডিন ^{3}H Thymidine ব্যবহার করা হয়)। এই পদ্ধতিতে অনেক নিঁখুতভাবে ভাগ্য-মানচিত্র তৈরী সম্ভব হচ্ছে।

1.3.19 ব্যাঙের গ্যাসট্রুলেশন (Gastrulation in Frog)

ব্যাঙের দেহে বহিঃনিষেক দেখা যায়। এদের মেসোলেসিথাল ডিম দেখা যায়। নিউক্লিয়াস থাকে অ্যানিমাল মেরুতে। ব্যাঙের হলোব্লাস্টিক অসমান ক্লিভেজ পরিলক্ষিত হয়। ব্যাঙের ক্লিভেজ পদ্ধতিটি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাঙের গ্যাসট্রুলেশন শুরু হয় ভ্রূণের পৃষ্ঠীয়দেশ থেকে যা গ্রে ক্রেশেন্ট অঞ্চলের বিষুবরেখার ঠিক নীচে থাকে। এখানে স্থানীয় এন্ডোডারমাল কোষগুলির ইনভ্যাজিনেশন হয়ে স্লিট এর মত ব্লাস্টোপোর তৈরী হয়। এই বটল কোষ (bottle cells) প্রাথমিক আরকেনটেরনকে লাইন দিয়ে থাকে।

ব্লাস্টোপোর তৈরীর পরবর্তী দশা হল বিষুবরেখার ভার্জিনাল জোন কোষগুলির ইনভলিউশান এবং তখন অ্যানিমাল কোষগুলির এপিবলি ও ব্লাস্টোপোরে কনভারজেশন হয়। ব্লাস্টোপোরের ঠোঁটের (lip of blastopore) কোষগুলি হল এন্ডোডারমাল কোষ যা আরকেনটেরনের ধার তৈরীর জন্য ইনভ্যাজিনেশন হয়। এই কোষগুলিকে বলে কর্ডামেসোডার্ম কোষ (Chordamesoderm cell)।

এই কোষগুলি নোটোকর্ড (notochord) তৈরী করে, যা হল মেসোডার্মাল ব্যাকবোন এবং এটি স্নায়ুতন্তু তৈরীতে সাহায্য করে।

এর পরের ধাপ হল এন্ডোভারমাল কোষের ইনভ্যাজিনেশন। ব্লাস্টোপোরের পৃষ্ঠীয় লিপ দিয়ে এন্ডোডারমাল কোষগুলি আরকেনটেরনের সামনের দিকে চলতে থাকে এবং ভ্রূণের ফোরগাট (fore gut) তৈরী করে। ইনভ্যাজিনেশন হয় প্রি-কর্ডাল পাতের ইনভলুউশান দ্বারা। প্রি-কর্ডাল পাত ব্লাস্টোপোরের পৃষ্ঠীয় ঠোঁট দ্বারা গড়িয়ে যেতে থাকে এবং নোটোকর্ডের সামনে আরকেনটেরন ছাদের একটি অংশে পরিণত হয়। এরপর নোটোকর্ডাল কোষগুলির ইনভলিউশান হওয়ার ফলে আরকেনটেরনের একটি ফিতা তৈরী হয়। মেসোডার্মটিও ব্লাস্টোনোর এর মধ্য দিয়ে

ইনভলিউশান ঘটায় এবং নোটোকর্ড এর একদিকে যায়। এগুলি একত্রে এপিথিলিয়াল স্তর (epithilial layer) তৈরী করে।

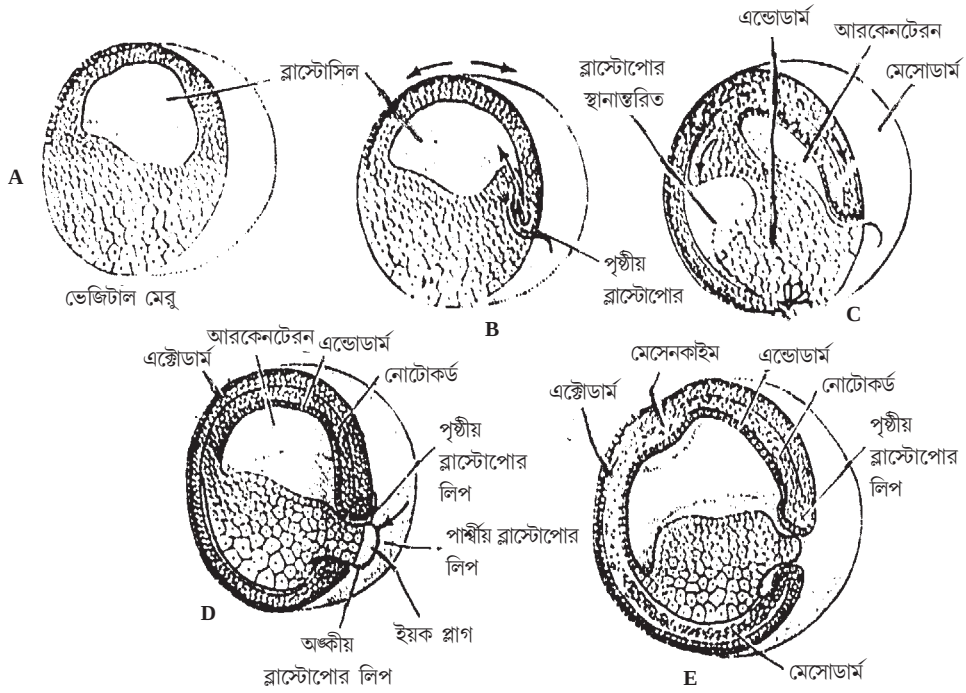

চিত্র নং 3.11 ঃ ব্যাঙের গ্যাসট্রুলেশনের সময় কোষের চলন। ভ্রূণের মাঝবরাবর ছেদ কাটা হয়েছে এবং এমনভাবে রাখা হয়েছে যাতে পর্যবেক্ষকের দিকে ও কিছুটা বাঁদিক ঘেঁষে ভেসিটাল মেরু থাকে।
A) গ্যাসট্রুলেশনের প্রাথমিক পর্যায়। কোষগুলি ভিতরের দিকে চলতে শুরু করে পৃষ্ঠীয় ব্লাস্টোপোর লিগ তৈরী করে এবং মেসোডার্মাকল বিকারসারগুলি ব্লাস্টোসিলের ছাদের নিচে ইনভলিউট করতে শুরু করে।
B), C) মধ্যবর্তী গ্যাসট্রুলেশন। আরকেনটেরন তৈরী হয় এবং তা ব্লাস্টোসিলকে স্থানচ্যুত করে এবং কোষগুলি পার্শ্বীয় ও অঙ্কীয় ব্লাস্টোমোর লিপ থেকে ভ্রূণের মধ্যে পরিযাণ করে। অ্যানিমাল মেরুর কোষগুলি অঙ্কীয় অঞ্চলের দিকে পরিযান করে এবং ভেজিটাল মেরু অঞ্চলে ব্লাস্টোপোর চলতে শুরু করে।
D), E) অন্তিম গ্যাসট্রুলেশন পর্যায়। গ্যাসট্রুলেশনের শেষ পর্যায়ে ব্লাস্টোসিল থাকে না, ভ্রূণ এন্ডোডার্ম দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়, এন্ডোডার্ম ভিতরের দিকে স্থাপিত হয় এবং মেসোকার্ম কোষগুলি এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্মের মধ্যবর্তী অঞ্চলে চলে যায়।

এক্টোডার্মাল কোষগুলি বিভাজিত হয় এবং প্রসারিত হয় এন্ডোডার্মের এপিবলি ঘটিয়ে।

ব্যাঙের তথা উভচরদের গ্যাসট্রুলেশনের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল ইনভলিউটিং মার্জিনাল জোন (Involuting marginal zone, IMZ) তৈরী হওয়া এবং এরা হল সঞ্চরণশীল কোষসমূহ যা আরকেনটরন তৈরীতে সাহায্য করে। এটি পরিভ্রমণ করে ব্লাস্টোসিল এর ভিতরের ধাপ ধরে এবং সুপারফিসিয়াল কোষগুলিকে ভিতরের দিকে ঠেলে দেয়।

সুপারফিসিয়াল স্তর কোষবিভাজন দ্বারা প্রসারিত হয় এবং প্রশস্ত হয় পৃষ্ঠীয় এবং অঙ্কীয় জোন এর দিকে।

এর ফলে সুপারফিসিয়াল এবং গভীর স্তরের কোষগুলির এপিবলি হয়। এরপর মার্জিনাল জোন ইনভলিউশন ঘটিয়ে মেসোডার্মাল কোষের সঙ্গে সংযুক্ত হয় (চিত্র নং 3.11, 3.12)।

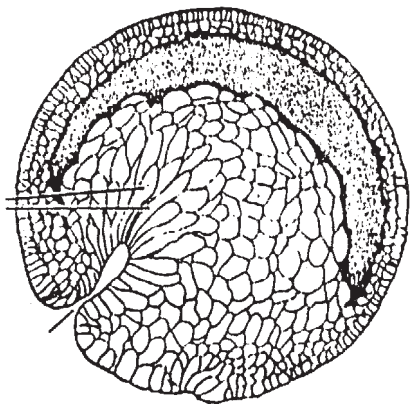

চিত্র নং 3.12 ঃ গ্যাসট্রুলেশনে রত উভচর ভ্রূণ; ব্লাস্টোপোর থেকে বটল সেলের প্রবর্ধিত অংশ।

1.3.20 সারাংশ

নিষেকের পরই ডিম্বাণু দুটি কোষে বিভক্ত হয়। উৎপন্ন কোষ দুটি এরপর ক্রমাগত বিভক্ত হয়ে বহুকোষী গোলকের সৃষ্টি করে। নিষিক্ত ডিম্বাণুর বিভাজন প্রক্রিয়াকে ক্লিভেজ এবং এর ফলে সৃষ্ট গোলককে ব্লাস্টুলা বলে। ব্লাস্টুলার ভিতরে তরলপূর্ণ ব্লাস্টোসিল থাকে।

ক্লিভেজে ভ্রূণের আয়তন বাড়াতে কোষসংখ্যা খুব দ্রুতহারে বাড়তে থাকে। ফলে, উৎপন্ন কোষগুলির আয়তন ক্রমশ কমতে থাকে ও কোষের সাইটোপ্লাজম নিউক্লীয় বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। ডিমের কুসুম ক্লিভেজের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। কুসুম ডিমের যে মেরুতে থাকে তাকে ভেজিটাল মেরু ও কুসুমহীন মেরুকে এনিমাল মেরু বলে। কুসুমের পরিমাণের উপর নির্ভর করে ডিম্বাণু যথাক্রমে ঃ

1. কম কুসুমযুক্ত মাইক্রোলেসিথাল— অ্যাম্ফিঅক্সাস
2. অপেক্ষাকৃত বেশী কুসুমযুক্ত— মেসোলেসিথাল— ব্যাঙ।
3. ঘন কুসুমযুক্ত— টিলোলেসিথাল— পাখী, সরীসৃপ।

ব্লাস্টুলেশনের সময় ক্লিভেজখাত বিভিন্ন তলে হয়। যেমন— মধ্যতল, লম্বতল, নিরক্ষীয় তল ও অক্ষাংশীয় তল।

কুসুমের পরিমাণের ভিত্তিতে ক্লিভেজ কয়েক প্রকার।

1. সম্পূর্ণ বা হলোব্লাস্টিক (সমান বা অসম)। এটি অল্প কুসুমযুক্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায়।

2. ঘন কুসুমযুক্ত ডিমে অসম্পূর্ণ বা মেরোব্লাস্টিক ক্লিভেজ দেখা যায়। এদের ডিমের কুসুমের উপর অবস্থিত নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম সম্বলিত একটি ছোট চাকতির মধ্যে বিভাজন নির্দিষ্ট থাকে। এটিকে ব্লাস্টোডিস্ক বলে।

অন্যান্য মেরুদন্ডী প্রাণীর সঙ্গে খরগোসের ক্লিভেজের কিছু পার্থক্য আছে। এখানে প্রথম থেকে অসম কোষ বিভাজন দেখা যায় ও ক্লিভেজের ফলে বাইরে ট্রফোব্লাস্ট ও ভিতরে ইনার সেল মাস তৈরী হয়।

ক্লিভেজ চলার সময় জাইগোট ক্রমশঃ গুচ্ছাকারে সজ্জিত একটি নিরেট কোষ বলের আকার ধারণ করে। একে মরুলা বলা হয়। ক্রমে এটি তরলপূর্ণ হয় ও গহবরযুক্ত কোষগোলককে ব্লাস্টুলা বলে।

নিষিক্ত জাইগোট থেকে ভ্রূণের পরিস্ফুটনের পর্যায়গুলির মধ্যে গ্যাসটুলেশন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ গতিশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতিতে ব্লাস্টুলা গ্যাসট্রুলায় রূপান্তরিত হয়। মাইক্রোলেসিথাল ডিমে গোলাকার ব্লাস্টুলার একপাশ ক্রমশঃ ভিতরের দিকে ঢুকে দ্বি-স্তর যুক্ত গ্যাস্ট্রুলা তৈরী করে। এর বাইরের আবরণী স্তরটি এক্টোডার্ম, ভিতরেরটি এন্ডোডার্ম ও গহবরটি আরকেনটেরন। গ্যাসট্রুলেশনের সময় কোষের কর্মক্ষমতার পৃথকীকরণ ঘটে, কোষগুলি চলনক্ষমতাযুক্ত হয় ও কোষের কাজের উপর জিনের প্রভাব শুরু হয়। কোষের চলনক্ষমতাকে পরিযান বা Morphogenetic movement বলা হয়। এই চলনের ওপর ভিত্তি করেই ভবিষ্যতের জনন কোষস্তর ও প্রাণীর দেহগঠনের ছক তৈরী হয়।

কোষবিভাজন, কোষসংসর্গ ও কোষচলন এই দশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোষগুলি এপিবলি ও এমবলি প্রক্রিয়ায় চলনক্ষম হয়। এপিবলির মাধ্যমে এক্টোডার্ম কোষস্তরের সংখ্যাবৃদ্ধি ও দেহের বহিরাবরণের বিন্যাস ঘটে। এমবলি প্রক্রিয়ায় ব্লাস্টোডার্মের কোষগুলি দেহের অভ্যন্তরে বিভাজন ও চলনে সক্ষম হয় ও প্রাণীর দেহে এন্ডো ও মেসোডার্ম কোষের বিন্যাস ও অঙ্গগঠন করে। এমবলি প্রক্রিয়া কয়েকপ্রকার ঃ 1. ইনভ্যাজিনেশন, 2. ইনভলুশান, 3. কনভারজেন্স, 4. ডাইভারজেন্স, 5. ডিলামিনেশন, 6. একসপ্যানসন, 7. কনক্রিসেন্স, 8. ইনফিলট্রেশন। কোষবিভাজনে উদ্ভূত কোষগুলির মধ্যে অঙ্গ তৈরীর জন্য ভৌত রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শক্তি নিহিত থাকে। এই শক্তিকে সংগঠক বা Organiser বলা হয়।

গ্যাসট্রুলেশনের সময় কোন কোষ থেকে কোন কলা বা অঙ্গ তৈরী হয় বোঝার জন্য বিজ্ঞানীরা নানা উপায়ে ভ্রূণের ভাগ্য-মানচিত্র রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে মুরগীর ভাগ্য-মানচিত্র সঠিকভাবে জানা যায়।

পেলুসিডা অঞ্চলের কোষগুলি থেকেই ভ্রূণ তৈরী হয়। ইনকিউবেশনের শুরুতেই পেলুসিডা এলাকার পিছনদিকের কোষগুলি শিকলের আকারে চলন করে গৌণ হাইপোব্লাস্ট তৈরী করে। ফলে প্রাথমিক হাইপোব্লাস্ট আকারে ছোট হয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে ব্লাস্টোডার্মের সীমানায় সজ্জিত থাকে। এই চলনকে প্রাক্-গ্যাসট্রুলেশন চলন বলে।

ইনকিউবেশনের 3-4 ঘন্টার মধ্যে এপিব্লাস্টের পিছনদিকের কোষগুলি অভিসরণ করে মধ্য অক্ষরেখা বরাবর প্রিমিটিভ স্টিক গঠনের সূচনা করে ও ইনকিউবেশনের 18-19 ঘন্টার মধ্যে এই গঠনটি সম্পূর্ণ হয়। প্রিমিটিভ স্টীকের সামনে কোষ জড় হয়ে হেনসেন নোড তৈরী করে। এর থেকেই নোটোকর্ড অঞ্চলটি সৃষ্টি হয়। প্রিমিটিভ স্টীকের মধ্যে এন্ডো ও মেসোডার্ম কোষস্তর তৈরীর কোষগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়। এন্ডোডার্ম কোষগুলি অগ্র-অন্ত্র ও কুসুমথলির আবরণী গঠন করে। মেসোডার্ম কোষগুলি মস্তক মেসোডার্ম, সোমাইট ও পার্শ্বীয় মেসোডার্ম গঠন করে। ক্রমে এন্ডো ও মেসোডার্ম কোষগুলি প্রিমিটিভ স্টীক থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় এই গঠনটি সংকুচিত হয়ে অবশেষে লুপ্ত হয়।

1.3.21 প্রশ্নাবলী

A. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

1. ক্লিভেজে কোষবিভাজনের বৈশিষ্ট্য কী?
2. ক্লিভেজে কোষে রাসায়নিক পরিবর্তন বিবৃত করুন?
3. কুসুমের পরিমাণ অনুযায়ী ক্লিভেজের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।
4. ব্লাস্টোডিস্ক কী?
5. মরুলা ও ব্লাস্টুলার মধ্যে পার্থক্য কী?

6. ব্লাস্টোসিল কাকে বলে?
7. ভাগ্য-মানচিত্র তৈরীর পদ্ধতিগুলি উল্লেখ করুন।
8. গ্যাসট্রুলেশনে কুসুমের প্রভাব কী?
9. গ্যাসট্রুলেশনের সংজ্ঞা লিখুন। ওই প্রক্রিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি?
10. মরফোজেনেটিক মুভমেন্ট কাকে বলে? গ্যাসট্রুলেশনে এর প্রয়োজনীয়তা কতখানি?

B. দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1. কুসুমবস্তুর পরিমাণ ও অবস্থান কিভাবে অ্যাম্ফিঅক্সাসের ক্লিভেজ প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে বর্ণনা দিন।
2. ব্যাঙের ক্লিভেজ প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিন।
3. হলোব্লাস্টিক ও মেরোব্লাস্টিক ক্লিভেজের তুলনামূলক আলোচনা করুন?
4. ব্যাঙের গ্যাস্টুলেশনের বর্ণনা দিন।
5. গ্যাস্টুলেশন প্রক্রিয়ায় সংগঠকের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

C. তুলনা করুন ঃ

1. এপিবলি ও এমবলি
2. ইনভ্যাজিনেশন ও ইনভলুশান

D. শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

1. ক্লিভেজে প্রতিটি কোষকে _____ বলে।
2. কুসুমবস্তু ডিমের যে অঞ্চলে থাকে তাকে _____ বলে।
3. _____ প্রাণীতে অসম হলোব্লাস্টিক ক্লিভেজ দেখা যায়।
4. অ্যাম্ফিঅক্সাসে _____ ক্লিভেজ দেখা যায়।
5. পরিস্ফুটনকালে ভ্রূণের দেহের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে কোষসমষ্টির স্থানান্তরকে _____ বলে।
6. গ্যাস্টুলেশন পর্যবেক্ষণে _____ খুবই সহায়ক।
7. গ্যাস্টুলেশন বহির্মুখী কোষসঞ্চালন প্রক্রিয়াকে _____ ও অন্তর্মুখী কোষ সঞ্চালন প্রক্রিয়াকে _____ বলে।

1.3.22 উত্তরমালা

A. 1. 1.3.4
2. 1.3.5
3. 1.3.6
4. 1.3.6
5. নিরেট কোষবলকে মরুলা ও ব্লাস্টোসিল গহবরযুক্ত বলকে ব্লাস্টুলা বলে।
6. ব্লাস্টুলার মধ্যের গহবর
7. 1.3.18
8. 1.3.12
9. 1.3.12 ; 1.3.13

10. 1.3.13

B. 1. 1.3.9
2. 1.3.10
3. 1.3.11
4. 1.3.19
5. 1.3.16

C. 1. 1.3.17
2. 1.3.17

D. 1. ব্লাস্টোমিয়ার
2. ভেজিটাল মেরু
3. স্তন্যপায়ী
4. হলোব্লাস্টিক (পূর্ণ)
5. মরফোজেনেটিক মুভমেন্ট
6. ভাগ্য-মানচিত্র
7. এপিবলি, এমবলি।

1.4.1 উদ্দেশ্য

- ভ্রূণঝিল্লী কি এবং এদের গঠনের প্রয়োজনীয়তা কি তা ব্যাখ্যা করা যাবে।
- ঝিল্লীগুলি ভ্রূণের বৃদ্ধিতে সহায়ক হলেও এরা ভ্রূণের পরিস্ফুরণে সাহায্য করে না, যদিও এদের ছাড়া ভ্রূণের অস্তিত্বও সম্ভব নয়— এই তথ্যটির তাৎপর্য বোঝা যাবে।
- ভ্রূণঝিল্লী কিভাবে স্তন্যপায়ী প্রাণীতে অমরা গঠনে সাহায্য করে তা জানতে পারা যাবে।

1.4.2 প্রকারভেদ

মুরগীর ভ্রূণে চারটি ঝিল্লী দেখা যায়। ঝিল্লীগুলি যথাক্রমে কুসমথলি (Yolk sac), এ্যামনিয়ন (Amnion), কোরিয়ন (Chorion), বা সেরোসা (Serosa) ও এ্যালানটয়েস (Allantois)।

মুরগীর গ্যাসট্রুলেশনে (gastrulation) কোষের দিকে পার্শ্বীয় মেসোডার্ম (lateral mesoderm) বিভক্ত হয়ে সোমাটিক মেসোডার্ম (somatic mesoderm) সৃষ্টি করে।

এর অল্প সময় পরই সোমাটিক মেসোডার্ম এর কাছের এক্টোডার্মের সঙ্গে মিলে সোমাটোপ্লুরা (Somatopleura) ও সপ্ল্যাংকনিক মেসোডার্ম এন্ডোডার্মের সঙ্গে জুড়ে সপ্ল্যাংকনোপ্লুরা (Splanchnopleura) তৈরী করে।

এই সোমাটোপ্লুরা ও সপ্ল্যাংকনোপ্লুরার সীমানা প্রথম দশায় ভ্রূণের মধ্যে নির্দিষ্ট থাকলেও পরবর্তীকালে ভ্রূণের আয়তন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বাইরেও প্রসারিত হয়। ফলে ভ্রূণস্থ ও ভ্রূণবহিঃস্থ কোষগুলি পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত থাকে। কিন্তু ক্রমে দেহভাঁজ দেখা দেয়। এগুলি ভ্রূণকে একটা সুনির্দিষ্ট আকার পেতে সাহায্যকরে আর ভ্রূণস্থ ও ভ্রূণবহিঃস্থ কোষের মধ্যে সীমানা তৈরী করে। এই দেহভাঁজগুলির সঙ্গে তিনটি কোষস্তর যুক্ত থাকে। দেহভাঁজগুলি যথাক্রমে মস্তকভাঁজ (Cephalic head fold), পার্শ্বীয় ভাঁজ (lateral folds), পশ্চাৎ ভাঁজ (Caudal fold)। মস্তক ভাঁজ ইনকিউবেশনের 30 ঘন্টার মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। এই ভাঁজটি মাথায় সামনে ও নিচের দিকে প্রসারিত হয়ে দেহের সামনের ভাগকে (যেমন মাথা ইত্যাদি) কুসুম থেকে পৃথক করে। এইভাবে দেহের দুপাশে পার্শ্বীয় ভাঁজ তৈরী হয় ও এরা দুই পাশে কুসুম থেকে ভ্রূণকে বিচ্ছিন্ন করে। ইনকিউবেশনের তৃতীয় দিনে পশ্চাৎ ভাঁজ দেখা যায়। এই ভাঁজ ভ্রূণের লেজের অংশকে কুসুম থেকে আলাদা করে।

1.4.3 কুসুমথলি

সপ্ল্যাংকনোপ্লুরার প্রসারণে ইনকিউবেশনের 24 ঘন্টার মধ্যেই কুসুমথলি (Yolk sac) তৈরী লক্ষ্য করা যায়। এইসময় আদিম অন্ত্রটির (Primitive gut) শুধুমাত্র ওপরের দিকে (পৃষ্ঠদেশে) কোষ থাকে। নিচের দিকে কুসুম সাময়িকভাবে মেঝে (floor) হিসাবে কাজ করে। সপ্ল্যাংকনোপ্লুরার ভ্রূণের বাইরে (বহিঃস্থ ভ্রূণে) প্রসারণের ফলে কুসুমটি থলির আকার ধারণ করে, আর ভ্রূণের মধ্যে এটি অন্ত্র গঠনে কাজ করে। সপ্ল্যাংকনোপ্লুরা দিয়ে গঠিত হওয়ার জন্য এর ভিতরের কোষ এন্ডোডার্ম এবং বাইরের কোষ সপ্ল্যাংকনিক মেসোডার্ম দিয়ে তৈরী। মস্তকভাঁজ ও পার্শ্বীয় ভাঁজের উৎপত্তির ফলে ভ্রূণের মাথা ও গলার অংশ নিচের কুসুম থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং এই অঞ্চলে অধঃমস্তিষ্ক খাঁজ বা পকেট (Subcephatic pocket) দেখা যায়। ভাঁজ সৃষ্টি এবং এর পিছনদিকে প্রসারণের ফলে এন্ডোডার্ম নলাকার হয় ও অগ্রঅন্ত্র (foregut) তৈরী করতে সক্ষম হয়। একইভাবে ইনকিউবেশনের তৃতীয় দিনে ভ্রূণের শরীরের পিছনদিকে অধঃপশ্চাৎ অন্ত্র (mindgut) তৈরী হয়। অন্ত্রের এখনও অনির্মিত অংশ মধ্যঅন্ত্র (midgut) কুসুমের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ক্রমশঃ অধঃমস্তিষ্ক ও অধঃপশ্চাৎ খাঁজ দুটির প্রসার ঘটে এবং কুসুমের সঙ্গে

ভ্রূণের যোগের অংশও সঙ্কুচিত হয়, আর অগ্র ও পশ্চাৎ অন্ত্র আকারে বড় হয়। শেষে কুসুমথলির সঙ্গে মধ্যঅন্ত্রের যোগ একটি ছিদ্রপথের রূপ নেয় এবং এটিকে কুসুমনালী (Yolk duct) ও এর প্রাচীরকে কুসুমবৃন্ত (Yolk stalk) বলে। কুসুমথলির প্রাচীরের সঙ্গে কুসুমবৃন্তের মাধ্যমে অন্ত্রের যোগ থাকলেও ভ্রূণের সপ্ল্যাংকনোপ্লুরা তথা ভ্রূণ বহিঃস্থ সপ্ল্যাংকনোপ্লুরার সীমা কুসুমবৃন্ত পর্যন্তই নির্দিষ্ট থাকে।

কুসুমবৃন্তের মাধ্যমে ভাইটেলাইন ধমনী বা ওসফালোমেসেনটারিক ধমনী (Vitelline or Omphalomesenteric arteries) আর ওসফালোমেসেনটারিক শিরা (Omphalomesentric vein) পাশাপাশি থাকে আর কুসুমথলির সপ্ল্যাংকনোপ্লুরার রক্তজালিকা সৃষ্টি করে। এর ফলে কুসুমথলি মধ্য অন্ত্র থেকে ভাইটেলাইন চাপ যা রক্তসংবহন চাপের (Vitelline arc or circulating arc) মাধ্যমে ঝুলতে থাকে।

পাখীর ডিমে কুসুমের পরিমাণ খুব বেশী। কিন্তু তা সরাসরি অন্ত্রে পৌঁছায় না। উল্লেখ্য যে, স্তন্যপায়ী প্রাণীর ডিমে কুসুম না থাকলেও কুসুমথলি বর্তমান থাকে। কুসুম সপ্ল্যাংকনোপ্লুরার এন্ডোডার্ম কোষ নিঃসৃত উৎসেচকে (enzyme) পাঠ্য হয়ে দ্রবীভূত তরল পদার্থে পরিণত হয়। এরপর রক্তজালিকা বাহিত হয়ে ভাইটেলাইন শিরায় শোষিত হয় ও ভ্রূণের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ভ্রূণের বৃদ্ধির সঙ্গে কুসুমথলির মধ্যেও অনেক খাঁজ দেখা যায়। এগুলি কুসুমথলির আয়তন বাড়ায় এবং শোষণ সহজ করে।

পরিস্ফুরণের সময় অ্যালবুমেন (albumen) থেকে জলীয় অংশ নিঃসৃত হয় এবং এর পরিমাণ খুব তাড়াতাড়ি কমতে থাকে। এই সময় অ্যালটয়েস (allantois) (আর একটি বহিঃস্থ ঝিল্লী) ঝিল্লীর দ্রুত বৃদ্ধির চাপে অ্যালবুমেন কুসুম থলির প্রান্তে সরে আসে। ক্রমে কুসুমথলির সপ্ল্যাংকনোপ্লুরা প্রসারিত হয়ে অ্যালবুমেনকে ঘিরে ফেলে এবং ভ্রূণ বহিঃস্থ রক্তনালিকা অ্যালবুমেন শোষণ করে ভ্রূণবৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

ভ্রূণের বৃদ্ধির শেষের দিকে (19 দিন) শোষণের পর বাকী কুসুম থলিসমেত ভ্রূণের মধ্য অন্ত্রের মধ্যে নীত হয় এবং ডিম ফুটে বাচ্চা হবার 6 দিনের মধ্যেই এই কুসুম এবং কুসুমথলির প্রাচীর পূর্ণশোধিত হয়ে নিঃশেষ হয়।

1.4.4 এ্যামনিয়ন ও কোরিয়ন (Amnion and Chorion)

ভ্রূণ বহিঃস্থ সোমাটোপ্লুরা থেকেই এই দুটি ঝিল্লী সৃষ্টি হয়। ডিমে তা (imbation) দেবার প্রায় 30 ঘন্টার মধ্যে এ্যামনিয়ন সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা যায়।

বৃদ্ধির সময় ভ্রূণের মাথার অংশ নীচে কুসুমের মধ্যে নেমে যেতে থাকে। এই সময় ভ্রূণ বহিঃস্থ সোমাটোপ্লুরা একটি ভাঁজ সৃষ্টি করে। একে অ্যামনিওটিক মস্তক ভাঁজ (amniotic head fold) বলে। প্রথম দশায় এটি দেখতে অর্ধচন্দ্রাকার এবং ভ্রূণের মাথার অংশ সোমাটোপ্লুরা দিয়ে তৈরী। এই দুইস্তর যুক্ত ভাঁজের মধ্যে রক্ষিত হয়। ক্রমশঃ এই ভাঁজ পাশের দিকেও বাড়তে থাকে (lateral amniotic fold)। ভ্রূণ বৃদ্ধির তৃতীয় দিনে অ্যামনিওটিক মস্তক ভাঁজের মতন আর একটি দ্বি-স্তরযুক্ত ভাঁজ ভ্রূণের লেজের অংশে দেখা যায়। এই পশ্চাৎ ভাঁজ (amniotic tail fold) বিপরীতমুখী অর্থাৎ সামনের দিকে প্রসারিত হয়। মস্তক, পার্শ্বীয় ভাঁজ আর পশ্চাদ ভাঁজের ক্রমান্বয় বৃদ্ধির ফলে এগুলি ভ্রূণের দেহের উপরের দিকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভ্রূণকে ঢেকে ফেলে। প্রথম অবস্থায় এই ঝিল্লিগুলির একে অপরের সঙ্গে সংযোগস্থানে একটি চিহ্ন থাকে। একে সেরো-অ্যামনিওটিক সংযোগ (Sero-amniotic raphe) বলে। এই ভাঁজগুলির মিলনের ফলে দেহের উপরের দিকে দুটি আবরণের সৃষ্টি হয়। প্রথমটি অ্যামনিওন (amnion) ও অন্যটি সেরোমা বা কোরিয়ন (Chorion)। ভ্রূণ বহিঃস্থ সোমাটোপ্লুরা থেকে সৃষ্টি হলেও কোষ সজ্জায় অ্যামনিওনও সেরোসা পরস্পরের বিপরীত। অ্যামনিয়নের বাইরে থাকে সোমাটিক মোসোডার্ম ও

ভিতরে এক্টোডার্ম। কিন্তু সেরোসার ভিতরের স্তর সোমাটিক মেসোডার্ম ও তার বাইরের আবরণ এক্টোডার্ম দিয়ে তৈরী। এই এক্টোডার্ম কুসুমথলির বৃন্ত ও অ্যালানটোয়িক বৃন্ত অংশে ভ্রূণের এক্টোডার্মের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন থাকে।

ভ্রূণ ও অ্যামনিওনের মাঝের অংশকে অ্যামনিওটিক গহবর (amniotic space) বলা হয়। এটি অ্যামনিওটিক তরলে (amniotic fluid) পূর্ণ থাকে (চিত্র নং 4.1)।

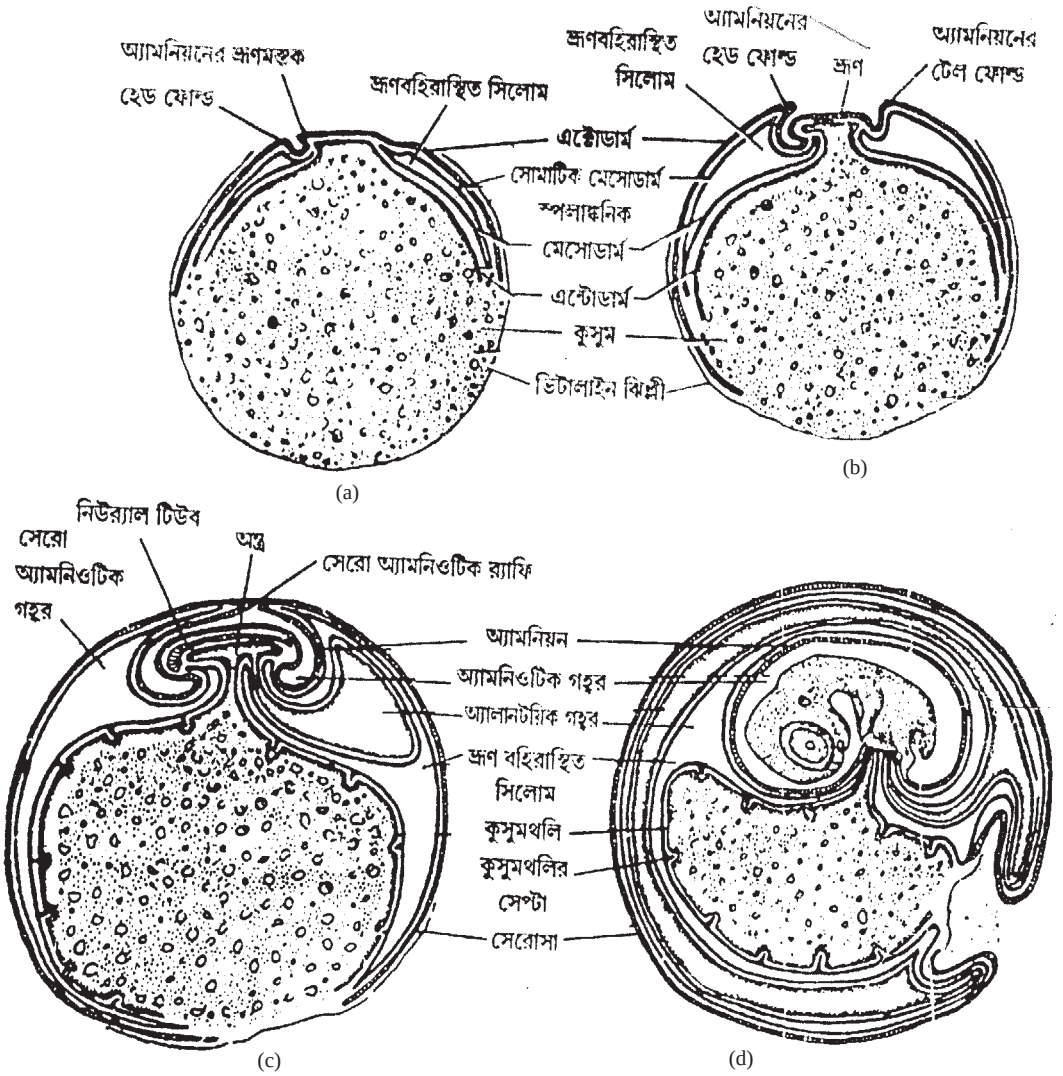

চিত্র নং 4.1 ঃ মুরগীর ভ্রূণ বহিঃস্থ ঝিল্লীসমূহের চিত্ররূপ। ভ্রূণটির লম্বচ্ছেদ দৃশ্য। a) ইনকিউবেশনের দ্বিতীয় দিনের শুরুতে ভ্রূণের চিত্র, b) ইনকিউবেশনের তৃতীয় দিনের শুরুতে চিত্র, c) পঞ্চম দিনের ও d) ইনকিউবেশনের নবম দিনের ভ্রূণের চিত্র।

অ্যামনিওনের কাজ ঃ

1. অ্যামনিওন সৃষ্টির ফলে ভ্রূণ শুষ্কতা থেকে রক্ষা পায় (দ্রষ্টব্য ঃ অ্যামনিওন সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীতে দেখা যায়— তাই এদের সম্মেলকভাবে অ্যামনিওটা (amniota) বলে।)

2. এটি ভ্রূণকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে।

3. অ্যামনিওনের পেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণের জন্য ভ্রূণটি সবসময় আন্দোলিত হতে থাকে। ফলে অ্যামনিওনের দেওয়ালে লেগে ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা করে।

অ্যামনিওন ও কোরিয়নের মাঝখানের অঞ্চলটি বহিঃস্থ ভ্রূণীয় দেহগহবর (extra-embryonic coe) বলে। তা দেওয়ার 15 দিনের মধ্যে এটি অনেক বড় হয় আর কুসুমথলি ও অ্যালবুমেন থলিকে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে ফেলে। ক্রমে অ্যালানটয়েস ও কোরিয়নের মধ্যেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

কোরিয়নের কাজ ঃ

1. ভ্রূণকে রক্ষা করা।
2. কোরিয়ন অ্যালানটয়েসের সঙ্গে মিলে শ্বসনে সাহায্য করে।
3. অ্যালবুমেন শোষণ করে ভ্রূণের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

1.4.5 অ্যালানটয়েস (Allantois)

ডিমে তা দেবার তৃতীয় দিনে পশ্চাৎ পৌষ্টিক নালীর অংকদেশ থেকে একটি উপবৃদ্ধি (diverticulum) হিসাবে অ্যালানটয়েসের সৃষ্টি। উৎপত্তি হিসাবে এজন্য এটি অ্যামনিওন, কুসুমথলি বা কোরিয়ন থেকে আলাদা।

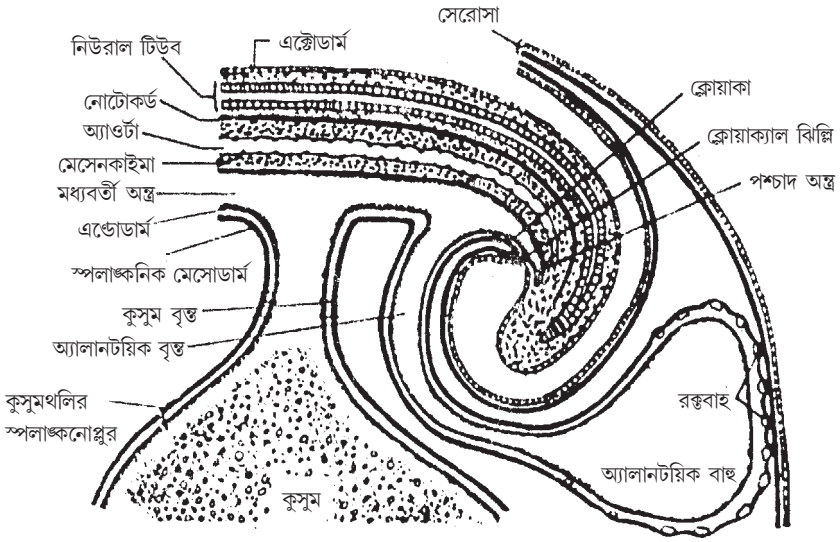

চিত্র নং 4.2 ঃ মুরগীর ভ্রূণের কড়াল অংশের শীর্ষচ্ছেদের পরিকল্পনীয় চিত্রে অ্যালানটয়েসের গঠন দেখানো হয়েছে।

এর বৃদ্ধিও খুব তাড়াতাড়িই হয়। ইনকিউবেশনের চতুর্থ দিনে অ্যালামটয়েস যথেষ্ট বড় হয়। এর মূল ভ্রূণের মধ্যে থাকলেও দূরবর্তী অংশটি বহিঃভ্রূণীয় সিলোমের মধ্যে ঢুকে পড়ে আর কোরিয়ন, অ্যামনিওন ও কুসুমথলির সঙ্গে বড় হয়। ইনকিউবেশনের দশম দিনে এটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং এইসময় এটিকে দেখতে বেলুনের মতন লাগে। ভ্রূণের অন্ত্রের উপবৃদ্ধি থেকে উৎপন্ন হওয়ার জন্য এটি ভ্রূণের সপ্ল্যাংকনোপ্লুরা দিয়ে তৈরী অর্থাৎ এর ভেতরের দেওয়াল এন্ডোডার্ম ও বাইরে সপ্ল্যাংকনিক মেসোডার্ম থাকে। অ্যালানটয়েস একটি সরু নালী দিয়ে ভ্রূণের সঙ্গে

যোগাযোগ রাখে। এটিকে অ্যালানটয়িক বৃন্ত (allantoic stalk) এবং বেলুনের মত বড় অংশটিকে অ্যালানটয়িক ভেসিকল বা থলি (allantoic vesicle) বলে। অ্যালনটয়েসের বেশ কিছু অংশ কোরিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে

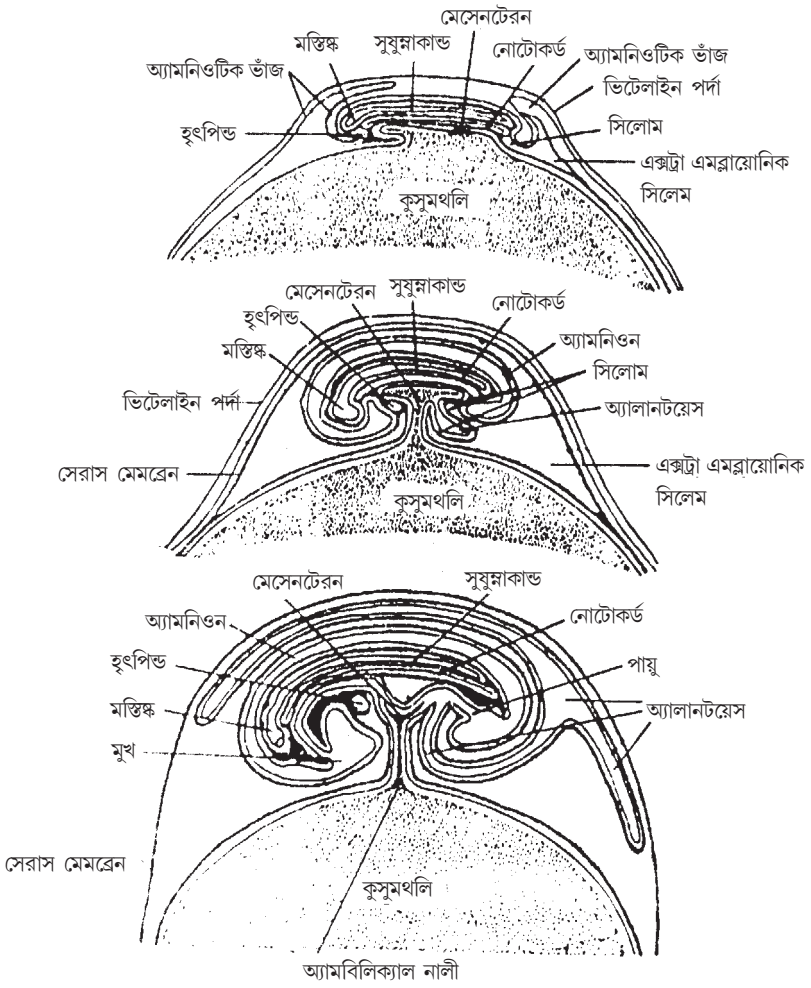

চিত্র নং 4.3 ঃ মুরগীর ভ্রূণ বহিস্থ পর্দার গঠনের বিভিন্ন পর্যায়

কোরিও অ্যালানটয়েস (Chorio-allantois) গঠন করে। এই জায়গাটি বিশেষভাবে রক্ত সমৃধ্ধ থাকে। মুরগী খোলস ভেঙে বাইরে না আসা পর্যন্ত অ্যালানটয়েস অটুট থাকে। শাবক বাইরে আসার সময় অ্যালানটয়িক বৃন্ত ছিন্ন হয়। সঞ্চিত বর্জ্যপদার্থে পূর্ণ অ্যালানটয়েসকে খোলসের গায়ে একটি শুকনো ঝিল্লী হিসাবে লেগে থাকতে দেখা যায় (চিত্র নং 4.2, 4.3, 4.4)।

অ্যালানটয়েসের কাজ ঃ

1. অ্যালানটয়েস ভ্রূণের শ্বসনকাজ করে থাকে। রক্তবাহ নালীগুলি (allantric blood vessels) ভ্রূণকে অক্সিজেন সরবরাহ করে ও ভ্রূণকে কার্বন ডাই-অক্সাইড মুক্ত করে।

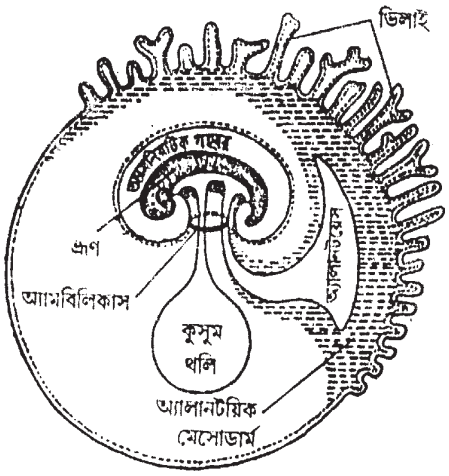

চিত্র নং 4.4 ঃ প্ল্যাসেন্টাল স্তন্যপায়ীর ভ্রূণের চারিপাশে বিভিন্ন প্রকার বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লি

2. এটি ভ্রূণের মূত্রথলির কাজ করে। ভ্রূণের দেহে যে সব বর্জ্য পদার্থ তৈরী হয় খোলস দিয়ে ঢাকা থাকার জন্য সেগুলি দেহের বাইরে নিক্ষিপ্ত হতে পারে না। আবার দেহে সেগুলি ঠিকমতন না রাখতে পারলে অধিবিষ বিক্রিয়া (toxic effect) অবশ্যম্ভাবী। অ্যালানটয়েসের মধ্যে ভ্রূণ সৃষ্টির প্রথম দশায় ইউরিয়া, পরে ভ্রূণের বড় হওয়ার সঙ্গে ইউরিক অ্যাসিড (uric acid) সঞ্চিত হয়।

3. ভ্রূণের শরীরে হাড় তৈরীর কাজের জন্য অ্যালানটয়েসের রক্তনালী ডিমের খোলস থেকে ক্যালসিয়াম শোষণ করে।

4. কোরিও অ্যালানটরেস অ্যালবুমেন শোষণ করে।

5. অ্যালানটরেসের মেসোডার্ম ও কোরিয়নের মেসোডার্ম মিলে ভ্রূণের পেশীতন্তু তৈরীতে সাহায্য করে।

1.4.6 অমরার প্রস্তাবনা

নিম্নশ্রেণীর মেরুদন্ডী প্রাণীর (মৎস্য ও উভচর শ্রেণীর) ডিম্বাণু কুসুমযুক্ত হয় এবং এদের নিষেক জলে সংঘটিত হয়। ফলে বহু ডিম্বাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অধিক সংখ্যায় উৎপাদনের জন্য এদের বংশবিনাশ ঘটে না। এইসব ডিম্বাণু ও ভ্রূণের বৃদ্ধি স্বাধীনভাবে হয়, কোনও রকমেই জনিতার ওপর নির্ভরশীল থাকে না।

ক্রমবিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়ে উন্নত শ্রেণীর মেরুদন্ডী প্রাণীর নিষিক্ত ডিম্বাণু স্থলে পরিত্যক্ত হয়। এই নূতন অবিয়োজনের জন্য ভ্রূণের পরিস্ফুরণ, বৃদ্ধি, গঠন এবং সংরক্ষণের প্রক্রিয়াও জটিলরূপ ধারণ করে এবং ডিম্বাণুর সংখ্যাও কম থাকে। বংশরক্ষার জন্য ওই অল্পসংখ্যক ডিম্বাণুর রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভ্রূণের উদ্‌বর্তনের (survival) সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করতে মেরুদন্ডী প্রাণীর মধ্যে জনিতৃ পরিচর্যার (Parental care) প্রবণতা দেখা যায়। এই জনিতৃ পরিচর্যা চরম উৎকর্ষতা লাভ করে স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে। মোনোট্রিমাটা (Monotremata) ব্যতীত সব স্তন্যপায়ী প্রাণীর নিষেক জননতন্ত্রের মধ্যেই ঘটে থাকে। এদের ডিম্বাণুতে কুসুম সঞ্চয় খুবই কম থাকে। ভ্রূণের পরিস্ফুরণ, বৃদ্ধি এবং অন্যান্য বিপাকীয় প্রয়োজনীয়তার জন্য এরা সম্পূর্ণভাবে মাতার উপর নির্ভরশীল। সুষ্ঠুভাবে মাতৃজরায়ুর পাতসংলগ্ন (implantation) হবার জন্য ভ্রূণের বহিঃস্থ মেমব্রেন (বা ঝিল্লী) সমূহের সঙ্গে জরায়ুর প্রাচীরের বিক্রিয়া ও সংযোগ ঘটে। ভ্রূণের সঙ্গে মাতৃকলার এই সংযোগকারী অংশকে প্লাসেন্টা বা অমরা বলা হয়।

গ্রীক ভাষায় প্লাসেন্টা শব্দটির অর্থ চ্যাপ্টা 'কেক' (flat cake)। মানুষের অমরা চ্যাপ্টা এবং দেখতেও চাকতি মতন। ইংরেজী শব্দ প্ল্যাসেন্টা বাংলা পরিভাষায় আবার অমরা (বা ফুল) বলে অবিহিত।

1.4.7 উদ্দেশ্য

- অমরা কোন শ্রেণীতে পাওয়া যায় তা জানা যাবে।
- অমরার গঠন ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা যাবে।
- স্তন্যপায়ী প্রাণীতে কত ধরনের অমরা দেখা যায় তা নির্দেশ করা যায়।

- খরগোসের অমরার বিবরণ দেওয়া যাবে এবং যেহেতু এই অমরা গঠনে মানুষের অমরার সঙ্গে অনেক মিল দেখা যায় সেই কারণে মানুষের অমরা গঠন সম্বন্ধেও ধারণা পাওয়া যাবে।

1.4.8 সংজ্ঞা

টোরি ও ফেডুসিয়া (Torry and Fedducia) : এই ভ্রূণবিদ্যা বিশারদদ্বয়ের মতে, অমরা প্রাথমিকভাবে একটি গঠনমূলক প্রক্রিয়া। এটি শারীরবৃত্তীয় আদান-প্রদানের জন্য ভ্রূণের বহিঃস্থ ঝিল্লীর সঙ্গে মাতৃজবায়ুর মিউকোসা ঝিল্লীর সংযোগ বা মিলনের দ্বারা সৃষ্ট।

ব্যালিনিস্কি প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী, অমরা মাতৃকলা ও ভ্রূণকলা দ্বারা গঠিত একটি ক্ষণস্থায়ী অঙ্গ যার প্রধান কাজ মাতার দেহ থেকে পুষ্টি, অক্সিজেন ইত্যাদি ভ্রূণকে সরবরাহ করা এবং ভ্রূণের দেহ থেকে বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থ নিকাশ করা।

প্যাটেল, কালমিন প্রদত্ত সংজ্ঞা ক্যালিনিস্কির সংজ্ঞার অনুগামী।

দ্রষ্টব্য ঃ স্তন্যপায়ী শ্রেণীভুক্ত ছাড়াও প্রাণীজগতে (Arthropoda) পর্বভুক্ত পেরিপেটাস *(Peripatus)*, নিম্নকর্ডাটা সালপা *(Salpa)*, একশ্রেণীর হাঙ্গর *(Mustelus laeuis)* এবং এক ধরনের গিরগিটিতেও অমরা দেখা যায়।

1.4.9 অমরার উদ্ভব ও প্রয়োজনীয়তা

স্তন্যপায়ী প্রাণীর ডিমে কুসুমের পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য। নিষিক্ত ভ্রূণ জরায়ুতে প্রবেশ করলে জোনা পেলুসিডা (Zona pellucida) আবরণ দ্রবীভূত হয়। ভ্রূণ এইসময় ব্লাস্টোসিস্ট দশায় (Blastocyst stage) থাকে এবং জরায়ু নিঃসৃত তরলে নিমজ্জিত থাকে। জরায়ুর তরলে দ্রবীভূত জৈব পদার্থ ভ্রূণের পুষ্টির জন্য অপরিহার্য। ভ্রূণ প্রাথমিক দশায় এপিথিলিয়াম আবরণীর সাহায্যে এই পুষ্টিরস শোষণ করে। কিন্তু বৃদ্ধির সঙ্গে ভ্রূণের খাদ্যের চাহিদাও বাড়তে থাকে। পদার্থসমূহের সরবরাহের পরিমাণ নিশ্চিত ও পর্যাপ্ত করার জন্য ভ্রূণকলা ও মাতৃকলার মধ্যে ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। এই কারণে কোরিয়নের বহিঃপ্রাচীর বা ট্রফোব্লাস্ট (Trophoblast) পুরু হয় এবং ভিলাই তৈরী করতে সক্ষম হয়। ভিলাইগুলি ক্রমশঃ জরায়ুর প্রাচীরে প্রবেশ করে। এই সময় জরায়ুর প্রাচীরও অবক্ষয়িত (Hypertrophied) হয়।

ব্লাস্টোসিস্টের গাত্রতল থেকে আঙুলের মতন প্রবর্ধকগুলি উদ্ভব হয়ে জরায়ুর গায়ে উপবিষ্ট হয় এবং সংযোগ ঘনিষ্ঠতর করে। প্রথমস্তরে এই প্রবর্ধনসমূহ ব্লাস্টোসিস্টের এপিথিলিয়াল স্তর ট্রফোব্লাস্ট দিয়ে গঠিত হয়। ক্রমশঃ সংযোগকলা (Connective tissue) এবং রক্তবাহকলাও এইসঙ্গে যুক্ত হয়। এই প্রবর্ধকগুলিকে কোরিয়নিক ভিলাই (Villi) বলা হয়। ভিলাইযুক্ত কোরিয়ন ও মাতার জরায়ুর প্রাচীর কলা মিলিতভাবে অমরা তৈরী করে। অমরা গঠনে অংশগ্রহণকারী জরায়ুকে ডেসিডুয়া (decidua) বলা হয়।

1.4.9.1 শ্রেণিবিভাগ

স্তন্যপায়ী প্রাণীতে প্রধানতঃ দুই ধরনের অমরা দেখা যায়।

1. **ইয়কথলি অমরা ঃ** সাধারণতঃ ক্যাঙ্গারু ইত্যাদি মারসুপিয়াল প্রাণীতে দেখা যায়। এই ধরনের অমরায় জরায়ুর গাত্রের সঙ্গে কোরিয়নের যার ভিতরের দিকে ভাইটেলাইন রক্তবাহযুক্ত কুসুমথলি থাকে, সংযোগ স্থাপিত হয়।

2. **অ্যালানটয়িক অমরা বা প্রকৃত অমরা ঃ** উন্নত স্তন্যপায়ী প্রাণীতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে মাতৃজঠরের সঙ্গে অ্যালানটয়েস রক্তবাহযুক্ত কোরিয়ন মিলিত হয়ে অমরা সৃষ্টি করে।

দ্রষ্টব্য ঃ ইয়কথলি অমরা অনেক উন্নত স্তন্যপায়ীতে অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে থাকে এবং অমরা গঠনে গৌণ ভূমিকা পালন করে।

সংযোগের ঘনিষ্ঠতায় অমরাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—

1. ননডেসিডুয়াল অমরা ঃ সাধারণতঃ গবাদি পশু ও শূকরে দেখা যায়। প্রসবের সময় কোরিয়ন ভিলাইগুলি মাতার জরায়ুর নিম্নখাঁজগুলির থেকে সহজেই আলগা হয়, ফলে জরায়ুর কোন ক্ষতি হয় না।

2. ডেসিডুয়াস অমরা ঃ উন্নততর স্তন্যপায়ী প্রাণীতে মাতার জরায়ুর সঙ্গে ভ্রূণকলার যোগ অনেক নিবিড়। ট্রফোব্লাস্টের বৃদ্ধির ফলে ভ্রূণকলা জরায়ুর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। এর ফলে জরায়ুর গাত্রতল বিভিন্ন হারে ক্ষয়প্রাপ্ত (eroded) হয় এবং ভ্রূণ ও মাতৃকোষের মধ্যে প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহের বিনিময় সহজ হয়। প্রসবকালে কোরিয়ন মেমব্রেন অপসারণের সময় জরায়ুর কোষকলার ক্ষতি হয় এবং অনেকক্ষেত্রে জরায়ুর গাত্রতল থেকে প্রচুর পরিমাণ রক্তপাতও হয়ে থাকে।

(a) ডিফিউস

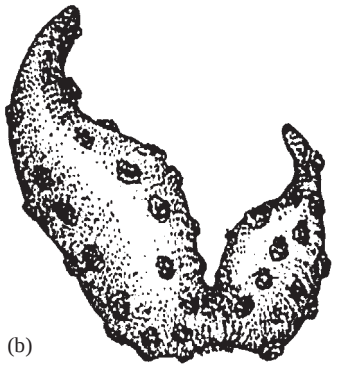

(b) কটিলিডনারী

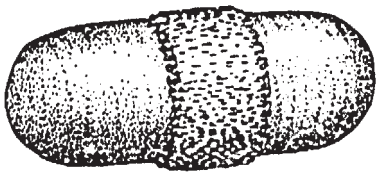

(c) জোনারী

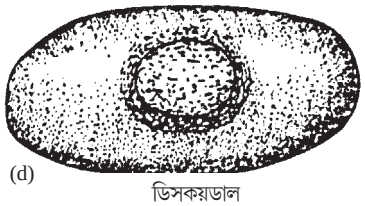

(d) ডিসকয়ডাল

চিত্র নং 4.5 ঃ বিভিন্ন স্তন্যপায়ীর অমরা

3. কনট্রা-ডেসিডুয়াল অমরা ঃ ভ্রূণ ও মাতার মধ্যে বন্ধন দূর হওয়া সত্ত্বেও প্রসবের সময় ক্ষতিগ্রস্ত জরায়ুর কোনও অংশ মাতৃদেহের বাইরে আসে না। উদাহরণ— পেরামিলিস (Perameles)।

ভিলাই-এর সজ্জাবিন্যাস অনুযায়ী অমরার প্রকারভেদ ঃ (চিত্র নং 4.5)

1. **পরিব্যাপ্ত বা ডিফিউসড্ অমরা ঃ** কোরিয়নের গায়ে সর্বত্র অসংখ্য ভিলাই ছড়ানো থাকে। উদা- ঘোড়া, শূকর।

2. **গুচ্ছাকার বা কটিলিওনারী অমরা ঃ** অ্যালান্টোকোরিয়নের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে ছোট ছোট গুচ্ছের আকারে ভিলাই অবস্থান করে। উদাহরণ- গরু প্রভৃতি রোমন্থনকারী প্রাণী।

3. **আঞ্চলিক বা জোনারী অমরা ঃ** ভিলাইগুলি ব্লাস্টোসিস্টের মধ্যঞ্চলে প্রশস্ত ফিতার মতন সজ্জিত থাকে। উদা- মাংসাশী প্রাণী।

4. **চাকতি বা ডিসকয়ডাল অমরা ঃ** অমরা গঠনের প্রথম দশায় ভিলাই কোরিয়নের গায়ে ছড়ানো অবস্থায় থাকে। পরবর্তীকালে ভিলাই ভ্রূণের অংকীয় অংশে একটি চাক্তি বা ডিসকের আকারে সীমাবদ্ধ থাকে। উদা- মানুষ, বনমানুষ, ইঁদুর, খরগোস।

5. **দ্বি-চাকতি বা বাইডিসকয়ডাল অমরা ঃ** অমরা যখন দুটি গোলাকার অঞ্চলে ভিলাই নিয়ে গঠিত হয়। উদা- বাঁদর।

1.4.9.2 অমরা গঠনে অংশগ্রহণকারী কলাসমূহ ঃ

মাতৃকলা ঃ

1. মাতার রক্তস্রোত
2. মাতার রক্তবাহের এন্ডোথিলিয়াল প্রাচীর
3. মাতার যোগকলা
4. জরায়ুর এপিথিলিয়াম

NSOU

ভ্রূণকলা ঃ

1. কোরিয়নের এপিথিলিয়াম
2. কোরিয়নের যোগকলা
3. কোরিয়নের রক্তবাহের এন্ডোথিলিয়াল প্রাচীর
4. ভ্রূণের রক্ত

1.4.9.3 অমরা বিন্যাস ঃ

ভ্রূণ ও জরায়ুর হৃদ্যতার প্রকারভেদের জন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীতে অমরা অংশগ্রহণকারী কলাসমূহের অংশগ্রহণের পার্থক্য দেখা যায় (চিত্র নং 4.6)।

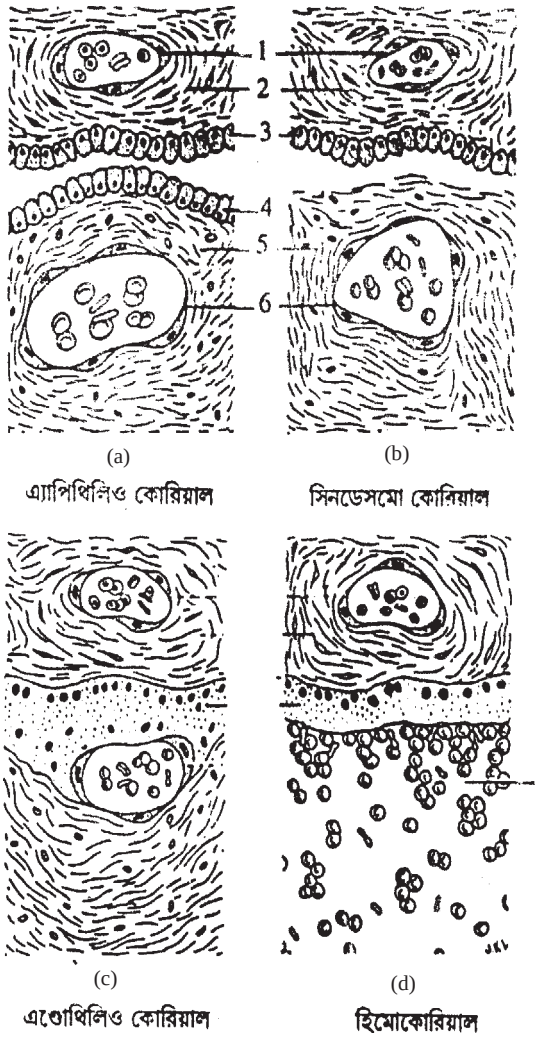

চিত্র নং 4.6 ঃ কোরিয়ন ও জরায়ুর মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সম্পর্কের চিত্ররূপ। 1. কোরিয়নিক রক্তবাহ, 2. কোরিয়নিক সংযোগ কলা, 3. কোরিয়নিক এ্যাপিথিলিয়াম, 4. জরায়ু-এ্যাপিথিলিয়াম, 5. জরায়ুর সংযোগ কলা, 6. জরায়ু রক্তবাহ।

1. **এপিথিলিও কোরিয়াল অমরা ঃ** এক্ষেত্রে ভ্রূণের এপিথিলিয়াম ও জরায়ুর এপিথিলিয়াম পরস্পরের সংস্পর্শে আসে। ভিলাইগুলি ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে জরায়ুর প্রাচীরের অন্তঃস্তরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসলেও প্রসবের সময় জরায়ুর অন্তঃস্তরকে কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না। উদা- শূকর, ঘোড়া।

2. **সিনডেসমো কোরিয়াল অমরা ঃ** ভ্রূণ ও মাতার কোষের যোগাযোগ অপেক্ষাকৃত নিবিড় হওয়ায় ফলে জরায়ুর এপিথিলিয়াম স্তরটি বিনষ্ট হয় এবং কোরিয়ন জরায়ুর যোগকলার সংস্পর্শে আসে। উদা- হরিণ, ভেড়া, গরু।

3. **এন্ডোথিলিও কোরিয়াল অমরা ঃ** জরায়ুর কোষকলার আরও ভাঙ্গন ঘটে এবং কোরিয়নের এপিথিলিয়ামের সঙ্গে জরায়ুর রক্তবাহের এন্ডোথিলিয়াল প্রাচীরের যোগ স্থাপিত হয়। উদা- বিড়াল, কুকুর।

4. **হিমোকোরিয়াল অমরা ঃ** মাতার জরায়ুর প্রাচীরের আরও উল্লেখযোগ্য ভাঙন দেখা যায় এবং ভ্রূণের কোরিয়ান মাতৃরক্তে স্নাত হয়। এর ফলে পুষ্টি এবং গ্যাস ইত্যাদি আদান-প্রদান অনেক সহজ হয়। উদা- মানুষ।

5. **হিমোএন্ডোথিলিয়াল অমরা ঃ** এই ধরনের অমরা গঠনে মাতার জরায়ু হিমোকোরিয়াল অমরার মতনই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ভ্রূণের ট্রফোব্লাস্টিক এপিথিলিয়ামও নষ্ট হয়। ফলে শুধুমাত্র ভ্রূণের এন্ডোথিলিয়াম মাতা ও ভ্রূণের রক্তপ্রবাহকে পৃথক রাখে। উদা- খরগোস।

1.4.10 খরগোসের অমরা গঠন ও পরিস্ফুরণ (Formation of Placenta in Rabbit)

পরিস্ফুটনের প্রাথমিক অবস্থায় অর্থাৎ ব্লাস্টোসিস্ট দশায় থাকাকালীন ভ্রূণ জরায়ুতে প্রবেশ করে। এই সময় ভ্রূণের জোনা পেলুসিডা (Zona pellucida) আবরণটি নষ্ট হয় এবং জরায়ুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য ট্রফোব্লাস্টে দুইটি নির্দিষ্ট স্তর দেখা যায়।

1. ভিতরের স্তরটিতে কোষীয় প্রকৃতি (Cellular nature) বজায় থাকে— এটিকে বলা হয় সাইটোট্রফোব্লাস্ট (Cytotrophoblast)

2. মাতৃকলার সংলগ্ন ট্রোফোব্লাস্টের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে এখানে বহু কোষ একত্র মিলিত হয়ে সিনসিটিয়াম (Syncitium) তৈরী করে এবং এই কারণেই ট্রফোব্লাস্টের বাইরের স্তরকে সিনট্রফোব্লাস্ট (Syntrophoblast) বলা হয়। আনুমানিক যে, মাতৃকলার সংস্পর্শে ট্রফোব্লাস্টের এই বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করে কারণ সদ্য সংলগ্নীকৃত (implanted) ভ্রূণের যে অংশ জরায়ুর গহবরে অনাবৃত থাকে সেই অংশের ট্রফোব্লাস্ট এককোষ স্তর (single cell layer) দ্বারা গঠিত থাকে।

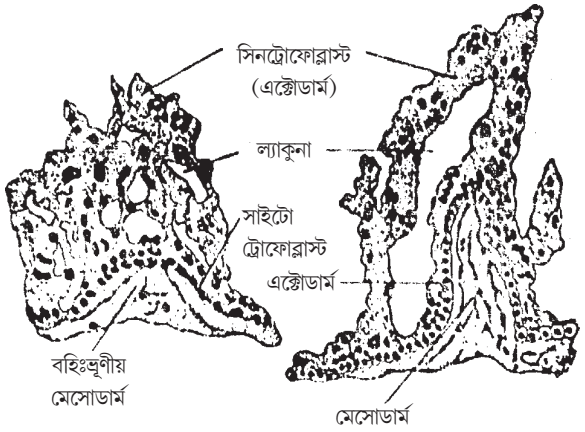

চিত্র নং 4.9 ঃ খরগোসের মৃত জরায়ু প্রাচীরে সৃষ্ট অমরার প্রাথমিক ও গৌণ ভিলাই ও ল্যাকুনা সৃষ্টি।

সংলগ্ন হবার সময় ট্রফোব্লাস্ট জরায়ুর মিউকোসার ক্ষতি করে। পরে ক্রমশঃ এপিথিলিয়াম, যোগকলা ও এন্ডোথিলিয়াম এই তিনটি স্তরই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ভ্রূণ ব্যাপন প্রক্রিয়ার (diffusion) জরায়ুর থেকে পুষ্টিরস শোষণ করে। এই সময় প্রসারণশীল সিনট্রফোব্লাস্ট স্তরের মধ্যে অসংখ্য গহবর (launae) দেখা যায় এবং এগুলি জরায়ুর ক্ষয়প্রাপ্ত রক্তবাহের রক্তে পূর্ণ হয়ে রক্তময় ল্যাকুনির (blood lacunae) সৃষ্টি করে। ট্রফোব্লাস্ট কোষ নিঃসৃত পদার্থ রক্ততঞ্চনে (blood coagulation) বাধা দেয়। প্রসারণরত ট্রফোব্লাস্ট এন্ডোমেট্রিয়ামের ক্ষয়প্রাপ্ত অঞ্চলে মাতৃরক্ত ও লসিকা (lymph) রসে সংপৃক্ত (saturated) থাকে (চিত্র নং 4.9)।

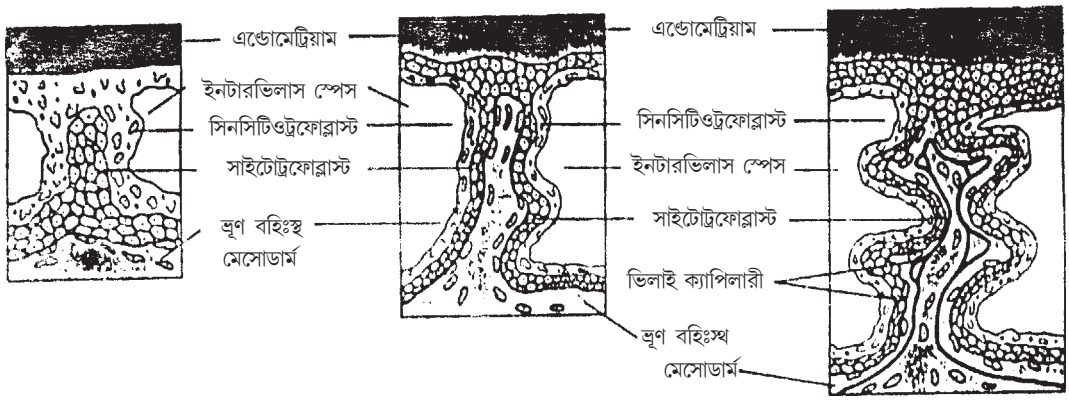

চিত্র নং 4.7 ঃ অমরা গঠনকালে ভিলাই সৃষ্টি (a-c)

ইমপ্লানটেশনের পরবর্তী দশায় ট্রফোব্লাস্টে ভিলাই তৈরী হয়। তরুণ অবস্থায় এই ভিলাই বা অভিক্ষেপগুলি শুধুমাত্র এপিথিলিয়াম দ্বারা তৈরী। এগুলিকে প্রাথমিক ভিলাই (Primary villi) বলে। ক্রমে কোরিয়ন এর পরবর্তী স্তর অ্যালানটয়েসের সঙ্গে মিলিত হয়ে কোরিও অ্যালানটয়েস গঠন করে। এর ফলে অ্যালানটয়েসের রক্ত বাহ ও মেসোডার্ম প্রসারিত হয় ও ভিলাই তৈরীতে অংশগ্রহণ করে। অ্যালামটয়েসের মেসোডার্ম কোষ থেকে উদ্ভূত যোগকলার সংযোগে ভিলাইগুলি সমৃদ্ধ হয়। এগুলিকে সেকেন্ডারী ভিলাই (Secondary villi) বলে। সেকেন্ডারী ভিলাই শাখান্বিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের রক্ত বাহগুলিও এই অঞ্চলে একত্রিত হয়ে টারশিয়ারী ভিলাই (Tertiary villi) গঠন করে। ইতিমধ্যে জরায়ু জালময় কোষকলা সম্বলিত হয়ে নতুনরূপ ধারণ করে। একে ট্রফোস্পঞ্জিয়া (trophospongia) বলে। ভ্রূণের ট্রফোব্লাস্ট ও মাতার ট্রফোস্পঞ্জিয়ার মধ্যে শারীরবৃত্তীয় মিলন ঘটে। এর ফলে শোষণ ও অন্যান্য আদান-প্রদান অনেক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় (চিত্র নং 4.7)।

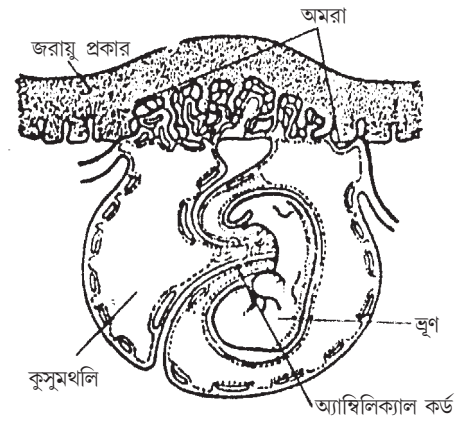

চিত্র নং 4.10 ঃ ভাঁজ সৃষ্টি হয়ে খরগোসের অমরা সৃষ্টির পরবর্তী দশা (চিত্ররূপ মসম্যানের অনুকরণে)

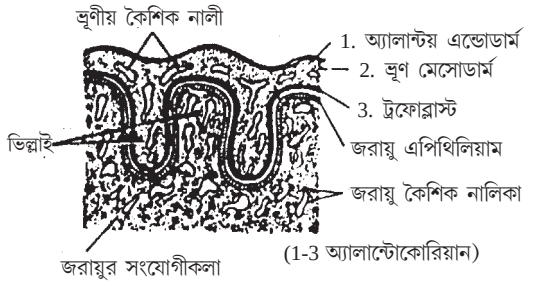

চিত্র নং 4.11 ঃ খরগোসের অমরার ছেদে মাতৃজরায়ু ও বহিঃভ্রূণীয় পর্দার সম্মিলনের চিত্ররূপ

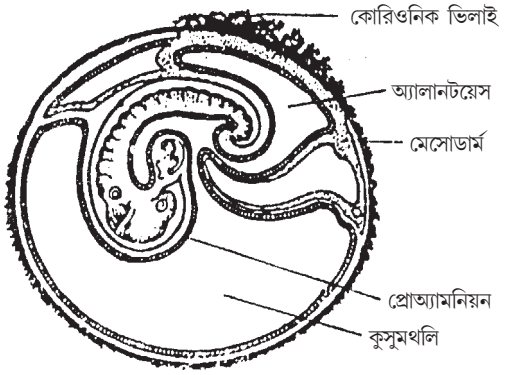

চিত্র নং 4.12 ঃ খরগোসের ভ্রূণ বৃদ্ধির দশম দিনের শেষে অমরার চিত্ররূপ (খুব কালো দাগ এক্টোডার্ম)

জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামের ভ্রূণের উপর প্রসারিত অংশকে ডেসিডুয়া ক্যাপসুলারিস (decidua capsularis) এবং এন্ডোমেট্রিয়ামের যে অংশ জরায়ুর পেশী ও প্রবিষ্টমান ভিলাই এর মধ্যে অবস্থিত থাকে ডেসিডুয়া বেসালিস (decidua basalis) বলে। এই দুই অংশ বাদ রেখে এন্ডোমেট্রিয়ামের বাকী অঞ্চলকে ডেসিডুয়া পেরাইটালিস (decidua perietalis) বলা হয়।

কোরিওনিক ভিলাই কোরিয়নিক ভেসিকলের সর্বত্র গঠিত থাকলেও শুধুমাত্র ডেসিডুয়া বেসালিস সংস্পর্শে যেগুলি থাকে তাদেরই বৃদ্ধি হয়। এই ভিলাইযুক্ত এলাকাকে কোরিয়ন ফ্রন্ডোসাম (chorion frondosum) বলে। ভিলাইযুক্ত কোরিয়নকে কোরিয়ন লিভি (Chorion leave) বলে। সুতরাং বলা যায়, কোরিয়ন ফ্রন্ডোসাম ও ডেসিডুয়া বেসালিস মিলিতভাবে অমরা গঠন করে।

পরিস্ফুরণের ভিত্তিতে খরগোসের অমরাকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। এগুলি যথাক্রমে এপিথিলিওকোরিয়াল, সিনডেসমোকোরিয়াল, এন্ডোথিলিওকোরিয়াল, হিমোকোরিয়াল ও হিমোএন্ডোথিলিয়াল দশা। আবার ভ্রূণবিজ্ঞানী এন্ডার্স (Enders, A.C., 1965) এর মতে খরগোসের

NSOU

কোরিয়ানের দুটি স্তর অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থায় থাকে, একেবারে বিনষ্ট হয় না। এই কারণে খরগোসের অমরা হিমোএন্ডোথিলিয়াল নয়, হিমোডাইকোরিয়াল (Hemodichorial) প্রকৃতির (চিত্র নং 4.10, 4.11, 4.12)।

1.4.11 অমরার বাধা

উন্নতশ্রেণীর স্তন্যপায়ী প্রাণীতে ভ্রূণ ও মাতার মধ্যে সম্পর্ক খুব নিবিড় হওয়া সত্ত্বেও কোনও সময়ই ভ্রূণ ও মাতৃরক্তের প্রত্যক্ষ সংমিশ্রণ ঘটে না। ভ্রূণের এপিথিলিয়াল কলা এক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ থাকে। একেই অমরা বা প্লাসেন্টার বাধা (Placental barrier) বলা হয়। তাই বাধা দ্বি-মুখী প্রবাহে বিঘ্ন ঘটায় না। ভ্রূণের দেহের বর্জ্য পদার্থ পরিত্যাগ ও মাতার দেহ থেকে পুষ্টি ভ্রূণের দেহে সরবরাহ অব্যাহত থাকে।

1.4.12 অমরার কাজ

অমরার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ উল্লেখ করা হল (চিত্র নং 4.8)।

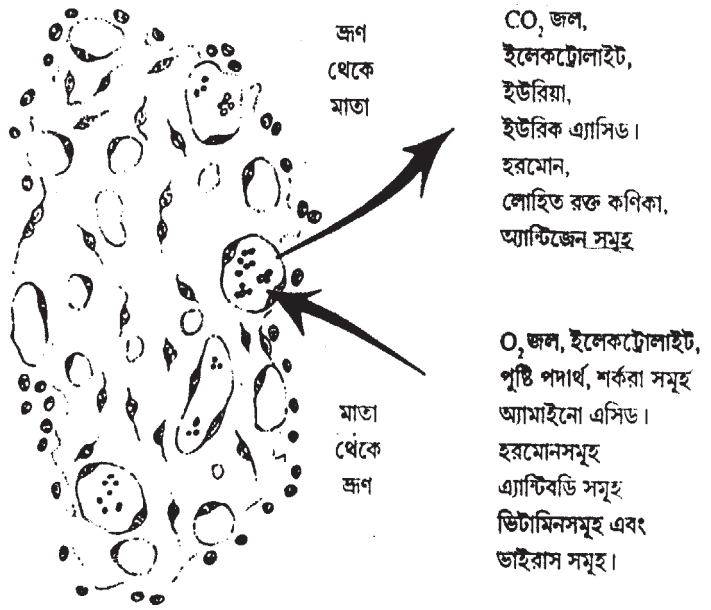

চিত্র নং 4.8 ঃ প্লাসেন্টার একটি ভিলাই-এর মাধ্যমে ভ্রূণ ও মাতার মধ্যে প্রধান বস্তু সমূহের বিনিময়ের চিত্ররূপ।

1. অমরার মাধ্যমে ভ্রূণ মাতার জরায়ু সংলগ্ন হওয়ার ফলে সুরক্ষিত থাকে।

2. অমরার মধ্য দিয়ে ব্যাপন (diffusion) প্রক্রিয়ায় ভ্রূণ মাতার দেহ থেকে অকসিজেন, বিভিন্নপ্রকার জৈব এবং অজৈব আয়ন (ion) গ্রহণ করে। আবার ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্নপ্রকার শর্করা, প্রোটিন, লিপিড ইত্যাদি সক্রিয় সংবহনের (active transport) মাধ্যমে মাতার দেহ থেকে ভ্রূণের দেহে সরবরাহ হয়। হরমোন, অ্যান্টিবডি ইত্যাদি মাতার দেহ থেকে ভ্রূণে পরিবহন পিনোসাইটোসিস (Pinocytosis) প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে ঘটে থাকে।

3. ভ্রূণের দেহে অপচিতিমূলক কাজের ফলে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার বর্জ্য পদার্থ যেমন- কার্বন ডাই অক্সাইড, ইউরিয়া, ইলেকট্রোলাইট ইত্যাদি মাতার দেহে পরিবাহিত হয়।

4. অমরা ভ্রূণের দেহে জীবাণুর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।

5. অমরা স্টেরয়েড হরমোন ইস্ট্রোজেন (estrogen) ও প্রোজেস্টেরণ (Progesteron) নিঃসরণ করে। এই হরমোনগুলি ভ্রূণের জরায়ুর গাত্র সংলগ্ন (implantation) হওয়া ও বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রোটিন হরমোন লিওটিওট্রপিন (luteotropin) স্তনগ্রন্থিকে সক্রিয় করে তুলতে সাহায্য করে।

1.4.13 সারাংশ

নিষিক্ত ডিম থেকে উৎপন্ন ভ্রূণ কতকগুলি ঝিল্লিময় পর্দার দ্বারা আবৃত থাকে। এরিয়া ওপেকার বহিঃভ্রূণস্থ সোমাটোপ্লুরা বা সপ্ল্যাংকনোপ্লুরা অঞ্চলের কোষ দিয়ে এরা তৈরী। উৎপত্তির সময় হিসাবে তারা যথাক্রমে কুসুমথলি, অ্যাগনিয়ন, সেরোসা বা কোরিয়ন ও অ্যালানটয়েস। এই চারটি ঝিল্লী ভ্রূণ গঠনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলেও এরা কিন্তু ভ্রূণ গঠনে অংশ গ্রহণ করে না। এজন্য এদের ভ্রূণবহিঃস্থ ঝিল্লী বলা হয়।

ইনকিউবেশনের 24 ঘন্টার মধ্যে কুসুমথলি সৃষ্টির সূচনা লক্ষ্য করা যায়। ব্লাস্টোডার্মের কিনারার সপ্ল্যাংকটনো প্লুরা বিস্তৃত হয়ে ডিমের কুসুম অংশকে বেষ্টন করে। পাখীর ডিমে কুসুমের পরিমাণ বেশী। ভ্রূণে পৌষ্টিকনালী তৈরী সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কুসুম ভ্রূণের বৃদ্ধিতে খাদ্য সরবরাহ করে।

তা দেওয়ার 30 ঘন্টার মধ্যে বর্দ্ধনশীল ভ্রূণের সামনে 'মস্তক ভাঁজ' দেখা যায়। ইনকিউবেশনের 48 ঘন্টার মধ্যে অনুরূপ আয় একটি 'লেজ ভাঁজ' দেহের পিছনদিকে দেখা যায়। এগুলি ভ্রূণ বহিঃস্থ সোমাটোপ্লুরার বিস্তৃতিতে তৈরী হয়। তা দেওয়ার চতুর্থ দিনে মস্তক ও লেজভাঁজ পরস্পরের সঙ্গে মিলে ভ্রূণের দেহের উপরে দুইটি সম্পূর্ণ থলির মত আবরণ সৃষ্টি করে। ভিতরেরটি অ্যামনিয়ন। অ্যামনিয়নের মধ্যেকার অ্যামনিওটিক তরলে নিমজ্জিত থাকায় ভ্রূণ বাইরের আঘাত ও শুষ্কতা থেকে রক্ষা পায়।

অ্যামনিওনের বাইরের আবরণটি সেরোসা কোষসজ্জায় অ্যামনিওন ও সেরোসা বিপরীত। অ্যামনিয়ন ও সেরোসার মধ্যের গহবরকে বহিঃভ্রূণস্থ দেহগহবর বলে। এটি ভ্রূণস্থ দেহগহবরের সঙ্গে যুক্ত।

ইনকিউবেশনের তৃতীয় দিনে পৌষ্টিকনালীর উপবৃধিরূপে অ্যালনটয়েস দেখা দেয়। ক্রমশঃ সপ্ল্যাংকনোপ্লুরার বিস্তৃতিতে এটি বৃধিপ্রাপ্ত হয় ও বহিঃভ্রূণস্থ দেহগহবরের মধ্যে প্রসারিত হয়। অ্যালানটয়েস ভ্রূণের শ্বসনঅঙ্গ হিসাবে কাজ করে। আবার প্রথমে ইউরিয়া ও পরে ইউরিক অ্যাসিড জমা রেখে ভ্রূণের মূত্রাশয় হিসাবেও কাজ করে। অ্যালবুমিন শোষণেও এর ভূমিকা আছে।

পাখীর ভ্রূণ খোলস ত্যাগের সময় এই চারটি ভ্রূণ বহিঃস্থ ঝিল্লীও পরিত্যক্ত হয়। প্লাসেন্টা বা অমরা শব্দটির অর্থ 'চ্যাপ্টা কেক'। মনোট্রিমাটা ব্যাতিরেকে এটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অমরা একটি অস্থায়ী গঠন যা কেবল ভ্রূণ মাতৃজরায়ুতে থাকাকালীন ভ্রূণকলা ও মাতৃকলার সংযোগে তৈরী হয়। এর মাধ্যমে ভ্রূণ মাতার দেহ থেকে পুষ্টি, অক্সিজেন ইত্যাদি গ্রহণ করে এবং ভ্রূণের বৃধি হয়। অপরদিকে এর মাধ্যমে ভ্রূণের দেহ থেকে অপচিতিমূলক বর্জ্য পদার্থ যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন বিপাকীয় বর্জ্য মাতার দেহে পরিবাহিত হয়। এই অমরার মাধ্যমে ভ্রূণ জরায়ুর গাত্র সংলগ্ন হয়ে সুরক্ষিত অবস্থায় বৃধিপ্রাপ্ত হয়।

উৎপত্তি অনুযায়ী অমরা দুই প্রকার— (i) কুসুমথলি অমরা, (ii) অ্যালানটয়িক অমরা।

অমরা গঠনের প্রকারভেদ এবং ভ্রূণ ও মাতার ঘনিষ্ঠতার গভীরতার ভিত্তিতে অমরা পাঁচ প্রকার। যথা— (1) এপিথিলিওকোরিয়াল, (2) সিনডেসমোকোরিয়াল, (3) এন্ডোথিলিওকোরিয়াল, (4) হিমোকোরিয়াল, (5) হিমোএন্ডোথিলিয়াল।

ভ্রূণ ও মাতার বন্ধনের ভিত্তিতে অর্থাৎ সন্তান প্রসবের সময় মাতার জরায়ুর ক্ষতির পরিমাণের ভিত্তিতে অমরা তিন প্রকার— (i) নন-ডেসডুয়াস, (ii) ডেসিডুয়াস, (iii) কনট্রামি-ডেসিডুয়াস।

ভিলাই-এর সজ্জাবিন্যাস অনুযায়ী অমরা কয়েকপ্রকার (1) পরিব্যাপ্ত, (2) গুচ্ছাকার, (3) আঞ্চলিক, (4) চাকতি, (5) দ্বি-চাকতি।

খরগোসের অমরা অত্যন্ত উন্নত প্রকৃতির। ভ্রূণ ও মাতার মধ্যে দ্রুত ও সুদৃঢ় সংযোগস্থাপনের জন্য ভ্রূণের ট্রফোব্লাস্ট বৃধিপ্রাপ্ত হয়ে জরায়ুর এপিথিলিয়াম, যোগকলা ও রক্তবাহের এন্ডোথিলিয়াল প্রাচীর ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং

রক্তময় ল্যাকুনার সৃষ্টি হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ভ্রূণের এন্ডোথিলিয়াম মাতা ও ভ্রূণের রক্তপ্রবাহ পৃথক রাখে। প্রসবের সময় মাতৃজরায়ুর অভ্যন্তরে কোনও রক্তক্ষরণ হয় না বা জরায়ু কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় না।

1.4.14 প্রশ্নাবলী

1. দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1. ভ্রূণ বহিঃস্থ ঝিল্লী কয়প্রকার? মুরগীর ভ্রূণ বহিঃস্থ ঝিল্লিগুলির বিন্যাস ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।
2. মুরগীর ভ্রূণে অ্যামনিওন ও অ্যালানটয়েসের উৎপত্তি ও কাজ বর্ণনা করুন।
3. কুসুমের পরিমাণ অনুযায়ী ক্লিভেজের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন ঃ

1. ভ্রূণ বহিঃস্থ ঝিল্লী বলতে কি বোঝ? এদের সঙ্গে ভ্রূণস্থ ঝিল্লীর পার্থক্য কী?
2. মুরগীতে অ্যামনিওন ও কোরিয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করুন।
3. কুসুমথলির উৎপত্তি ও কাজ সম্বন্ধে লিখুন।

3. তুলনা করুন ঃ

1. কুসুমথলি অমরা ও অ্যালানটোয়িক অমরা
2. নন্‌ডেসিডুয়াল অমরা ও ডেসিডুয়াল অমরা
3. সাইটোট্রফোব্লাস্ট ও সিনট্রফোব্লাস্ট
4. ডেসিডুয়া বেসালিস ও ডেসিডুয়া পেরাইটালিস
5. হিমোকোরিয়াল ও হিমোএন্ডোকোরিয়াল অমরা

4. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

1. কোরিয়ন ফ্রন্ডোসাম কাকে বলে? এর কাজ কি?
2. ট্রফোব্লাস্ট ভিলাই এর প্রকারভেদ ও কাজ।
3. অমরা বিন্যাস কয় প্রকার?
4. অমরা গঠনে অংশগ্রহণকারী ভ্রূণকলা ও মাতৃকলা
5. অমরার কাজ
6. ট্রপোস্পঞ্জিয়া কি?

5. দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1. অমরা কি? খরগোসের অমরা বর্ণনা করুন ও সংক্ষেপে অমরার কার্যাবলী লিখুন।
2. ভিলাই এর বিন্যাস অনুযায়ী অমরা কয়প্রকার? চিত্র ও উদাহরণ সহযোগে লিখুন।

6. শূন্যস্থান পূরণ করন ঃ

1. _____ প্রাণীতে অমরা থাকে না।
2. মারসুপিয়াল প্রাণীতে _____ অমরা দেখা দেয়।
3. অমরা মাতার _____ ও ভ্রূণের _____ সংযোগে গঠিত একটি _____ গঠন।
4. খরগোসের সন্তানপ্রসবের সময় মাতৃজরায়ুর অন্তঃস্তরের কোনও _____ হয় না।
5. অমরা নিঃসৃত _____ ও _____ হরমোন ভ্রূণের ক্রমবর্দ্ধনে সহায়তা করে।

1.4.15 উত্তরমালা

1. 1. 1.4.2
2. 1.4.4 ; 1.4.5

2. 1. 1.4.2
2. 1.4.4
3. 1.4.3

3. 1. 1.4.9.1
2. 1.4.9.1
3. 1.4.10
4. 1.4.10
5. 1.4.9.3

4. 1. ভিলাইযুক্ত এলাকা
2. 1.4.10
3. 1.4.9.3
4. 1.4.9.2
5. 1.4.12
6. ট্রপোস্পঞ্জিয়া— টারশিয়ারী ভিলাই তৈরীর সময় জরায়ুর কোষকলার রূপান্তর।

5. 1. 1.4.0, 1.4.10, 1.4.12
2. 1.4.9.1

6. 1. মনোট্রিমাটা
2. ইয়কথলি প্লাসেন্টা
3. ডেসিডুয়া, ট্রফোব্লাস্ট, ক্ষণস্থায়ী
4. ক্ষয়
5. ইস্ট্রোজেন, প্রোজেসটেরন।

একক 2 ❑ কোষ-জীন বিজ্ঞান ও অনুকোষ

একক 2.1 ❑ প্লাজমা পর্দা (Plasma membrane)

গঠন

2.1.1 প্রস্তাবনা

2.1.2 প্লাজমা মেমব্রেনের গঠন

2.1.3 প্লাজমা মেমব্রেনের কাজ

2.1.4 মেমব্রেনের মধ্য দিয়ে চলাচল বা পরিবহণ

2.1.5 সারাংশ

2.1.6 প্রশ্নাবলী

2.1.1 প্রস্তাবনা

কোষপর্দা বা প্লাজমাপর্দা কোষের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সকল উন্নত উদ্ভিদ এবং প্রাণীকোষের প্রোটোপ্লাজমকে ঘিরে এই সজীব, সক্রিয়, স্থিতিস্থাপক পর্দাটি উপস্থিত থাকে। 1831 খ্রিস্টাব্দে প্লয়ে (Plawe) নামক এক কোষ বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম প্লাজমালেমা শব্দটি ব্যবহার করেন। 1855 খ্রিস্টাব্দে ন্যাগেলি ও ক্র্যামার (Negeli and Cramar) এই কোষপর্দার নামকরণ করেন প্লাজমালেমা বা প্লাজমাপর্দা। প্রাণীকোষে প্লাজমাপর্দা কখনও কখনও আঙ্গুলের মত উপবৃধ্বির সৃষ্টি করে, এদের মাইক্রোভিলি (microvilli) বলে। যকৃৎ কোষ, জরায়ুকোষ, খাদ্যনালীর গাত্রকোষ, পিত্তাশয়ের আবরণী কোষ ইত্যাদিতে মাইক্রোভিলি থাকে।

2.1.2 প্লাজমা পর্দার গঠন

সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্লাজমাপর্দাকে প্রোটোপ্লাজম থেকে আলাদা করা যায় না। সম্প্রতি ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্লাজমাপর্দার আলট্রা গঠন (ultra structure) সম্পর্কে নানা তথ্য উদঘাটন করা সম্ভব হয়েছে। 1895 খ্রিস্টাব্দে ওভারটন (Overton, 1895) সর্বপ্রথম প্লাজমাপর্দার গঠন দেখেন এবং লাইপয়ডাল মতবাদ (Lipoidal theory) প্রবর্তন করেন। এই মতবাদ অনুযায়ী প্লাজমা পর্দায় একটানা লিপিড স্তর থাকে। 1933 খ্রিস্টাব্দে কোল্লান্ডার ও বারলান্ড (Collander and Barlund) বলেন যে, প্লাজমাপর্দা লিপিড দিয়ে তৈরী তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু এর মধ্যে অসংখ্য ছিদ্রও থাকে। গোর্টনার ও গ্রেন্ডেল (Gortner and Grendell, 1925) এর মতে প্লাজমাপর্দা লিপিড দ্বিস্তর পাত দিয়ে তৈরী। কোল (Cole, 1932) এবং হার্ভে ও সার্পিরো (Harvey and Sharpiro)-র মতে প্লাজমা পর্দায় লিপিড ছাড়াও অন্য কোন বস্তু থাকে। ড্যানিয়েলি ও হার্ভের (Danielli and Harvey) মতে প্লাজমা পর্দার লিপিড ছাড়াও যে বস্তুটি থাকে, সেটি হল প্রোটিন। 1952 খ্রিস্টাব্দে ড্যানিয়েলি ও ড্যাভসন (Danielli and Davson) প্লাজমাপর্দার গঠনে ত্রি-স্তর বিশিষ্ট কাঠামোর কথা বলেন। ড্যানিয়েলি ও হার্ভের মতে প্লাজমাপর্দার দুই অণু লিপিডের দুইদিকে দুটি স্তরে প্রোটিন অণু থাকে। ইলেকট্রন

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে মোটামুটিভাবে প্লাজমাপর্দার এই প্রোটিন-লিপিড-প্রোটিন গঠন প্রমাণিত হয়। 1959 খ্রিস্টাব্দে রবার্টসন (Robertson) প্লাজমাপর্দার এইরূপ গঠন বহুস্থানে দেখেন এবং ''একক ঝিল্লি'' বা পর্দা (Unit membrane) মতবাদ প্রচার করেন। এই এক ঝিল্লির গঠন সর্বদাই 'প্রোটিন-লিপিড-প্রোটিন' এই ত্রিস্তর বিশিষ্ট হয়। দুটি ঘন প্রোটিন স্তরের মাঝে একটি লিপিড স্তর থাকে। এই একক ঝিল্লি গঠন যে শুধুমাত্র প্লাজমা পর্দায় দেখা যায় তাই নয়; কোষের সকল অঙ্গাণুতেও, যেমন এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম, গলগি বস্তু, লাইসোজোম, প্লাসটিড ইত্যাদিতে একক ঝিল্লি গঠন দেখা যায়। মাইটোকনড্রিয়ার বাইরের এবং ভেতরের পর্দা এবং নিউক্লিয়াসের ঝিল্লি গঠনেও এই একক ঝিল্লি গঠন দেখা যায়। অধিকাংশ কোষের প্লাজমাপর্দাই 100 – 215 Å পুরু হয়।

কোষপর্দার বেশীর ভাগ গবেষণাই স্তন্যপায়ী প্রাণীর লোহিত রক্ত কণিকা (RBC), স্নায়ুতন্তুর মায়েলিন আচ্ছাদন এবং অক্ষিপটের রড ও কোণ (rod and cone) কোষের উপর সীমাবদ্ধ। কোষপর্দার মধ্য দিয়ে অতি সহজে লিপিড দ্রাবক প্রবেশ করতে পারে। অপরপক্ষে জলের মত পোলার অণু বাধাপ্রাপ্ত হয়।

2.1.2.1 ড্যানিয়েলি ও ড্যাভসনের মতবাদ

এই মত অনুসারে প্লাজমাপর্দা তিনটি স্তর নিয়ে গঠিত (চিত্র 1.1)। দুইদিকে দুটি ঘন প্রোটিন স্তর এবং মাঝে হালকা লিপিড স্তরটি 'স্যাণ্ডুইচ' অবস্থায় থাকে। তিনটি স্তরের মোট বেধ প্রায় 100Å।

চিত্র 1.1 ঃ ড্যানিয়েলি ও ড্যাভসনের মতে কোষঝিল্লির প্রতিরূপ

2.1.2.2 রবার্টসনের একক ঝিল্লি মতবাদ

এই মতবাদের প্রবক্তা জে. ডি. রবার্টসন (J. D. Robertson, 1959)। সেই কারণে এই প্রতিরূপটিকে রবার্টসনের মডেল বলা হয়। এই মডেল অনুযায়ী, কোষঝিল্লির দুই দিকে দুটি ঘনস্তর এবং এদের মাঝখানে একটি হালকা স্তর থাকে। প্রত্যেকটি ঘন স্তর 20Å পুরু এবং মাঝের হালকা স্তরটি 35Å পুরু; এইরূপে একটি একক বেধ (Unit thickness) তৈরী হয়, যা 75Å (20 + 35 + 20 = 75Å) পুরু। রবার্টসনের মতে, বিভিন্ন প্রকার কোষে যত প্রকার ঝিল্লি আছে তাদের সকলেরই মৌলিক গঠন এই ত্রিস্তরবিশিষ্ট একক ঝিল্লি (চিত্র 1.2)। মাঝের হালকা স্তরটিতে লিপিড অণুগুলি এক অণুবিশিষ্ট দুটি সারিতে সজ্জিত থাকে। লিপিড অণুর জলাসক্ত ধ্রুবক প্রান্তগুলি (hydrophilic polar ends) প্রোটিনের সঙ্গে সংযোজিত এবং জলবিদ্বেষী অধ্রুবকীয় প্রান্তগুলি (hydrophobic nonpolar ends) পরস্পর সংলগ্ন থাকে। লিপিড স্তর দুটি আন্তরানবিক আকর্ষণ বল (van-der-

waals force)-এর সাহায্যে পরস্পর অধ্রুবকীয় প্রান্তে যুক্ত থাকে এবং এদের ধ্রুবকীয় প্রান্তগুলি প্রোটিন স্তরের সাথে হাইড্রোজেন বন্ধনী (hydrogen bond) বা আয়ন যোজ্যতার (ionic linkage) দ্বারা সংযোজিত থাকে। ফলে, অণুগুলি স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে না। এই মতানুসারে লিপিড স্তরই ঝিল্লি কাঠামোর প্রধান অংশ।

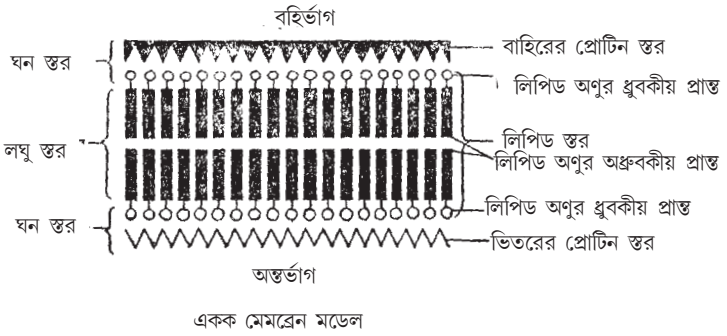

চিত্র 1.2 ঃ রবার্টসনের 'একক ঝিল্লি' প্রতিরূপ

প্লাজমাপর্দার বাইরের দিকের প্রোটিন স্তরটি ভিতরের দিকের প্রোটিন স্তর অপেক্ষা একটু ভিন্ন ধরনের হয়। বাইরের প্রোটিন স্তরে কিছু পরিমাণ পলিস্যাকারাইড থাকে, কিন্তু ভিতরের স্তরে থাকে না। ঘন স্তরে প্রোটিন অণুগুলি সম্পূর্ণ বিস্তৃত অবস্থায় থাকে। গোলাকার প্রোটিন অণু সাধারণত থাকে না। তবে অনেক সময় গোলাকার প্রোটিন অণু মৌলিক গঠনের সঙ্গে গৌণভাবে সংযোজিত হতে পারে।

ড্যানিয়েলি ও ড্যাভসনের মডেলের সঙ্গে একক ঝিল্লি মতবাদের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

(1) পূর্বতন মতবাদে কটি অণু লিপিড স্তর থাকে তা বলা হয় নি, কিন্তু একক ঝিল্লি মতবাদ অনুসারে দুটি অণু লিপিড স্তর থাকে।

(2) পূর্বতন মতানুসারে একটানা সমান ঝিল্লির কথা বলা হয়েছে কিন্তু একক ঝিল্লি মতবাদ অনুসারে এটি অসম দুটি প্রোটিন স্তর নিয়ে গঠিত।

(3) পূর্বতন মতবাদে প্রোটিন স্তরে শুধুমাত্র গ্লোবিউলার প্রোটিন থাকে, কিন্তু একক ঝিল্লি মতবাদ অনুসারে প্রোটিন স্তরটিতে, সম্পূর্ণ বিস্তৃত ফাইব্রাস প্রোটিন থাকে।

2.1.2.3 ফ্লুয়িড মোজেইক মডেল (The fluid mosaic model)

1972 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী সিঙ্গার এবং নিকলসন (Singer and Nicolson) প্রথম, কোষপর্দার ফ্লুয়িড মোজেইক মডেল সম্পর্কে তাঁদের মতবাদ প্রকাশ করেন। তাঁদের মতে ফসফোলিপিডের দুটি স্তরের মধ্যে প্রোটিন অণুগুলি ভেসে থাকে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রোটিন অণুগুলি একটি মোজেইক গঠন করে। ফসফোলিপিডের স্তর দুটি হল ফ্লুয়িড বা তরল। এর ফলেই প্রোটিন অণুগুলি একটি ফ্লুয়িড মোজেইক রূপ গঠন করে।

এই মতানুসারে প্লাজমা পর্দার গঠন নিম্নরূপ ঃ

- প্লাজমাপর্দাটি 7 mm চওড়া হয়।
- মূল গঠনটি হল ফসফোলিপিডের দুটি স্তর।
- ফসফোলিপিডের জলাসক্ত ফসফেট প্রান্তগুলি বাইরের দিকে সজ্জিত থাকে।
- জলবিদ্বেষী হাইড্রোকার্বনের প্রান্তগুলি ভেতরের দিকে পরস্পর সংলগ্ন থাকে।

- ফসফোলিপিড হল তরল এবং তারা নিজেদের স্তরের মধ্যেই ঘুরে বেড়ায়।
- বেশিরভাগ প্রোটিন অণুগুলিই দ্বিস্তর ফসফোলিপিডের মধ্যে ভেসে থাকে এবং ফ্লুয়িড মোজেইক রূপ গঠন করে।
- প্রোটিনগুলি পর্দার মধ্যেই থাকে, কারণ তাদের জলবিদ্বেষী অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি ফসফোলিপিডের জলবিদ্বেষী অধ্রুবকীয় প্রান্তগুলির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। বাকী প্রোটিনগুলি হল জলাসক্ত এবং তারা হয় কোষের দিকে মুখ করে থাকে অথবা বাইরের পরিবেশের দিকে মুখ করে থাকে।
- কিছু প্রোটিন, আংশিকভাবে এবং কিছু প্রোটিন পুরোপুরি ভাবে প্লাজমাপর্দা ভেদ করে অবস্থান করে।
- কিছু প্রোটিন এবং লিপিডের কার্বহাইড্রেটের চেইন শাখাপ্রশাখার মত বিস্তৃত থাকে। এগুলি গ্লাইকোপ্রোটিন এবং গ্লাইকোলিপিড তৈরী করে।
- পর্দায় কোলেস্টেরলও উপস্থিত থাকে এবং এর উপস্থিতি পর্দাটিকে আরও মজবুত বা সুস্থিত করে তোলে। কোলোস্টেরলের অণুপস্থিতিতে প্লাজমা পর্দা ভেঙ্গে যায়।
- প্লাজমাপর্দার দুটি স্তরের অংশ, গঠনে এবং কার্যে ভিন্ন হয়।
- যে প্রোটিনগুলি পুরোপুরিভাবে প্লাজমাপর্দা ভেদ করে অবস্থান করে, তাদের ইন্টিগ্রাল (integral) প্রোটিন বলে। কিছু প্রোটিন ইন্টিগ্রাল প্রোটিনের সঙ্গে বাইরের দিকে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অথবা হাইড্রোজেন বন্ধনীর দ্বারা যুক্ত থাকে, এদের পেরিফেরাল (peripheral) প্রোটিন বলা হয়। আবার কিছু প্রোটিন আছে যেগুলো প্লাজমা পর্দার লিপিডের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এদের বলে লিপিড যুক্ত প্রোটিন।

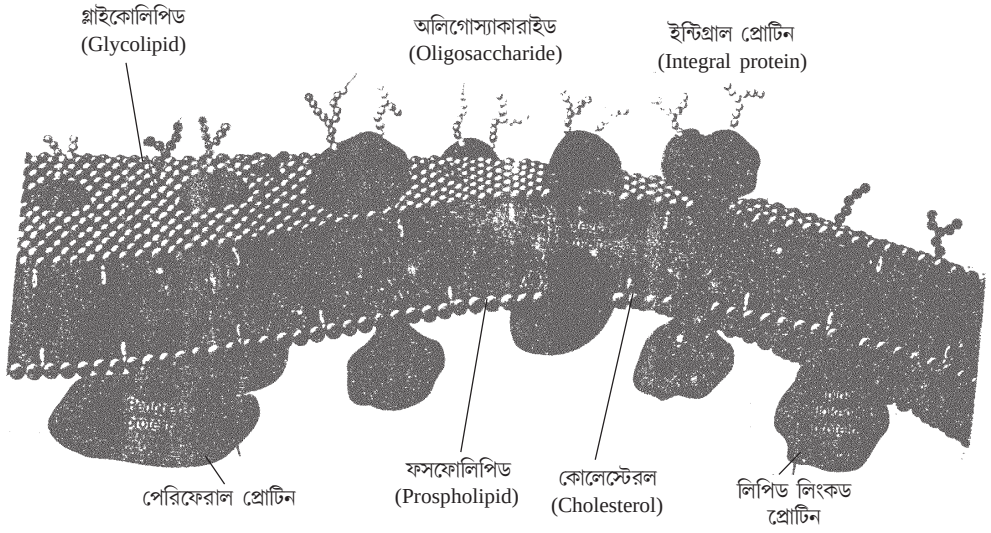

চিত্র 1.3 ঃ প্লাজমা মেমব্রেনের গঠন

পরবর্তীকালে ফ্রীজ ফ্র্যাকচ্যার ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি (Freez fracture electron microscopy), এই পদ্ধতির দ্বারাও উপরোক্ত প্লাজমা পর্দার গঠনের সত্যতা প্রমাণিত হয়। এই পদ্ধতিতে, প্রথমে প্লাজমাপর্দাটিকে তরল নাইট্রোজেনে – 196^0C-এ ঠাণ্ডায় জমানো হয় এবং এটিকে এমনভাবে ভাগ করা হয় যাতে ফসফোলিপিডের দুটি স্তর পরস্পর পরস্পরের থেকে পৃথক হয়ে যায়। ইন্টিগ্রাল এবং পেরিফেরাল প্রোটিনের অবস্থানও এই পদ্ধতির দ্বারা পুরোপুরি বোধগম্য হয় এবং এটাই ফ্লুয়িড মোজেইক মডেলের সত্যতা প্রমাণিত করে।

ফসফোলিপিড দ্বিস্তরের মধ্যে প্রোটিনের চলাচল বিজ্ঞানী এডিডিন (Edidin) তাঁর পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত করেন। তিনি প্রথমে ইঁদুর এবং মানুষের কোষ কালচার করেন। পরে ঐ কালচার থেকে ইঁদুর ও মানুষের কোষ নিয়ে কোষপর্দার প্রোটিনকে তিনি যথাক্রমে সবুজ এবং লাল ফ্লুরোসেন্ট মার্কার (fluorescent marker) দ্বারা চিহ্নিত করেন। সেন্ডাই ভাইরাস (Sendai virus) দ্বারা তিনি পরে ঐ দুই প্রকার কোষকে সংযুক্ত করেন এবং একটি শংকর (hybrid) কোষ তৈরী করেন। এই ধরনের কোষকে **হেটোরোক্যারিওন** (heterokaryon) বলা হয় (চিত্র 1.3)। সংযুক্তির ঠিক পরেই ইঁদুর এবং মানুষের প্রোটিনগুলি পৃথক পৃথক থাকে। কিন্তু 40 মিনিট পরে 37^0C-এ লাল এবং সবুজ মার্কারগুলি পুরোপুরিভাবে মিশে যায়। এর থেকেই বোঝা যায় প্রোটিন অণুগুলি ফসফোলিপিড দ্বিস্তরে সর্বদা চলাচল করে।

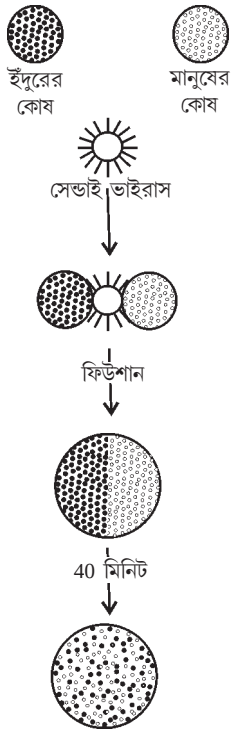

চিত্র 1.4 ঃ এডিডিনের পরীক্ষা

প্রোটিন অণুগুলি যে হারে ফসফোলিপিড পর্দায় চলাচল করে সেটি ফ্লুরোসেন্স ফটোব্লিচিং রিকভারি পদ্ধতির দ্বারা নির্ধারণ করা সম্ভব। একটি কৃত্রিম মেমব্রেন তৈরী করে তাতে একটি ফ্লুরোফোর (fluorophore) যুক্ত করে দেওয়া হয়। ফ্লুরোফোর ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলটিকে রঙীন করে দেয়। পরে লেসার পালস (laser pulse) দিয়ে একটি ছোট নির্দিষ্ট স্থানের ফ্লুরোফোরগুলিকে নষ্ট করে দেওয়া হয়। যে হারে ঐ বর্ণহীন স্থানটি পুনরায় রঙীন হয়ে যায়, সেটাই প্রমাণ করে যে মেমব্রেনের মধ্যে প্রোটিনগুলি সর্বদা একটি নির্দিষ্ট হারে চলাচল করে। ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে আমরা সেটা দেখতে পাই। এই পদ্ধতির সাহায্যে দেখা গেছে যে 30% থেকে 90% প্রোটিন স্বাধীনভাবে প্লাজমাপর্দার মধ্যে চলাচল করতে পারে।

2.1.3 প্লাজমা পর্দার কাজ (Function of plasma membrane)

(1) পৃথকীকরণ (Compartmentalization) ঃ

প্লাজমা মেমব্রেন সাধারণভাবে কোষমধ্যস্থ বস্তুসমূহ রক্ষা করে। এটি কোষের অভ্যন্তরস্থ কোষ-অঙ্গাণুগুলিকে সন্নিহিত কোষ থেকে পৃথক করে রাখে। বিভিন্ন কোষ অঙ্গাণুগুলিও নিজস্ব মেমব্রেনের দ্বারা অন্য অঙ্গাণু থেকে পৃথক থাকে, যেখানে বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যসমূহ ঘটে থাকে। যেমন কোষের মধ্যে অক্সিডেশন, ডিহাইড্রেশন, অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন এবং ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন ইত্যাদি মাইটোকনড্রিয়ায় ঘটে থাকে। আবার প্রোটিন সংশ্লেষে রাইবোজোম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি এই সকল অঙ্গাণুগুলি নিজস্ব মেমব্রেনের দ্বারা পরস্পরের থেকে পৃথক না থাকত তাহলে উপরোক্ত বিভিন্ন কার্যের উৎসেচক এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বস্তু একসঙ্গে মিশে যেত এবং কোন কার্যই ঠিকমত সম্পন্ন হোত না।

(2) প্লাজমা মেমব্রেন — নির্বাচিত ভেদ্য প্রতিবন্ধক (Selectively permeable barrier) ঃ

প্লাজমা মেমব্রেন বিভিন্ন দ্রব্যের কোষের মধ্যে আসা অথবা কোষ থেকে বাইরে যাওয়াকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। স্বাধীনভাবে যে কোন বস্তু কোষের মধ্যে প্রবেশ করতে অথবা কোষ থেকে বাইরে যেতে পারে না। নির্দিষ্ট

কিছু বস্তুকেই প্লাজমা মেমব্রেন বাইরের পরিবেশ থেকে সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করতে দেয়। এইভাবে প্লাজমা পর্দা নির্বাচিত ভেদ্য প্রতিবন্ধক (selectively permeable barrier) হিসেবে কাজ করে।

(3) প্লাজমা মেমব্রেনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বস্তুর চলাচল ঃ

বিভিন্ন প্রকার ভৌত-রাসায়নিক পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন দ্রব্য কোষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলাচল করে। পর্দার দু-পাশের ঘনত্বের ক্রমমাত্রার উপরেও এটি নির্ভর করে। মেমব্রেনের দু-পাশে দ্রাবের আণবিক ঘনত্ব যদি ভিন্ন হয়, তাহলে অণুগুলি উচ্চ ঘনত্বের দিক থেকে নিম্ন ঘনত্বের দিকে বেশী পরিমাণে বাহিত হয়।

(4) বাইরের সংকেতে সাড়া দেওয়া (Responding to external signals) ঃ

বাইরের কোন উদ্দীপনায় (stimulus) সাড়া দেওয়া কোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং সেটি প্লাজমা মেমব্রেনের দ্বারাই সম্ভবপর হয়। প্লাজমা পর্দায় কিছু রিসেপটর থাকে যেগুলি বিভিন্ন লাইগ্যান্ড (ligand) অণুর সঙ্গে যুক্ত হয় (যেটি উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে) এবং এর ফলে বাইরের পরিবেশের সিগন্যাল বা বিশেষ কোনও সংকেত কোষের ভেতরে প্রবেশ করে। পরে ঐ সংকেত অন্য কোনও নতুন সংকেত বা সিগন্যাল সৃষ্টি করে। এই পুরো ঘটনাটিকে সংকেত পরিবহণ বা সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন (Signal transduction) বলা হয়।

(5) বিভিন্ন কোষের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা (Intercellular interaction) ঃ

বহুকোষী প্রাণীতে প্লাজমাপর্দা একটি কোষের সঙ্গে অন্য কোষের সংযোগ রক্ষা করে। পর্দার সাহায্যেই কোষগুলি একে অপরের সঙ্গে দৃঢ় ভাবে সংযুক্ত থাকে এবং প্রয়োজনমত বিভিন্ন দ্রব্য বিনিময় করে।

(6) শক্তির পরিবহণ (Energy transduction) ঃ

প্লাজমাপর্দার সাহায্যেই শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হয়। একেই শক্তির পরিবহণ বলে। এটি সব থেকে ভালভাবে বোঝা যায় সালোকসংশ্লেষের সময়। কারণ সালোকসংশ্লেষেই সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত হয়। পর্দায় আবদ্ধ নির্দিষ্ট কিছু রঞ্জক (pigment) আবদ্ধ থাকে যারা এই কার্যে সাহায্য করে।

উপরোক্ত এই কাজগুলি ছাড়াও পেশী সংকোচন, অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডির সংযোজন, নার্ভ কনডাকশন ইত্যাদি কাজগুলিও মেমব্রেনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

2.1.4 কোষ পর্দার মধ্য দিয়ে চলাচল বা পরিবহণ (Transport across membranes)

কোষপর্দার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধরনের বস্তু চলাচল করে। মেমব্রেনের মধ্য দিয়েই কোষ যেমন পুষ্টিগত বস্তুসমূহ গ্রহণ করে তেমনভাবেই বর্জ্যপদার্থ ত্যাগ করে। এর মধ্য দিয়েই জল, উৎসেচকসমূহ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, সুগার, প্রোটিন প্রভৃতি চলাচল করে। এই সমস্ত কিছুই ঘটে থাকে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে।

মেমব্রেনের মধ্য দিয়ে পরিবহণ দুই প্রকার হতে পারে। (1) **মিডিয়েটেড** (mediated) এবং (2) **নন মিডিয়েটেড** (non mediated)। ননমিডিয়েটেড পরিবহণ সাধারণ ব্যাপনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। অপরপক্ষে মিডিয়েটেড পরিবহণ নির্দিষ্ট কিছু বহনকারী প্রোটিনের (carrier protein) সাহায্যে হয়ে থাকে।

মিডিয়েটেড পরিবহণ আবার থার্মোডাইনামিক্সের উপর নির্ভর করে দুই প্রকার হতে পারে ঃ

(1) **প্যাসিভ বা নিষ্ক্রিয় মিডিয়েটেড পরিবহণ ঃ** নিষ্ক্রিয় পরিবহণে নির্দিষ্ট কিছু অণু বেশী ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বের দিকে পরিবাহিত হয়।

(2) **অ্যাক্টিভ বা সক্রিয় পরিবহণ ঃ** সক্রিয় পরিবহণে নির্দিষ্ট অণুগুলি কম ঘনত্বের দিক থেকে বেশী ঘনত্বের দিকে পরিবাহিত হয়। যেহেতু এই ঘটনাটি ঘনত্বের বিপরীতে হয়, সেইজন্য এতে শক্তির প্রয়োজন হয়।

● **মিডিয়েটেড পরিবহণের পদ্ধতিসমূহ ঃ**

যে সকল বস্তু তাদের আয়তন বড় হওয়ার জন্য ফসফোলিপিড দ্বিস্তরের মধ্য দিয়ে সহজে যাতায়াত করতে পারে না, তাদেরকে কিছু বহনকারী অণুর সাহায্য নিতে হয়। এদেরকে বহনকারী, পারমিয়েজ, পোর্টার অথবা ট্রান্সপোর্টারও বলা হয়ে থাকে।

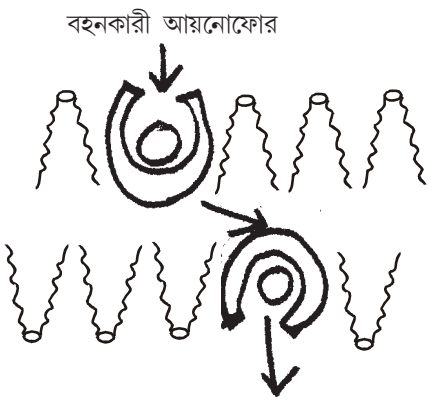

চিত্র 1.5 ঃ বহনকারী আয়নোফোর

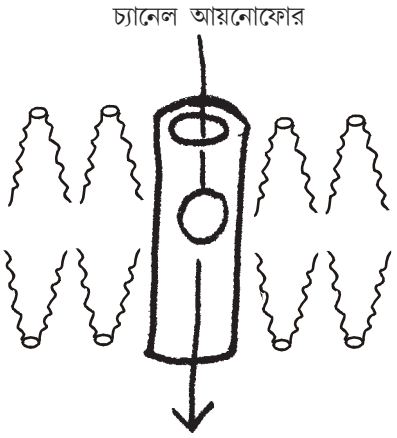

চিত্র 1.6 ঃ চ্যানেল আয়নোফোর

এক ধরনের বহনকারী অণু হল আয়নোফোর (ionophore)। এটি একটি জৈব অণু। বহনকারী আয়নোফোর প্রথমে একটি নির্দিষ্ট আয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়, সেটিকে মেমব্রেনের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত করে এবং পরে আয়নটিকে মেমব্রেনের অন্য প্রান্তে যুক্ত করে।

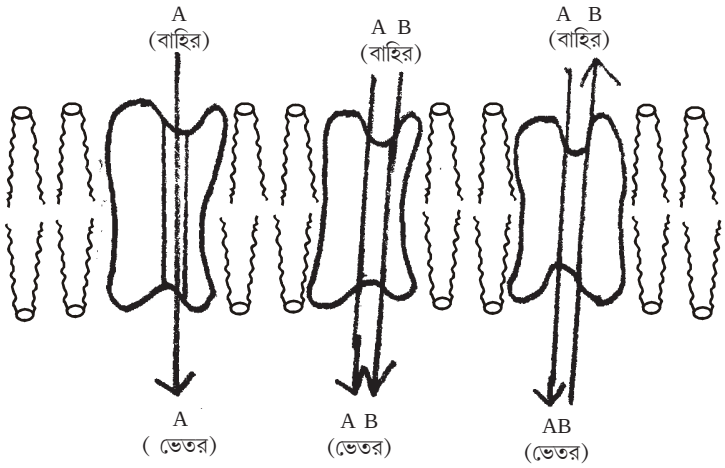

চিত্র 1.7 ঃ ইউনিপোর্ট, সিমপোর্ট ও অ্যান্টিপোর্ট পদ্ধতিতে পরিবহণ

দ্বিতীয় ধরনের আয়নোফোর হল চ্যানেল আয়নোফোর, এটি মেমব্রেনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একটি প্রণালী বা ছিদ্র তৈরী করে এবং তার মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট আয়নগুলি সহজেই চলাচল করতে পারে।

যখন পর্দার মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি মাত্র অণু চলাচল করে, তাকে ইউনিপোর্ট (uniport) বলে।

যখন মেমব্রেনের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ে দুটি ভিন্ন অণু একই দিকে পরিবাহিত হয়, তাকে সিমপোর্ট (symport) বলে।

যখন মেমব্রেনের মধ্য দিয়ে দুটি ভিন্ন অণু বিপরীত দিকে একই সঙ্গে পরিবাহিত হয়, তাকে অ্যান্টিপোর্ট (antiport) বলে।

● **ATP চালিত সক্রিয় পরিবহণ** (ATP-driven active transport) ঃ কিছু পদার্থ তাদের ঘনত্বের বিপরীতে পর্দার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পরিবাহিত হয়। এই পদ্ধতিতে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। ATP-র হাইড্রোলিসিস থেকেই এই প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপন্ন হয়। ATPase এই পুরো ঘটনাটিতে সাহায্য করে।

2.1.5 সারাংশ

সকল উন্নত উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষের প্রোটোপ্লাজমকে ঘিরে একটি সজীব, সক্রিয়, স্থিতিস্থাপক পর্দা থাকে; একে প্লাজমা মেমব্রেন বা প্লাজমালেমা বলে। প্লাজমা মেমব্রেনের গঠনে ত্রিস্তর কাঠামো থাকে। মধ্যবর্তী লিপিড স্তর এবং উহার দুপাশে প্রোটিন স্তর থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোষের প্লাজমাপর্দা 100 – 215Å পুরু হয়। দুটি লিপিড স্তর দুটি প্রোটিন স্তরের মাঝে স্যান্ডউইচ অবস্থায় থাকে। কোষের প্লাজমা মেমব্রেনের এই গঠনকে একক গঠন এবং রবার্টসনের নামানুসারে একে রবার্টসনের একক ঝিল্লি বলে। প্লাজমা মেমব্রেনের গঠন সম্পর্কে যে কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত আছে তাদের মধ্যে ড্যানিয়েলি ও ড্যাভসনের মতবাদ, রবার্টসনের মতবাদ, একক মতবাদ এবং লিপিডগ্লোবিউলার প্রোটিন মোজেইক মতবাদ, এবং সর্বোপরি ফ্লুয়িড মোজেইক মডেল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফ্লুয়িড মোজেইক মডেলই সর্বপ্রথম প্লাজমা মেমব্রেনের গঠন সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পোষণ করে। এই মডেলই প্রথম ইন্টিগ্রাল এবং পেরিফেরাল প্রোটিনের কথা বলে। পরবর্তীকালে ফ্রীজ ফ্র্যাকচার ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি পদ্ধতি ফ্লুয়িড মোজেইক মডেলের সত্যতা প্রমাণ করে। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী এডিডিন ফসফোলিপিড দ্বিস্তরের মধ্যে প্রোটিনের চলাচল তাঁর পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন।

প্লাজমা মেমব্রেন একটি নির্বাচিত ভেদ্য প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। প্লাজমা মেমব্রেনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দ্রাব্যবস্তু, আয়ন ইত্যাদি চলাচল করে। এছাড়াও প্লাজমা মেমব্রেন বাইরের সিগন্যালে সাড়া দেওয়া, পৃথকীকরণ, বিভিন্ন কোষের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা, শক্তির পরিবহণ ইত্যাদি সম্পন্ন করে।

মেমব্রেনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধরনের বস্তু চলাচল করে। এই পরিবহণ মিডিয়েটেড এবং ননমিডিয়েটেড এই দুই প্রকার হয়ে থাকে। মিডিয়েটেড পরিবহণ আবার প্যাসিভ এবং অ্যাক্টিভ এই দুই প্রকারের হয়। অণুর সংখ্যা, চলাচল এবং সময়ের উপর নির্ভর করে পরিবহণ আবার ইউনিপোর্ট, সিমপোর্ট এবং অ্যান্টিপোর্ট এই তিন ধরনের হতে পারে।

2.1.6 প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) প্লাজমা মেমব্রেন বলতে কি বোঝায়? সংক্ষেপে ফ্লুয়িড মোজেইক মডেলের গঠন বর্ণনা কর।

(২) ড্যানিয়েলি ড্যাভসনের মডেল এবং রবার্টসনের একক ঝিল্লি মতবাদ বলতে কি বোঝ? এই দুটি মতবাদের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলি কি কি?

(৩) ফ্রীজ ফ্র্যাকচার ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপির সাহায্যে কিভাবে ফ্লুয়িড মোজেইক মডেলের সত্যতা প্রমাণিত হয়? এডিডিনের পরীক্ষাটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
(৪) প্লাজমা মেমব্রেনের কার্য্যগুলির সংক্ষেপে বিবরণ দাও।
(৫) প্লাজমা মেমব্রেনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বস্তুর পরিবহনের প্রক্রিয়াসমূহের বিস্তারিত বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) কোষের শারীরবৃত্তীয় কাজগুলি কি কি?
(২) ড্যানিয়েলি ও ড্যাভসনের মতবাদটি কি?
(৩) রবার্টসনের একক ঝিল্লি মতবাদটি সংক্ষেপে লেখ।
(৪) ফ্লুয়িড মোজেইক মডেল বলতে কি বোঝ?
(৫) ফসফোলিপিডের মধ্য দিয়ে প্রোটিনের চলাচল একটি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর।
(৬) অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ পরিবহণ বলতে কি বোঝ?
(৭) মিডিয়েটিড পরিবহণের পদ্ধতিসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা কর।
(৮) প্লাজমা মেমব্রেন একটি নির্বাচিত ভেদ্য প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে— এর যৌক্তিকতা কতটা?

একক 2.2 ❑ মাইটোকনড্রিয়ার গঠন এবং কাজ

গঠন

2.2.1 প্রস্তাবনা

2.2.2 মাইটোকনড্রিয়ার আকৃতি

2.2.3 মাইটোকনড্রিয়ার আয়তন

2.2.4 মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যা

2.2.5 মাইটোকনড্রিয়ার গঠন

2.2.6 মাইটোকনড্রিয়ার উৎসেচক

2.2.7 মাইটোকনড্রিয়ার কাজ

2.2.8 সারাংশ

2.2.9 প্রশ্নাবলী

2.2.1 ভূমিকা

মাইটোকনড্রিয়া কোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু। প্রায় সমস্ত ইউক্যারিওটিক কোষেই মাইটোকনড্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়। কোষের সকল প্রকার জৈবনিক কার্য্য চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির একমাত্র উৎস হল মাইটোকনড্রিয়া। কারণ মাইটোকনড্রিয়াতেই ATP উৎপন্ন হয় এবং এই ATP-ই শক্তির সঞ্চার ঘটায়। এইজন্য মাইটোকনড্রিয়াকে **কোষের শক্তিঘর** বা পাওয়ার হাউস (Power house) বলা হয়।

1850 খ্রিস্টাব্দে কল্লিকার (Kolliker) সর্বপ্রথম পতঙ্গের পেশীতে মাইটোকনড্রিয়া লক্ষ্য করেন। বিজ্ঞানী অল্টম্যান (Altmann) 1890 খ্রিস্টাব্দে মাইটোকনড্রিয়াকে রঞ্জিত করেন এবং এর নাম দেন বায়োব্লাষ্ট (bioblast)। মাইটোকনড্রিয়াকে আগেকার দিনে কনড্রিওসোমও বলা হোত। 1898 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী বেন্ডা (Benda) প্রথম বায়োব্লাষ্টকেই মাইটোকনড্রিয়া নাম দেন। বিজ্ঞানী মিচিলিস (Michaelis) 1900 খ্রিস্টাব্দে জেনাস গ্রীন (Janus green) দিয়ে মাইটোকনড্রিয়াকে রঞ্জিত করেন। 1910 খ্রিস্টাব্দে ওয়ারবার্গ (Warburg) সেন্ট্রিফিউগেজন পদ্ধতির মাধ্যমে মাইটোকনড্রিয়াকে পৃথক করতে সক্ষম হন। 1914 খ্রিস্টাব্দে লিউইস ও লিউইস (Lewis and Lewis) কালচার করা কোষে প্রথম মাইটোকনড্রিয়া দেখেন। 1930 খ্রিস্টাব্দে বেনসলে এবং হোর (Bensley and Hoerr) যকৃৎ কোষ থেকে মাইটোকনড্রিয়া পৃথক করেন। 1948 খ্রিস্টাব্দে হোজবুম (Hogeboom) ও তাঁর সহকর্মীগণ প্রমাণ করেন যে মাইটোকনড্রিয়াই কোষীয় শ্বাসক্রিয়ার অঙ্গাণু (Site of cellular respiration)।

2.2.2 মাইটোকনড্রিয়ার আকৃতি

মাইটোকনড্রিয়ার আকৃতি বেশ পরিবর্তনশীল। মাইটোকনড্রিয়া দণ্ডাকার, সূত্রবৎ, দানাদার বা গোলাকার হতে পারে, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এরা দণ্ডাকার এবং দানাদার হয়।

2.2.3 মাইটোকনড্রিয়ার আয়তন

মাইটোকনড্রিয়া বিভিন্ন আয়তনের হয়ে থাকে। এদের ব্যাস 0·2 থেকে 1 μm এবং দৈর্ঘ্য 2 থেকে 10 μm পর্যন্ত হতে পারে।

2.2.4 মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যা

কোষে মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যা পরিবর্তনশীল। কোষের কাজের উপরে মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যা নির্ভর করে। স্বাভাবিক কোষে মাইটোকনড্রিয়ায় সংখ্যা সাধারণত 50 – 5000 পর্যন্ত থাকে। যকৃৎ কোষে মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যা 1000। শুক্রাণুতে আবার 20 – 24 টি মাইটোকনড্রিয়া থাকে। ক্যায়স ক্যায়স (Chaos chaos) নামক বৃহৎ অ্যামিবায় এই সংখ্যা 500,000।

2.2.5 মাইটোকনড্রিয়ার গঠন

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে মাইটোকনড্রিয়ার গঠন খুব সুন্দর ভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়। প্রতিটি মাইটোকনড্রিয়া দুটি পর্দা দ্বারা বেষ্টিত থাকে। বাইরের পর্দাটিকে বহিঃপর্দা এবং ভেতরের পর্দাটিকে অন্তঃপর্দা বলে। দুটি পর্দাই 60Å পুরু হয়। প্রতিটি পর্দাই প্রোটিন-লিপিড-প্রোটিন এই ত্রিস্তর নিয়ে গঠিত। বাইরের এবং

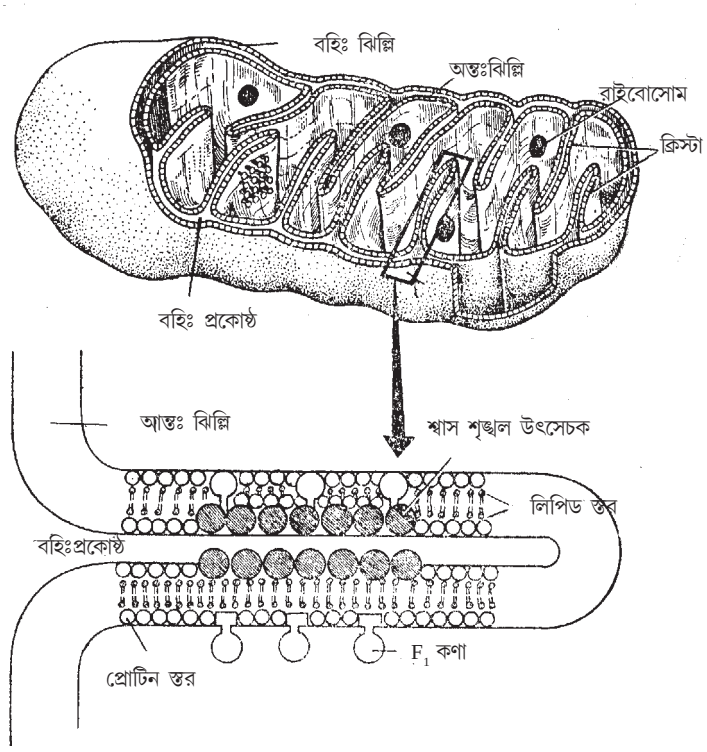

চিত্র 2.1 ঃ মাইটোকনড্রিয়ার ত্রৈমাত্রিক চিত্ররূপ; অংশবিশেষ কেটে তার অন্তর্গঠনের দৃশ্য।

NSOU

ভেতরের পর্দার মাঝখানে একটি ফাঁকা স্থান থাকে, একে আন্তপর্দা কক্ষ (intermembranal space) বলে। এই স্থানটি 80 – 100 Å পুরু হয়। ভিতরের পর্দা থেকে আঙুলের মত অনেকগুলি অন্তঃবৃধ্বি (infolding) মাইটোকনড্রিয়ার ভেতরের গহ্বরের দিকে প্রবেশ করে। এইগুলিকে বিজ্ঞানী পালাডে (Palade), ক্রিষ্টি (cristae) নামকরণ করেন। সুতরাং মাইটোকনড্রিয়াতে আমরা দুটি কক্ষ পাই— একটি কক্ষ হল বাইরের কক্ষ, যা দুটি পর্দার মাঝখানে অবস্থিত এবং অপর একটি হল ভিতরের কক্ষ, যা ভিতরের কক্ষ দ্বারা ঘেরা থাকে। ক্রিষ্টিগুলি এই ভেতরের কক্ষতেই থাকে।

বাইরের কক্ষটি অপেক্ষাকৃত সরু এবং এটি একপ্রকার তরল ধাত্র দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। অপরপক্ষে ভিতরের কক্ষটি বড় এবং একপ্রকার জেলির মত ঘন সমসত্ত্ব ধাত্র দ্বারা পূর্ণ থাকে। একে মাইটোকনড্রিয়ার ধাত্র বলা হয়।

মাইটোকনড্রিয়ার ধাত্রে 50% প্রোটিন, 30–50Å ব্যাস বিশিষ্ট কিছু ঘন দানা, রাইবোজোম, DNA এবং ক্রেবস সাইকেলের কিছু দরকারী উৎসেচক থাকে।

বর্তমানে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে জানা গেছে যে বাইরের পর্দাটির বহির্ভাগে এবং ভেতরের পর্দাটির অন্তর্ভাগে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা (particle) লেগে থাকে। বাইরের কণাগুলির আকৃতি ভিতরের কণাগুলির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বাইরের কণাগুলির আকৃতি গোলাকার, বৃন্তহীন গড় ব্যাস 150Å হয়। এই কণাগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট থাকে, ফলে মাইটোকনড্রিয়ার পৃষ্ঠদেশটি বন্ধুর হয়। ভিতরের কণাগুলির আকৃতি ভিন্ন প্রকারের হয়। এদের

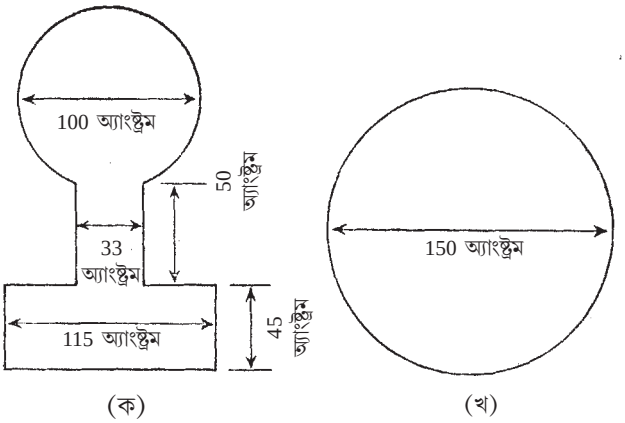

চিত্র 2.2 ঃ মাইটোকনড্রিয়ার বিভিন্ন কণার গঠন; (ক) অন্তর্ভাগের কণার পরিমাপ, (খ) বহির্ভাগের কণার পরিমাপ

দেখতে টেনিসের র‍্যাকেটের মত। এদের ব্যাস গড়ে 70 – 100Å হয়। প্রতিটি কণার একটি গোল মাথা (head), একটি বৃন্ত (stalk) এবং আয়তক্ষেত্রাকার একটি গোড়া (base) থাকে। বৃন্তটির দৈর্ঘ্য 50Å এবং ব্যাস 30Å এবং মাথাটির ব্যাস প্রায় 100Å। গোড়ার দৈর্ঘ্য 115Å এবং 45Å। এইরূপ প্রত্যেকটি কণা পরস্পর থেকে 100Å দূরে থাকে। এই কণাগুলিকে F_1 পার্টিক্‌ল বা কণা অথবা এলিমেন্টারী পার্টিক্‌লও (elementary particle) বলা হয়। পূর্বে F_1 কণাগুলিকে ইলেকট্রন টান্সপোর্ট পার্টিক্‌লস বলে মনে করা হত এবং এতে ইলেকট্রন টান্সপোর্ট চেইনের সমস্ত উৎসেচক আছে বলে মনে করা হত। কিন্তু 1967 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী র‍্যাকার (Racker) পরীক্ষা করে দেখান যে এই কণাগুলিতে ATPase এবং ATP সিনথেটেজ নামক উৎসেচকগুলি থাকে, যেগুলি অক্সিডেশান ও ফসফোরাইলেশনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা ক্রিস্টির গায়ে কিছু কণিকার উপস্থিতি লক্ষ্য করেন, এদের অক্সিজোম বলা হয় (oxysome)। এই কণাগুলিই প্রকৃতপক্ষে ইলেকট্রন টান্সপোর্টের সঙ্গে যুক্ত।

মাইটোকন্ড্রিয়ার DNA (mt DNA) ঃ

মাইটোকনড্রিয়াতে DNA-এর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই DNA গোলাকার, দ্বিতন্ত্রী এবং প্যাঁচানো অবস্থায় থাকে। কিন্তু কিছু প্রোটোজোয়া এবং ছত্রাকে এই DNA লম্বাটে ধরনের হয়। মাইটোকনড্রিয়ার DNA কে mt DNAও বলা হয়ে থাকে। মাইটোকনড্রিয়ার DNA, নিউক্লিয়াসের DNA থেকে অনেক ছোট হয়। মাইটোকনড্রিয়ার DNA-তে গুয়ানিন এবং সাইটোসিনের পরিমাণ নিউক্লিয়াসের DNA-এর থেকে অনেক বেশী হয়। মাইটোকনড্রিয়াতে DNA পলিমারেজ, RNA পলিমারেজ এবং রাইবোজোমের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এর থেকে বোঝা যায় যে এরা সহজেই প্রোটিন সংশ্লেষ করতে পারে। মাইটোকনড্রিয়া নিজের প্রতিলিপিও গঠন করতে সক্ষম। মাইটোকনড্রিয়াতে t-RNA, r-RNA এবং m-RNA ও পাওয়া যায়।

এই মাইটোকনড্রিয়ার DNA-এর জীনগুলি মেন্ডেলের বংশগতির নিয়ম মানে না। এদের এক্সট্রাক্রোমোজোমাল বা ক্রোমোজোম বহির্ভূত জীন বলে। এই ক্ষেত্রে প্রথম অপত্য বংশ শুধুমাত্র মায়ের জীনগত বৈশিষ্ট্যগুলিই পেয়ে থাকে।

2.2.6 মাইটোকনড্রিয়ার উৎসেচক

মাইটোকনড্রিয়ায় প্রায় 70 প্রকার উৎসেচক এবং কো-উৎসেচক থাকে। এই উৎসেচকগুলি বাইরের এবং ভিতরের পর্দায় এবং ধাত্র বস্তুতে থাকে।

(a) **বাইরের পর্দার উৎসেচকসমূহ ঃ**

মনোঅ্যামাইন অক্সিডেজ, কাইনুরেনিন হাইড্রক্সিলেজ, ফ্যাটি অ্যাসিড CoA, লাইগেজ প্রভৃতি উৎসেচক মাইটোকনড্রিয়ার বাইরের পর্দায় থাকে।

(b) **ভিতরের পর্দার উৎসেচকসমূহ ঃ**

ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট পথের উৎসেচকসমূহ, যেমন— নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড (NAD), ফ্লেভিন অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড (FAD), চার প্রকার সাইটোক্রোম, কোএনজাইম Q, ATP সিন্থেটেজ, সাক্সিনিক ডিহাইড্রোজিনেজ, অ্যাসাইল ট্রান্সফারেজ ইত্যাদি উৎসেচক এবং কো-উৎসেচক মাইটোকনড্রিয়ার ভিতরের পর্দায় থাকে।

(c) **বাইরের প্রকোষ্ঠের উৎসেচক সমূহ ঃ**

অ্যাডিনাইলেট কাইনেজ এবং নিউক্লিওসাইড ডাইফসফোকাইনেজ প্রভৃতি উৎসেচক বাইরের প্রকোষ্ঠে পাওয়া যায়।

(d) **মাইটোকনড্রিয়ার ধাত্রের উৎসেচকসমূহ ঃ**

ম্যালেট ও আইসোসাইট্রেট ডিহাইড্রোজিনেজ, ফিউমারেজ, একোনাইটেজ, সাইট্রেট সিনথেটেজ, α - কিটো অ্যাসিড ডিহাইড্রোজিনেজ প্রভৃতি ক্রেবস সাইকেলের উৎসেচকসমূহ এবং β - অক্সিডেশনের উৎসেচকসমূহ মাইটোকনড্রিয়ার ধাত্রে পাওয়া যায়।

2.2.7 মাইটোকনড্রিয়ার কাজ

মাইটোকনড্রিয়া জীবকোষে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোষের মধ্যে অক্সিজেন, ডিহাইড্রেশন, অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম মাইটোকনড্রিয়াতেই ঘটে থাকে।

মাইটোকনড্রিয়ার ক্রেবস সাইকেলে, পাইরুভিক অ্যাসিড পুরোপুরি অক্সিডাইজ (Oxidised) হয়ে CO_2 এবং

H_2O তৈরী করে। এই প্রক্রিয়ায় কিছু পরিমাণ শক্তিও উৎপন্ন হয়। অক্সিডেশন পদ্ধতিতে উদ্ভুত শক্তি ব্যবহার করে মাইটোকনড্রিয়া উচ্চ শক্তি সম্পন্ন যৌগ ATP উৎপন্ন করে। এই কারণেই মাইটোকনড্রিয়াকে কোষের শক্তিঘর বলে।

(1) **শ্বাসকার্য** (Respiration) ঃ কোষের শ্বসনকার্যে মাইটোকনড্রিয়ার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্বসনই এর প্রধান কাজ। শ্বসনের প্রধান উদ্দেশ্য হল কোষে সঞ্চিত শর্করা, প্রোটিন এবং ফ্যাট জারিত করে শক্তি উৎপাদন করা। সবাত শ্বসনের সময় কোষের গ্লুকোজ অণুগুলি অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে CO_2, জল এবং শক্তি উৎপন্ন করে। এই উৎপাদিত শক্তির কিছুটা ATP হিসেবে সঞ্চিত হয় এবং কিছুটা অপশক্তি রূপে মুক্ত হয়।

এই বিপাকীয় পথটি অনেকগুলি জৈব রাসায়নিক ধাপের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং এই ধাপগুলিকে তিনটি জৈব রাসায়নিক পর্যায়ে ভাগ করা যায়। (ক) গ্লাইকোলাইসিস, (খ) ক্রেবস সাইকেল এবং (গ) রেসপিরেটরি চেইন বা ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্র (Electron transport system)। নীচে সংক্ষেপে সবাত শ্বসনের ধাপগুলি দেখান হোল।

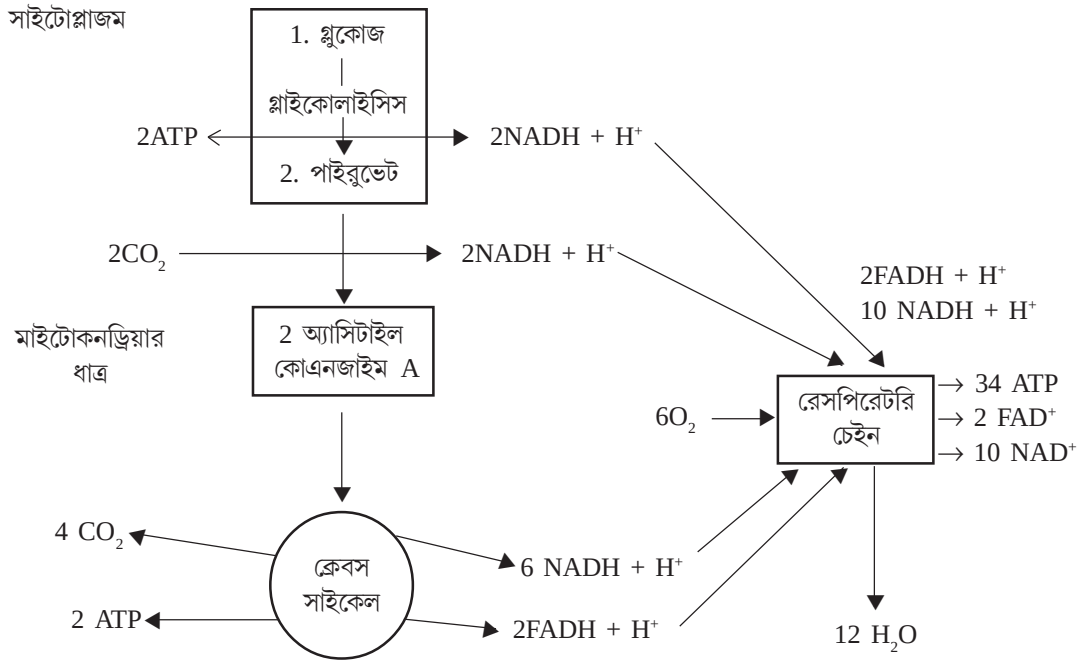

চিত্র 2.3 ঃ সবাত শ্বসনের একটি ছক

(ক) গ্লাইকোলাইসিস (Glycolysis) ঃ

কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে গ্লাইকোলাইসিসের ফলে এক অণু গ্লুকোজ কতগুলি ধাপ অতিক্রম করে দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। প্রত্যেকটি ধাপে একটি করে উৎসেচকের প্রয়োজন হয়। দুই জার্মান প্রাণ-

NSOU

রসায়নবিদ্, এম্বডেন এবং মেয়ারহফ (Embden-Meyerhoff) প্রথম বিক্রিয়াগুলির প্রত্যেক ধাপের ক্রিয়া কৌশল আবিষ্কার করেন। তাঁদের নামানুসারে, এই ক্রমিক পদার্থগুলির নাম এম্বডেন - মেয়ারহফ পাথওয়েজ (Embden-Meyerhoff pathways)। নিচে এই প্রক্রিয়াটি দেখানো হোল।

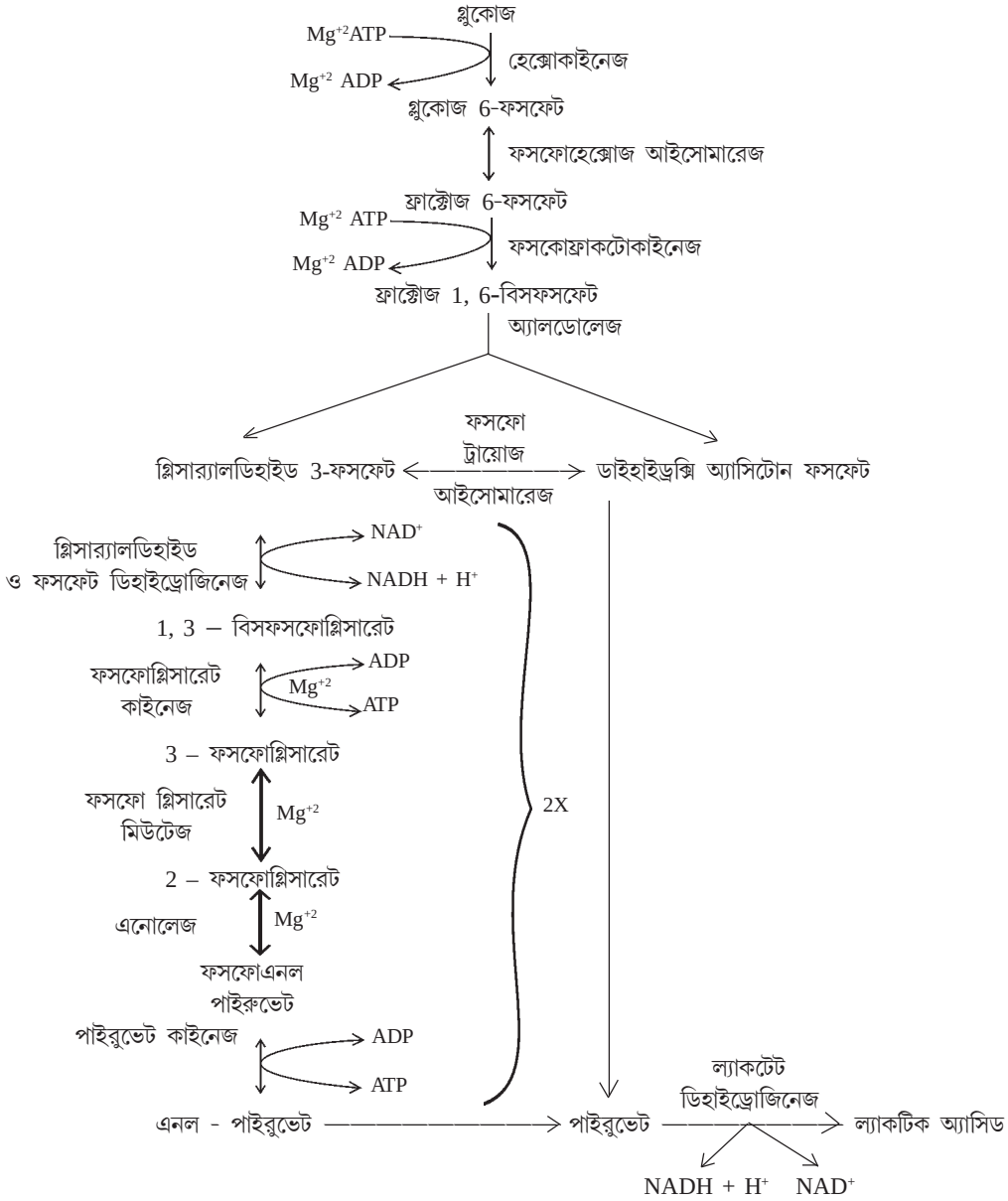

গ্লুকোজ, হেক্সোকাইনেজ উৎসেচকের উপস্থিতিতে এবং Mg^+ ও ATP এর সাহায্যে গ্লুকোজ 6 ফসফেটে পরিণত হয়। এর পর ফসফোহেক্সোজ আইসোমারেজ উৎসেচক গ্লুকোজ 6 ফসফেটকে ফ্রাক্টোজ 6 ফসফেটে পরিণত করে। ফ্রাক্টোজ 6-ফসফেট ফসফোফ্রাকটো কাইনেজ উৎসেচকের সাহায্যে গ্লিসার‍্যালডিহাইড 3-ফসফেট

এবং ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেটে পরিণত হয়। ঐ যৌগ দুটি ফসফোট্রায়োজ আইসোমারেজের সাহায্যে পরস্পর পরস্পরে পরিবর্তিত হতে পারে। এরপর গ্লিসার‍্যালডিহাইড 3-ফসফেট, গ্লিসার‍্যালডিহাইড 3-ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের সাহায্যে জারিত হয়ে 1, 3-বিস ফসফোগ্লিসারেটে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ায় NAD^+ বিজারিত হয়ে NADH এবং H^+ সৃষ্টি করে। ফসফোগ্লিসারেট কাইনেজ, 1, 3-বিসফসফোগ্লিসারেটকে 3-ফসফোগ্লিসারেটে পরিণত করে। এই প্রক্রিয়ায় 1 অণু ATP উৎপন্ন হয়। এর পর ফসফোগ্লিসারেট মিউটেজ এবং Mg^{+2} এর উপস্থিতিতে পূর্ববর্তী যৌগটি 2-ফসফোগ্লিসারেটে পরিণত হয়। 2-ফসফোগ্লিসারেট, এনোলেজ উৎসেচকের সাহায্যে ফসফো এনল পাইরুভেটে পরিণত হয়। Mg^{+2} এই বিক্রিয়ায় সাহায্য করে। এই বিক্রিয়ায় এক অণু H_2O বেরিয়ে যায়। Mg^{+2} এবং পাইরুভেট কাইনেজ উৎসেচক পূর্ববর্তী যৌগটিকে এনলপাইরুভেটে পরিবর্তিত করে। এই পর্যায়ে নির্গত শক্তি ADP-কে ATP-তে পরিণত করে। এই এনল পাইরুভেট পরে পাইরুভেটে পরিবর্তিত হয়।

উপরের এই একই পদ্ধতিতে ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট থেকে এক অণু পাইরুভেট তৈরী হয়। সুতরাং, গ্লাইকোলিসিসে 1 অণু গ্লুকোজ থেকে মোট 2 অণু পাইরুভেট তৈরী হয় এবং এই পুরো প্রক্রিয়ায় মোট 4 অণু ATP উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে 2 অণু ATP খরচ হয় এবং সর্বশেষে 2 অণু ATP থাকে।

গ্লাইকোলাইসিসে ATP অণুর উৎপত্তি ঃ (অবাত শ্বসন)

(ক) উৎপত্তি ঃ

ধাপ	**ATP অণু**
(i) 1, 3-বিস ফসফোগ্লিসারেট → 3-ফসফোগ্লিসারেট	1 × 2 = 2
(ii) ফসফোএনল পাইরুভেট → এনলপাইরুভেট	1 × 2 = 2
	4
(খ) **ব্যায় ঃ**	
(i) গ্লুকোজ → গ্লুকোজ 6-ফসফেট	1
(ii) ফ্রাক্টোজ 6-ফসফেট → ফ্রাক্টোজ 1, 6-বিসফসফেট	1
	মোট জমা = (4 – 2) = 2

(সবাত শ্বসন)

মোট 10টি ATP সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে 2টি খরচ হয়।

(খ) অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন (Oxydative decarboxylation) ঃ

গ্লাইকোলাইসিসের ফলে উৎপাদিত পাইরুভিক অ্যাসিড সবাত শ্বসনে মাইটোকনড্রিয়ায় প্রবেশ করে অ্যাসিটাইল কোএনজাইম A (acetyl Co A) তৈরী করে। যে বিক্রিয়ার সাহায্যে এটি হয়, তাকে অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন বলে। এই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একাধারে জারণ (oxidation) হয় এবং CO_2 হ্রাস হয়। এই ধাপে 1 অণু NAD বিজারিত হয়ে $NADH_2$ সৃষ্টি করে।

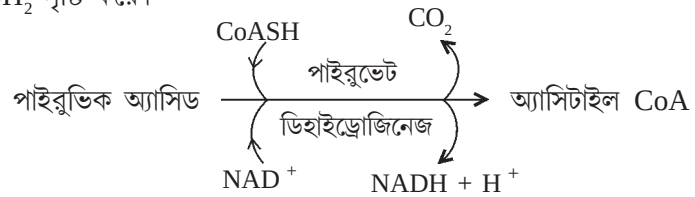

NSOU

(গ) ক্রেবস চক্র (Krebs cycle) ঃ

1940 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী ক্রেবস (H. A. Krebs) এই জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি প্রথম আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে তাঁর নামানুসারে এই বিক্রিয়া পথটির নাম হয় ক্রেবস সাইকেল। একে সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল অথবা ট্রাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড সাইকেলও বলা হয়ে থাকে। নীচে একটি ছকের সাহায্যে প্রক্রিয়াটি দেখানো হোল।

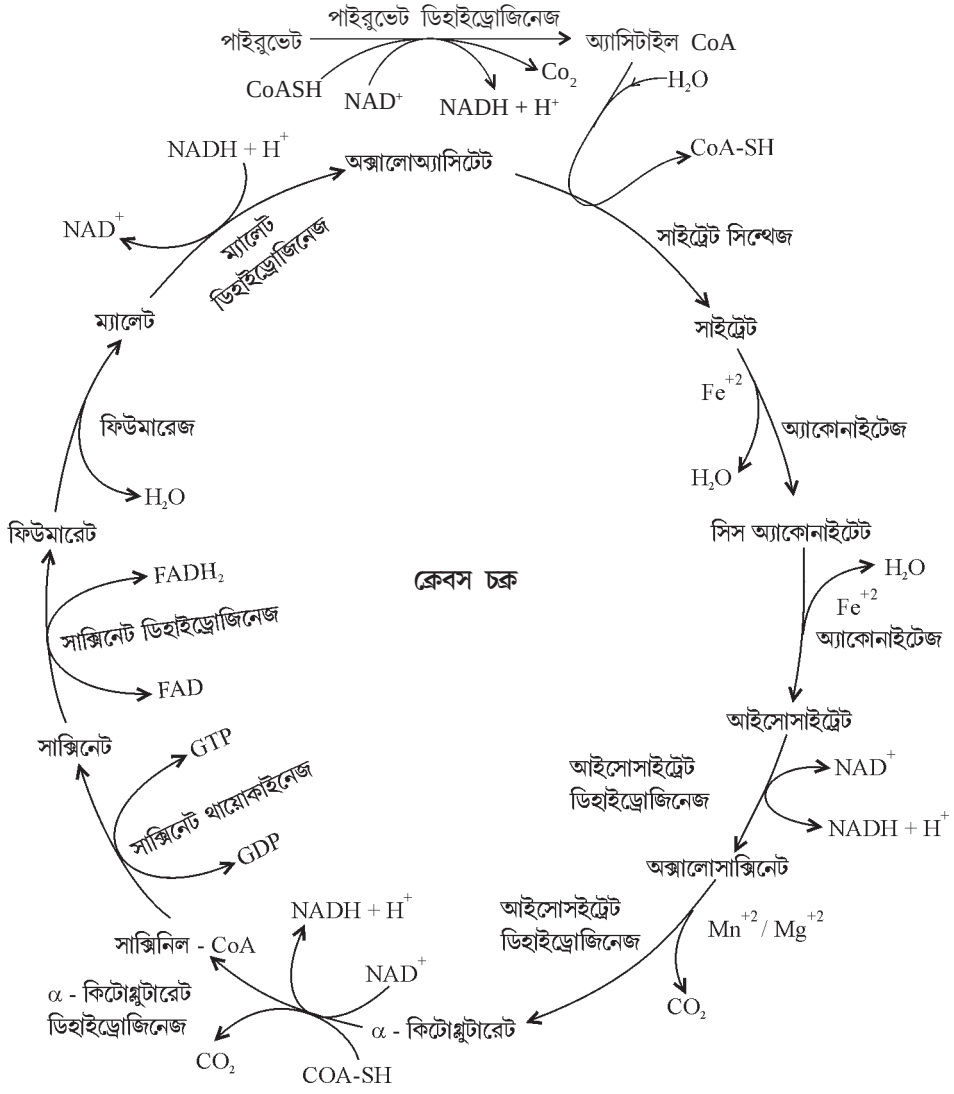

অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-A মাইটোকনড্রিয়ায় প্রবেশ করে এবং অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। সাইট্রেট সিন্থেজ নামক উৎসেচক এবং জল এই বিক্রিয়ায় সাহায্য করে। এর পরবর্তী ধাপে সাইট্রিক অ্যাসিড অণু থেকে এক অণু জল বিয়োজিত হয়ে সিস-অ্যাকোনাইটেট উৎপন্ন হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে আবার এক অণু জল যুক্ত হয়ে আইসোসাইট্রেট উৎপন্ন হয়। এই দুটি পর্যায়ে অ্যাকোনাইটেজ

NSOU

নামক উৎসেচক সাহায্য করে। আইসোসাইট্রেট ডিহাড্রোজিনেজ নামক উৎসেচক NAD কো-উৎসেচকের সাহায্যে আইসোসাইট্রেটকে অক্সালোসাক্সিনেট-এ পরিণত করে। অক্সালোসাক্সিনেট, আইসোসাইট্রেট ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচক এবং Mn^{+} ও Mg^{+2} -এর সাহায্যে α-কিটোগ্লুটারেটে রূপান্তরিত হয়। এই বিক্রিয়ায় এক অণু CO_2 মুক্ত হয়। α - কিটোগ্লুটারেট পরবর্তী পর্যায়ে α - কিটোগ্লুটারেট ডিহাইড্রোজিনেজ নামক উৎসেচক এবং NAD সহ উৎসেচকের উপস্থিতিতে এক অণু CO_2 মুক্ত করে সাক্সিনিল CoA-তে পরিণত হয়। NAD বিজারিত হয়ে $NADH_2$-তে পরিণত হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে 3 অণু ATP সৃষ্টি করে। সাক্সিনিল CoA পরবর্তী পর্যায়ে সাক্সিনেট থায়োকাইনেজ উৎসেচকের সাহায্যে সাক্সিনেটে পরিণত হয়। এই বিক্রিয়ায় GDP থেকে GTP তৈরী হয়। এর পরবর্তী পর্যায়ে সাক্সিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের সাহায্যে সাক্সিনেট ফিউমারেটে পরিবর্তিত হয়। এই পর্যায়ে FAD বিজারিত হয়ে $FADH_2$ তৈরী করে। ফিউমারেট, ফিউমারেজ নামক উৎসেচকের সাহায্যে ম্যালিক অ্যাসিড বা ম্যালেট তৈরী করে। এই প্রক্রিয়ায় এক অণু জল যুক্ত হয়। ম্যালেট ডিহাইড্রোজিনেজ নামক উৎসেচক ম্যালিক অ্যাসিডকে অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিডে পরিণত করে। এই প্রক্রিয়ায় NAD বিজারিত হয়ে NADH এবং H^{+} তৈরী করে। এই অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড পূনরায় অ্যাসিটাইল CoA-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাইট্রিক অ্যাসিড তৈরী করে এবং পরে NAD বিজারিত হয়ে ATP সৃষ্টি হয়।

ক্রেবস সাইকেলে 1 অণু পাইরুভিক অ্যাসিড অ্যাসিটাইল CoA হয়ে ক্রেবস সাইকেল অতিক্রম করলে মোট 4 অণু $NADH_2$, 1 অণু $FADH_2$, 1 অণু ATP এবং 3 অণু CO_2 পাওয়া যায়।

(ঘ) ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন বা রেসপিরেটরি চেইন ঃ

ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের প্রয়োজনীয় উৎসেচকগুলি মাইটোকনড্রিয়ার অন্তর্ভাগের কণাগুলিতে পাওয়া যায়। ক্রেবস সাইকেলের জারণ বিজারণ প্রক্রিয়া চলার সময় ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচক সাবস্ট্রেট থেকে হাইড্রোজেন স্থানান্তরিত করে। এই হাইড্রোজেন ক্রমান্বয়ে একসারি উৎসেচকের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়ে অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে জল উৎপাদন করে। এক উৎসেচক থেকে অন্য উৎসেচকে হাইড্রোজেন পরিবহনের সময় প্রচুর পরিমাণে শক্তি উৎপাদিত হয়। এই শক্তিই ADP-তে ফসফেট (~ P) সংযোগ করে ATP-তে পরিণত করে। এই ATP সংশ্লেষে যে সকল উৎসেচক কাজ করে তাদের সম্মিলিত কার্যকেই **ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন** বলা হয়।

$$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O + \text{শক্তি}$$

(i) ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচক সাবট্রেট থেকে হাইড্রোজেন অপসারণ করে। হাইড্রোজেন পরমাণু আয়নিত হয়ে (H^{+}) NAD-কে বিজারিত করে।

$$2H \rightarrow 2H^{+} + 2e^{-} ;$$

$$NAD + 2H^{+} \rightarrow NADH + H^{+}$$

NADH অণু মাইটোকনড্রিয়ার বহিঃপ্রকোষ্ঠে পরিবাহিত হবার সময় F_1 কণার সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে রেসপিরেটরি চেইনে প্রবেশ করে।

(ii) NADH জারিত হয়ে NAD^{+}-তে পরিণত হয় এবং H পরমাণু FAD-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে $FADH_2$-তে পরিণত করে। $FADH_2$ থেকে পূনরায় H পরমাণু কোষের মধ্যে H^{+} আয়ন হিসেবে নিক্ষিপ্ত হয় এবং ইলেকট্রন সাইটোক্রোমে পরিবাহিত হয়।

(iii) সকল সবাত শ্বসনকারী কোষেই সাইটোক্রোম থাকে। সাইটোক্রোম হল লৌহযুক্ত একপ্রকার রঞ্জক বিশেষ। এটি উৎসেচকের মত কাজ করে। এই সাইটোক্রোম FAD এবং অন্যান্য বাহক উৎসেচক থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে সাইটোক্রোম অক্সিডেজ উৎসেচকে স্থানান্তরিত করে। এ পর্যন্ত বহু প্রকার সাইটোক্রোম আবিষ্কৃত হলেও কোষে সাধারণত a, a_3, b, c ও c_2 এই পাঁচ প্রকার সাইটোক্রোম থাকে। FAD থেকে ইলেকট্রন ক্রমান্বয়ে b,

c, c_2, a ও a_3-র মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয়। সাইটোক্রোম অক্সিডেজ এই ইলেকট্রন অক্সিজেনকে দেয় এবং এর ফলে অক্সিজেন সক্রিয় হয় (O^-)। এইরূপে আহিত অক্সিজেন দুই আয়ন H^+এর সঙ্গে মিলে জল উৎপাদন করে।

রেসপিরেটরি চেইনের ধাপসমূহের চিত্র

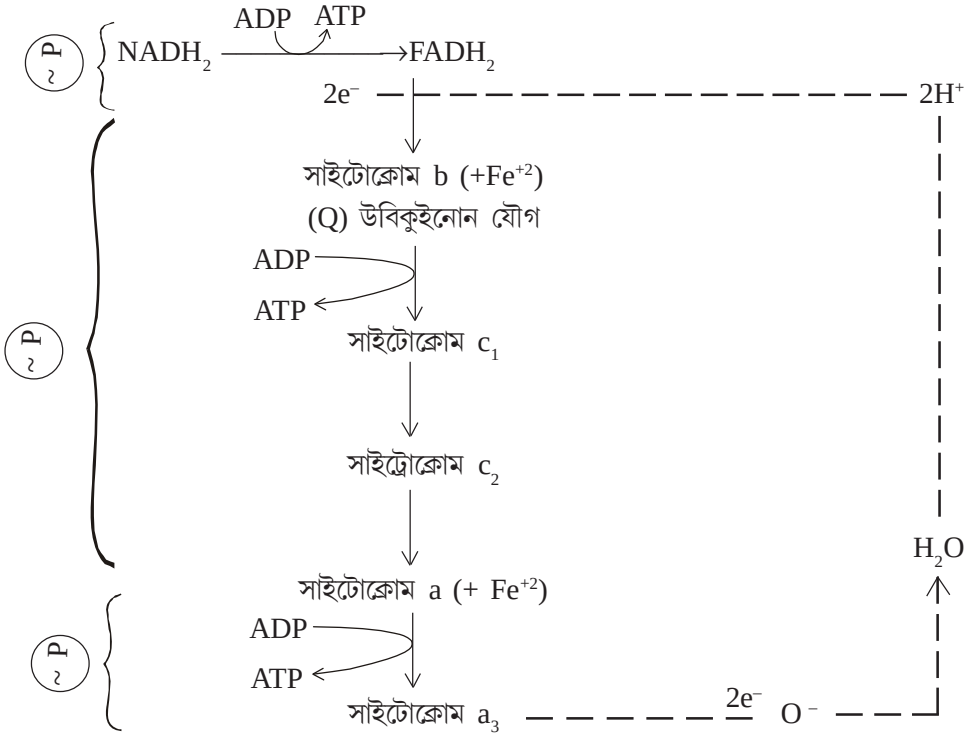

(2) **ATP-র উৎপাদন ঃ**

অধিকাংশ ATP-ই মাইটোকনড্রিয়ায় তৈরী হয়। শ্বাসকার্যের ফলস্বরূপ ATP পাওয়া যায়। ADP-কে ATP-তে রূপান্তরিত হতে হলে কিছু পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন। ATPase উৎসেচক এই রূপান্তরে সাহায্য করে। শ্বসনের ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় সেই শক্তি কাজে লাগিয়ে, ADP রূপান্তরিত হয়ে ATP-তে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন বলে।

(3) **মাইটোকনড্রিয়ায় সংশ্লেষ ঃ**

বিভিন্ন প্রকার সংশ্লেষ কার্য্য মাইটোকনড্রিয়ার ভূমিকা যথেষ্ট। এটি প্রোটিন, লিপিড, সাইট্রুলিন, ডিমের কুসুম ইত্যাদি সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে থাকে।

2.2.8 সারাংশ

কোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত দণ্ডাকার, সূত্রবৎ, দানাদার বা গোলাকার বস্তুরূপে মাইটোকনড্রিয়া অবস্থান করে। মাইটোকনড্রিয়া, কোষের শ্বাস অঙ্গাণু তথা শক্তি ঘর। মাইটোকনড্রিয়া দুটি পর্দা বেষ্টিত কোষ অঙ্গাণু বিশেষ। এর ভিতরের পর্দাবেষ্টিত কক্ষকে অন্তঃকক্ষ এবং বাইরের কক্ষকে বহিঃকক্ষ বলে। ভিতরের পর্দা থেকে আঙুলের

মত অনেকগুলি অন্তঃবৃধ্বি মাইটোকনড্রিয়ার ভিতরের গহ্বরের দিকে প্রবেশ করে। এগুলিকে ক্রিষ্টি বলে।

অন্তঃকক্ষের ধাত্রবস্তু জেলির ন্যায় ঘন, কিন্তু বহিঃকক্ষের ধাত্র একটু তরল প্রকৃতির হয়। বহিঃপর্দার বহির্ভাগে এবং অন্তঃপর্দার অন্তভাগে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা লেগে থাকে; এই কণাগুলিকে F_1 কণা বলে।

মাইটোকনড্রিয়ায় গোলাকার, দ্বিতন্ত্রী এবং প্যাচানো DNA-এর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এই DNA-কে mt DNA বলা হয়। mt DNA-এর জীনগুলিকে এক্সট্রাক্রোমোজোমাল জীন বলে।

মাইটোকনড্রিয়ায় প্রায় 70 প্রকার উৎসেচক এবং কো-উৎসেচক থাকে। এই উৎসেচকগুলি বাইরের পর্দায়, ভেতরের পর্দায় এবং ধাত্রে অবস্থান করে।

মাইটোকনড্রিয়া জীবকোষে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অক্সিডেশন, ডিহাইড্রেশন, অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ইত্যাদি মাইটোকনড্রিয়াতেই ঘটে থাকে। কোষের প্রকৃত শ্বসন মাইটোকনড্রিয়াতেই হয়ে থাকে। এক অণু গ্লুকোজের গ্লাইকোলাইসিসের ফলে উৎপন্ন দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিড, মাইটোকনড্রিয়ায় ক্রেবস সাইকেল ও ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে প্রবেশ করে, মোট 38 অণু ATP, 12 অণু জল ও 6 অণু CO_2 উৎপন্ন করে। তাছাড়া মাইটোকনড্রিয়ায় প্রোটিন, লিপিড ইত্যাদিও সংশ্লেষিত হয়।

2.2.9 প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) মাইটোকনড্রিয়ার গঠন এবং কার্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

(২) mt DNA কি? এর সম্পর্কে যা জান লেখ। মাইটোকনড্রিয়ার বাইরের পর্দা, ভেতরের পর্দা, বাইরের প্রোকষ্ঠ এবং ধাত্রের উৎসেচকগুলির নাম লিখুন।

(৩) গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটি একটি ছকের সাহায্যে বর্ণনা করুন। এই প্রক্রিয়াটিতে মোট কত অণু ATP উৎপন্ন হয়?

(৪) অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন বলতে কি বোঝ? ক্রেবস সাইকেল প্রক্রিয়াটি একটি ছকের সাহায্যে বর্ণনা করুন।

(৫) সংক্ষেপে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনটি বর্ণনা করুন।

(৬) এক অণু গ্লুকোজ সম্পূর্ণরূপে গ্লাইকোলাইসিস, ক্রেবস সাইকেল ও রেসপিরেটরি চেইনে প্রবেশ করে মোট কত অণু ATP, জল এবং CO_2 উৎপন্ন করে তা সংক্ষেপে একটি মাত্র ছকের সাহায্যে বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) F_1 পার্টিকেল সম্পর্কে লিখুন।

(২) mt DNA কি?

(৩) মাইটোকনড্রিয়ার ধাত্রে অবস্থিত উৎসেচকগুলির নাম লিখুন।

(৪) ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের উৎসেচকসমূহের নাম লিখুন। এগুলি কোথায় দেখতে পাওয়া যায়?

(৫) গ্লাইকোলাইসিস কি? গ্লাইকোলাইসিসের যে ধাপগুলিতে ATP উৎপন্ন হয় তা বর্ণনা কর।

(৬) অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশনে পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেজের ভূমিকা কি?

(৭) একটি ছকের সাহায্যে গ্লাইকোলাইসিসে ATP অণুর উৎপত্তি দেখান।

একক 2.3 ❑ ক্রোমোজোমের গঠন

গঠন

2.3.1 প্রস্তাবনা

2.3.2 ক্রোমোজোমের সংখ্যা

2.3.3 ক্রোমোজোমের আয়তন

2.3.4 ক্রোমোজোমের আকৃতি

2.3.5 ক্রোমোজোমের গঠন

2.3.6 ইউক্যারিওটিক ক্রোমোজোমের আণবিক গঠন

2.3.7 নিউক্লিওজোম মডেল

2.3.8 কিছু অসাধারণ ক্রোমোজোম

2.3.9 সারাংশ

2.3.10 প্রশ্নাবলী

2.3.1 ভূমিকা

ক্রোমোজোম হল নিউক্লিয়াসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যার কার্যসমূহ জীববিজ্ঞানীর কাছে অপরিসীম। জীবের বংশগতি নিয়ন্ত্রণে, পরিব্যক্তির যন্ত্র হিসেবে, ভেদের মূল কারণ হিসেবে এবং বিবর্তনের সহায়ক হিসেবে ক্রোমোজোমের গুরুত্ব সর্বাধিক। বংশগতির মূল কণিকা জীনগুলি ক্রোমোজোমেই থাকে। ক্রোমোজোমগুলি পুনরুৎপাদনে (self reproduction) সক্ষম। কোষবিভাজনের মেটাফেজ দশায় ক্রোমোজোমের অঙ্গসংস্থান সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝা যায় এবং পরীক্ষা করা যায়।

1848 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী হফমেইস্টার (Hofmeister) সর্বপ্রথম কোষে ক্রোমোজোমের উপস্থিতির কথা বলেন। 1875 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী স্ট্রাসবার্জার (Strasburger) এবং 1876 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী বলবিয়ানী (Balbiani) কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াসে কিছু তন্তু জাতীয় বস্তুর উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। তারপর 1879 খ্রিস্টাব্দে ফ্লেমিং (Flemming) ঐ তন্তুজাতীয় বস্তুগুলির নামকরণ করেন ক্রোমাটিন (Chromatin)। 1888 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী ওয়ালডিয়ার (Waldeyer) প্রথম, নিউক্লিয়াসের ঐ তন্তুজাতীয় বস্তুগুলি নামকরণ করেন ক্রোমোজোম। 1933 খ্রিস্টাব্দে বোভারি (Boveri) প্রমাণ করে দেখান যে ক্রোমোজোমই হল বংশগতির বাহক। 1935 খ্রিস্টাব্দে হিটস (Heitz), 1939 খ্রিস্টাব্দে কাউডা (Kuwada), 1940 খ্রিস্টাব্দে গিট্টার (Geitter) এবং 1948 খ্রিস্টাব্দে কফ্‌ম্যান (Kaufmann) ক্রোমোজোমের ভৌত গঠন বর্ণনা করেন। পরবর্তী কালে 1966 খ্রিস্টাব্দে, বিজ্ঞানী ডুপরো (Dupraw) প্রথম ক্রোমোজোমের আলট্রাস্ট্রাকচার বা সুক্ষাতিসূক্ষ গঠনের বর্ণনা করেন। কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজোম প্রতিলিপি গঠন করে।

2.3.2 ক্রোমোজোমের সংখ্যা

যে কোনও একটি প্রজাতিতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা একেবারে সুনির্দিষ্ট থাকে এবং পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে ঐ একই সংখ্যায় পরিবাহিত হয়। কিন্তু প্রজাতি থেকে প্রজাতিতে এই ক্রোমোজোম সংখ্যার তারতম্য দেখতে পাওয়া যায়। ক্রোমোজোমের সংখ্যা প্যারামেসিয়ামে 30–40, হাইড্রায় 32, অ্যাসকারিসে 24, ড্রসোফিলায় 8, গৃহের মাছিতে 12, কলাম্বা লিভিয়ায় 80 এবং মানুষে 46। কোন প্রাণীর কোষের নিউক্লিয়াসে প্রত্যেকটি ক্রোমোজোমের একটি করে প্রতিলিপি থাকলে তাকে হ্যাপ্লয়েড (n) এবং দুইটি করে প্রতিলিপি থাকলে তাকে ডিপ্লয়েড (2n) বলা হয়। হ্যাপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোজোমকে, জিনোম (genome) ও বলা হয়। মেটাফেজ এবং অ্যানাফেজ, কোষ বিভাজনের এই দুটি দশায় ক্রোমোজোম সর্বাপেক্ষা সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকে, এইজন্য এই দুটি দশায় ক্রোমোজোমের অঙ্গসংস্থান বোঝা সবথেকে সুবিধার হয়।

2.3.3 ক্রোমোজোমের আয়তন

ক্রোমোজোমের আয়তন বিভিন্ন প্রাণীতে বিভিন্ন রকম হয়। আবার কোষ বিভাজনের বিভিন্ন দশায় একটি প্রজাতির ক্রোমোজোমের আয়তন বিভিন্ন দশায় বিভিন্ন হয়। সাধারণত গড়ে ক্রোমোজোম 0·1 μm থেকে 30 μm লম্বা এবং 0·2 μm থেকে 2 μm চওড়া হয়ে থাকে।

2.3.4 ক্রোমোজোমের আকৃতি

ক্রোমোজোমকে মোটামুটি সিলিণ্ডারের মত দেখতে হয় এবং তারা ক্ষারজাতীয় রঞ্জকের দ্বারা রঞ্জিত হয়। কোষ বিভাজনের বিভিন্ন দশায় ক্রোমোজোমের আকৃতি পরিবর্তিত হয়। ক্রোমোজোমের এক বা একাধিক অংশ চাপা থাকে, যারা সাধারণতঃ রঞ্জক দ্বারা রঞ্জিত হয় না। এদের মধ্যে বড় সংকুচিত স্থানকে সেন্ট্রোমিয়ার বা প্রাথমিক সংকোচ বলে। সেন্ট্রোমিয়ারের দুই দিকের অংশকে ক্রোমোজোমের বাহু বলে। বাহুর বিশেষ গুণ সম্পন্ন প্রান্ত দুটিকে বলে টেলোমিয়ার।

প্রতিটি নিউক্লিয়াসে অবস্থিত নিউক্লিওলাস সংগঠিত ক্রোমোজোমকে নিউক্লিওলার ক্রোমোজোম বলে। সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের উপর ক্রোমোজোমের আকৃতি বহুলাংশে নির্ভর করে। সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোমের নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম ঃ

যে ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ারটি ক্রোমোজোমের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করে, তাকে মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। অ্যানোফেজ দশায় এই ক্রোমোজোম 'V' এর ন্যায় আকার ধারণ করে।

(খ) সাব-মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম ঃ

যে ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ারটি মাঝামাঝি অবস্থান না করে, একটি পাশে অবস্থান করে, তাকে সাব মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। এই ক্রোমোজোমের বাহু দুটি অসমান হয় এবং অ্যানোফেজ দশায় এদের 'J' বা 'L' অক্ষরের ন্যায় দেখতে হয়।

(গ) অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম ঃ

ক্রোমোজোমের যে কোনও এক প্রান্তের কাছাকাছি সেন্ট্রোমিয়ার থাকলে তাকে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। অ্যানোফেজ দশায় একে 'I'-এর ন্যায় দেখতে হয়।

(ঘ) টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম ঃ

কোনও ক্রোমোজোমের যে কোনও এক প্রান্তের শীর্ষদেশে সেন্ট্রোমিয়ার থাকলে, তাকে টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। অ্যানাফেজ দশায় এদেরও 'I'-এর ন্যায় দেখতে হয়।

O = সেন্ট্রোমিয়ার

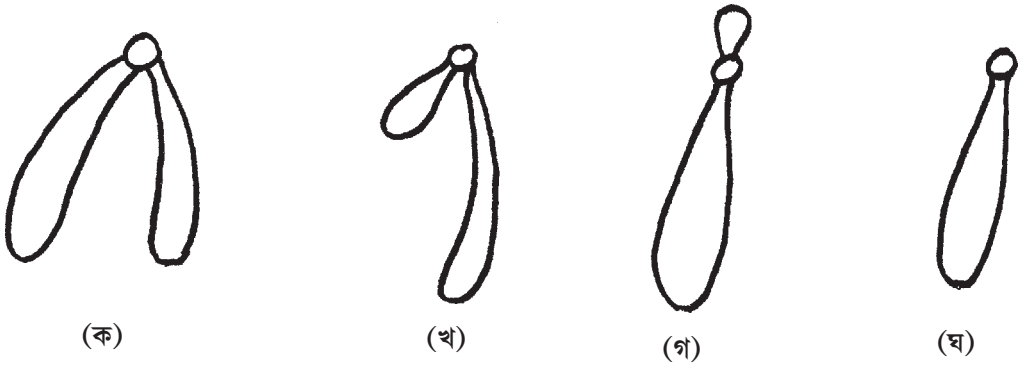

চিত্র 3.1 ঃ সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান ও ক্রোমোজোমের আকৃতি। (ক) মেটাসেন্ট্রিক, (খ) সাবমেটাসেন্ট্রিক, (গ) অ্যাক্রোসেন্ট্রিক, ও (ঘ) টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম

ক্যারিওটাইপ ও ইডিওগ্রাম ঃ কোন প্রজাতির জীব কোষের সমস্ত মেটাফেজ ক্রোমোজোমগুলির একটি সম্পূর্ণ সেটকে ক্যারিওটাইপ বলে। এর থেকে আমরা ক্রোমোজোমগুলির আকার, আকৃতি এবং গঠনের একটি তুলনামূলক চিত্র পাই। এই ক্যারিওটাইপকে ছবির দ্বারাও প্রকাশ করা যায়। একে বলে ইডিওগ্রাম (idiogram)।

2.3.5 ক্রোমোজোমের গঠন

নীচে একটি মেটাফেজ ক্রোমোজোমের গঠন বর্ণনা করা হল। কারণ এই দশায় ক্রোমোজোমকে সবথেকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

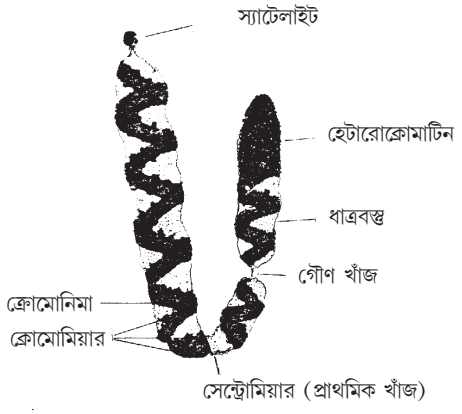

চিত্র 3.2 ঃ একটি মাইটোটিক স্যাট-ক্রোমোজোমের সাধারণ গঠনের চিত্ররূপ।

NSOU

(ক) ক্রোমোনিমাটা (Chromonemata) ঃ ইন্টারফেজ দশায় প্রতিটি ক্রোমোজোমে দুটি প্যাচানো সূত্রবৎ বস্তু দেখতে পাওয়া যায়, এদের ক্রোমোনিমাটা বলে (chromonema-singular)। 1912 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী ভেজ্‌দোভস্কি (vejdovsky) প্রথম এই নামকরণ করেন। ক্রোমোনিমা অনেকগুলি মাইক্রোফাইব্রিল নিয়ে গঠিত। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, একটি ক্রোমোনিমায় এইরূপ 64 টি মাইক্রোফাইব্রিল থাকে। এই মাইক্রোফাইব্রিলগুলি বা তন্তুগুলি পরস্পর প্যাঁচিয়ে কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় থাকে। এই কুণ্ডলীগুলি দুই প্রকারের হতে পারে— **প্যারানেমিক** (paranemic) এবং **প্লেক্টোনেমিক** (plectonemic)। ক্রোমোনিমার যে কুণ্ডলীগুলি অতি সহজে পৃথক করা যায়, তাকে প্যারানেমিক কুণ্ডলী এবং ক্রোমোনিমার যে কুণ্ডলীগুলি পরস্পর ঘনিষ্ঠ ভাবে দড়ির মত পাঁচানো থাকে এবং যাদের সহজে পৃথক করা যায় না, তাদের প্লেক্টোনেমিক কুণ্ডলী বলে। ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্যের উপর, ক্রোমোনিমার কুণ্ডলীর মাত্রাও নির্ভর করে।

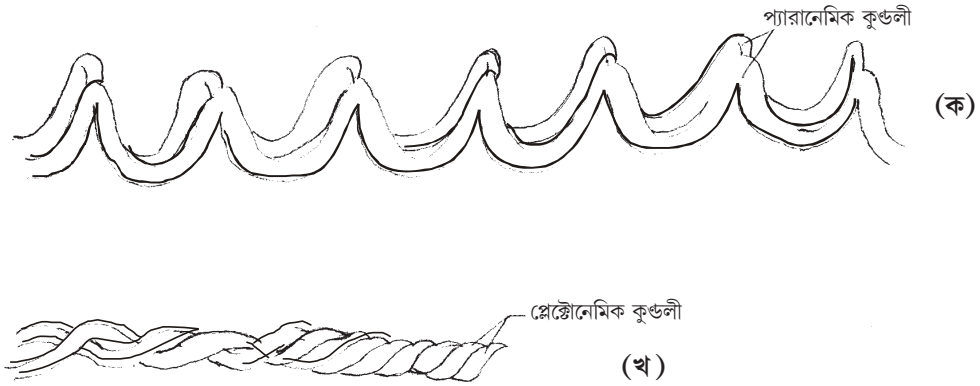

চিত্র 3.3 ঃ ক্রোমোনিমার বিভিন্ন প্রকার কুণ্ডলীকরণ; ক — প্যারানেমিক, খ — প্লেক্টোনেমিক।

প্রকৃতপক্ষে ইন্টারফেজ দশার ক্রোমোটিক তন্তুগুলি, যেগুলি ক্রোমোনিমাটা নামে পরিচিত, কোষ বিভাজনের সময় সেগুলি আরও প্যাঁচানো, ছোট এবং মোটা হয়ে যায়। তখন তাদের বলে **ক্রোমাটিড** (Chromatid)। কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজোমগুলি লম্বালম্বিভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়, তখন এদের প্রত্যেকটিকে ক্রোমাটিড বলে।

(খ) ক্রোমোমিয়ার (Chromomere) ঃ কোষ বিভাজনের প্রারম্ভে ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য বরাবর অনেকগুলি পুতির দানার মত ছোট ছোট অংশ (bead) দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রত্যেকটি ছোট দানাকে ক্রোমোমিয়ার বলে এবং এদের মধ্যবর্তী অংশকে বলে ক্রোমোমিয়ার মধ্যবর্তী (inter chromomere) অঞ্চল। 1876 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী বলবিয়ানী (Balbiani) প্রথম এই ক্রোমোমিয়ারের নামকরণ করেন। রীস (Ris) নামক কোষবিজ্ঞানীর মতে ক্রোমোনিমাগুলি কিছুদূর অন্তর অন্তর কুণ্ডলী পাকানোর ফলে ক্রোমোমিয়ার তৈরী হয়।

(গ) ধাত্রবস্তু (Matrix) ঃ

ক্রোমোনিমাগুলি যে ঘন জেলির ন্যায় পদার্থের মধ্যে ডুবে থাকে, তাকে ধাত্রবস্তু বা ম্যাট্রিক্স বলে। ম্যাকক্লিন্টক (McClintock) নামক কোষবিজ্ঞানীর মতে নিউক্লিওলার বস্তু থেকে ক্রোমোজোমের ধাত্রবস্তু উৎপন্ন হয়।

ধাত্রের গঠন এবং কার্যাবলী সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় নি। তবে এটি ক্রোমোনিমাগুলিকে বাণ্ডিল হিসেবে ধরে রাখতে সাহায্য করে, যাতে কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজোমের বিচলনে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়।

অনেকের মতে ধাত্রবস্তু কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোনিমাগুলির সংকোচনে সাহায্য করে এবং জীনগুলিকে একটি আবরণী দ্বারা পৃথক করে রাখে।

ধাত্র বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোষবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও কোষ বিভাজনের কোনও কোনও দশায় ভুট্টা, ট্রিলিয়াম প্রভৃতি উদ্ভিদে এবং পোন্ডিসমা নামক ঘাসফড়িং-এর ক্রোমোজোমের আলোকচিত্রের সাহায্যে এর অস্তিত্ব সম্পর্কে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে।

(ঘ) সেন্ট্রোমিয়ার (Centromere) ঃ

সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের একটি অপরিহার্য অংশ। এটি ক্রোমোজোমের প্রাথমিক সংকুচিত জায়গা, যেখানে ক্রোমোজোমের দুটি বাহু মিলিত হয়। বিজ্ঞানী ডারলিংটন (Darlington) প্রথম ঐ সঙ্কুচিত স্থানটিকে সেন্ট্রোমিয়ার নামকরণ করেন। সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমকে বেমতন্তুর বিষুব অঞ্চলে সংযুক্ত করে, সজ্জিত করে এবং ক্রোমোজোম বিচলনে সাহায্য করে। সেন্ট্রোমিয়ার সাধারণত ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য বরাবর বিভাজিত হয়। সেন্ট্রোমিয়ারে DNA পাওয়া যায়, এদের সেন্ট্রোমেরিক DNA বলে। সেন্ট্রোমিয়ারে একটি চাকতির ন্যায় প্রোটোপ্লাজমিক অংশ দেখতে পাওয়া যায়, একে **কাইনেটোকোর** বলা হয় (kinetochore)। সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের উপর ক্রোমোজোমের আকৃতি নির্ভর করে; যেমন মেটাসেন্ট্রিক, সাবমেটাসেন্ট্রিক, অ্যাক্রোমেন্ট্রিক এবং টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম।

প্রত্যেকটি ক্রোমোজোমে সাধারণত একটি সেন্ট্রোমিয়ার থাকে (মোনোসেন্ট্রিক)। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটি ক্রোমোজোমে একাধিক সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। যে সকল ক্রোমোজোমে দুটি সেন্ট্রোমিয়ার থাকে তাকে ডাইসেন্ট্রিক (dicentric) এবং দুইয়ের অধিক সেন্ট্রোমিয়ার থাকলে, তাকে পলিসেন্ট্রিক (polycentric) ক্রোমোজোম বলে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমের বিশেষ কোনও অংশে সেন্ট্রোমিয়ার অবস্থান না করে, সারা ক্রোমোজোমেই সেন্ট্রোমিয়ারের বৈশিষ্ট্য ছড়ানো থাকে। এই ধরনের সেন্ট্রোমিয়ারকে পরিব্যপ্ত সেন্ট্রোমিয়ার (diffused centromere) বলে। হেমিপ্টেরা গ্রুপের পতঙ্গদের ক্রোমোজোমে এইরূপ পরিব্যপ্ত সেন্ট্রোমিয়ার পাওয়া যায়।

সেন্ট্রোমিয়ারের আনুবীক্ষণিক গঠন (Ultrastructure of Centromere)

1968 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী ডু প্র (Du Praw) ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে সেন্ট্রোমিয়ারের গঠন দেখেন। তাঁর মতে 230 Å ব্যাস বিশিষ্ট প্রায় সাতটি ক্রোমাটিন তন্তু সেন্ট্রোমিয়ারের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়। সেন্ট্রোমিয়ারের স্ফিরিউলগুলি ক্রোমোজোম ও বেমতন্তুর মাইক্রোটিডবিউল গুলিকে জোড়া লাগাতে আঁঠার মত কাজ করে। জোকেলেনেন (Jokelanen, 1967)-এর মতে এই স্ফিরিউলগুলি ত্রিস্তর বিশিষ্ট (trilaminar) এবং প্রতি স্ফিরিউলের সঙ্গে মাইটোটিক বা মায়োটিক কোষ বিভাজনের সময় বেমতন্তুর চার থেকে সাতটি মাইক্রোটিবিউল যুক্ত থাকে।

(ঙ) ক্রোমোজোমের গৌণ সংকোচন (Secondary constriction) ঃ সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের মুখ্য সংকুচিত স্থান। এছাড়াও ক্রোমোজোমে আরও একটি সংকুচিত স্থান থাকে। একে ক্রোমোজোমের গৌণ সংকুচিত স্থান বলা হয়। এটি নানাভাবে উৎপন্ন হতে পারে; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, নিউক্লিওলার অরগানাইজার (nucleolur organizer) দ্বারা উৎপন্ন হয়। নিউক্লিওলাস ক্রোমোজোমের যে অংশে যুক্ত থাকে, সেই অঞ্চলটিকে নিউক্লিওলার অর্গানাইজিং অঞ্চল (nucleolar organizing region) বলে। কোষ বিভাজনের সময় যখন নিউক্লিওলাস অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন ক্রোমোজোমের যে স্থানে নিউক্লিওলাস সংযুক্ত ছিল, সেই স্থানটিতে একটি গৌণ সংকোচ তৈরী হয়। অনেক সময় গৌণ সংকোচ ক্রোমোজোমের একটি প্রান্তে হয় এবং এর ফলে একটি ক্ষুদ্র অংশের সৃষ্টি হয়, যা, বাকী অংশের সাথে কেবলমাত্র একটি সূক্ষ্ম তন্তুর দ্বারা সংযুক্ত থাকে। এই ক্ষুদ্র অংশটিকে ক্রোমোজোমের **স্যাটেলাইট** (Satellite) বলা হয়। যে ক্রোমোজোমে স্যাটেলাইট থাকে, তাকে স্যাট-ক্রোমোজোম (Sat-Chromosome) বলে।

(চ) টেলোমিয়ার (Telomere) ঃ ক্রোমোজোমের দুই বাহুর বিশেষ গুণসম্পন্ন প্রান্তদুটিকে **টেলোমিয়ার** বলে। 1938 খ্রিস্টাব্দে, মূলার (Muller) টেলোমিয়ার শব্দটি উদ্ভাবন করেন। গঠন এবং আচরণের দিক থেকে ক্রোমোজোমের অন্যান্য অংশগুলির সাথে এই প্রান্তদুটির যথেষ্ট পার্থক্য আছে। টেলোমিয়ার একটি ক্রোমোজোমকে অন্য ক্রোমোজোমের সাথে জোড়া লাগতে দেয় না। এবং এইভাবে এটি ক্রোমোজোমকে অক্ষুন্ন অবস্থায় থাকতে সাহায্য করে। এটি টেলোমিয়ারের একটি বিশেষ গুণ। কোনও ক্রোমোজোম ভেঙ্গে গেলে আবার জোড়া লাগতে পারে, কিন্তু ভাঙ্গা প্রান্তটি কখনও অন্য ক্রোমোজোমের টেলোমিয়ারের সঙ্গে জোড়া লাগতে পারে না। টেলোমিয়ারের অনুপস্থিতিতে ক্রোমোজোম অস্থায়ী হয়ে যায় এবং নষ্ট হয়েও যেতে পারে। টেলোমিয়ার হল বিশেষ ভাবে তৈরী একটি অঞ্চল যেটি নিউক্লিয়ার এনভেলাপ বা নিউক্লিয়াসের আবরণীর (nuclear envelope) সঙ্গে যুক্ত থাকে।

2.3.46 ইউক্যারিওটিক ক্রোমোজোমের আণবিক গঠন (The molecular structure of the Eukaryotic Chromosome)

প্রত্যেকটি ইউক্যারিওটিক ক্রোমোজোম একটি লম্বা দ্বিতন্ত্রী DNA অণু নিয়ে গঠিত এবং DNA-এর দ্বিগুণ পরিমাণ প্রোটিনও এতে থাকে। ক্রোমোজোম প্রকৃতপক্ষে DNA, ক্রোমোজোমাল প্রোটিন এবং RNA-এর দ্বারা তৈরী একটি যৌগ। এই যৌগটিকে বলা হয় ক্রোমাটিন (Chromatin)।

ক্রোমাটিন সাধারণত দুই প্রকারের হয়, **ইউক্রোমাটিন** (euchromatin) এবং **হেটারোক্রোমাটিন** (hetero-chromatin)। ইউক্রোমাটিন, রঞ্জকে হালকা ভাবে রঞ্জিত হয়। ইন্টারফেজ দশায় এটি অকুণ্ডলিত অবস্থায় থাকে কিন্তু মাইটোসিসে এটি কুণ্ডলীকৃত হতে থাকে। ইউক্রোমাটিনই বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই জিনোম তৈরী করে। অপরপক্ষে হেটারোক্রোমাটিন রঞ্জকে গাঢ় ভাবে রঞ্জিত হয়, কারণ এটি ইউক্রোমাটিনের থেকে বেশী কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে। ইউক্রোমাটিন জেনেটিক দিক থেকে সক্রিয় (এর বহনকারী জিনগুলি প্রকাশিত হয়) এবং হেটারোক্রোমাটিন জেনেটিক দিক থেকে নিষ্ক্রিয় হয় (কারণ এটি কোনও জীন বহন করে না, বা করলেও সেগুলি নিজেদের প্রকাশ করতে পারে না)।

প্রায় সমস্ত ইউক্যারিওটের সেন্ট্রোমিয়ার এবং টেলোমিয়ারে হেটারোক্রোমাটিন দেখতে পাওয়া যায়।

ক্রোমাটিনে, DNA-এর সঙ্গে দুটি প্রধান প্রোটিন দেখতে পাওয়া যায়। এদের একটি হিস্টোন (Histone) প্রোটিন এবং অন্যটি হল ননহিস্টোন প্রোটিন (Nonhistone)। ক্রোমোজোমের ভৌত গঠনে এই প্রোটিন দুটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

হিস্টোন প্রোটিন ঃ ক্রোমোজোমে হিস্টোন প্রোটিনের পরিমাণ সবথেকে বেশী থাকে। হিস্টোন হল একধরনের ক্ষুদ্র, ক্ষারীয় প্রোটিন, অর্থাৎ এরা ধনাত্মক হয়। এর ফলে হিস্টোন, ঋণাত্মক DNA-এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। হিস্টোন প্রোটিনে ২৩ শতাংশ লাইসিন এবং আর্জিনিন অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে।

ইউক্যারিওটিক DNA-তে 5 ধরনের হিস্টোন প্রোটিন থাকে— H_1, H_2, H_2B, H_3 এবং H_4। H_1 হিস্টোন প্রোটিন অন্য চার প্রকার হিস্টোন প্রোটিনের থেকে গঠন এবং কার্যের দিক থেকে পৃথক হয়।

ননহিস্টোন প্রোটিন ঃ DNA-এর সঙ্গে হিস্টোন ছাড়া অন্য যে ধরনের প্রোটিন থাকে, তা হল ননহিস্টোন প্রোটিন। এরা হিস্টোনের থেকে পরিমাণে কম থাকে। কিছু ননহিস্টোন প্রোটিন গঠনগত কাজ করলেও বেশীরভাগ ননহিস্টোন প্রোটিনই DNA-র প্রতিলিপি গঠনে, RNA তৈরীতে এবং প্রোটিন সংশ্লেষে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

হিস্টোন প্রোটিন, ননহিস্টোন প্রোটিনের থেকে ভিন্ন ধরনের হয়। ননহিস্টোন প্রোটিন হল অ্যাসিডিক প্রোটিন। তাই এরা বেসিক হিস্টোন প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

2.3.7 নিউক্লিওজোম মডেল (Nuclesome model)

প্রত্যেকটি ক্রোমোজোমের দ্বিতন্ত্রী DNA নিউক্লিয়াসের মধ্যে কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় থাকে। এখন প্রশ্ন হল, কি ভাবে, কিছু মাইক্রোমিটার ব্যাস যুক্ত নিউক্লিয়াসের মধ্যে কয়েক মিলিমিটার বা সেন্টিমিটার লম্বা ক্রোমোজোম কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, হিস্টোনগুলিকে কেন্দ্র করে DNA তার চারদিকে জড়িয়ে থাকে এবং মেটাফেজ দশায় তারা সবচেয়ে বেশী মাত্রায় কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে। DNA এবং প্রোটিনের এই গঠনকেই নিউক্লিওজোম বলা হয়। নিউক্লিওজোম DNA চার ধরনের হিস্টোন প্রোটিন নিয়ে গঠিত H_2A, H_2B, H_3 এবং H_4। নিউক্লিওজোমের কেন্দ্রে এই প্রত্যেকটি প্রোটিনের একটি করে প্রতিলিপি থাকে এবং একে হিস্টোন অক্টামার বলা হয়। একে দেখতে সিলিন্ডারের মত এবং এটি চওড়ায় 11 nm এবং 5·7 nm পুরু হয়। এই হিস্টোন অক্টামারে H_1 হিস্টোন প্রোটিনের কোনও ভূমিকা থাকে না। হিস্টোন অক্টামারের চারপাশে একটি সম্পূর্ণ এবং অপর একটি এক তৃতীয়াংশ পাকে 146 বেস পেয়ার DNA থাকে। H_1 হিস্টোন প্রোটিন নিউক্লিওজোমের কেন্দ্রে থাকে না। এটি নিউক্লিওজোমের চারিদিকে DNA-কে জড়িয়ে রাখতেও কোনোভাবে সাহায্য করে না। DNA যেস্থানে নিউক্লিওজোমে প্রবেশ করে এবং নিউক্লিয়াস থেকে বের হয়, ঠিক সেই স্থানে H_1 হিস্টোন প্রোটিন DNA-র সঙ্গে যুক্ত হয়। যে DNA, দুটি নিউক্লিওজোমকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে, তাকে লিঙ্কার (linker) DNA বলে।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গেছে যে DNA প্রোটিন যৌগে ক্রোমাটিন তন্তুগুলি 10 nm ব্যাসবিশিষ্ট হয়। ক্রোমাটিন তন্তুগুলিকে এই যন্ত্রের সাহায্যে পুঁতির মালার মত দেখায় (beads on a string), যেখানে পুঁতিগুলি হল নিউক্লিওজোম এবং পুঁতিগুলির মধ্যবর্তী সংযোগকারী সূতা হল লিঙ্কার DNA।

নিউক্লিওজোমের পরে উচ্চপর্যায়ে আমরা DNA-এবং প্রোটিনের যে যৌগটি পাই, তাতে ক্রোমাটিন তন্তুগুলি 30 nm ব্যাস বিশিষ্ট হয়। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা দেখান যে এর পরে আমরা 300 nm ব্যাস বিশিষ্ট ক্রোমাটিন

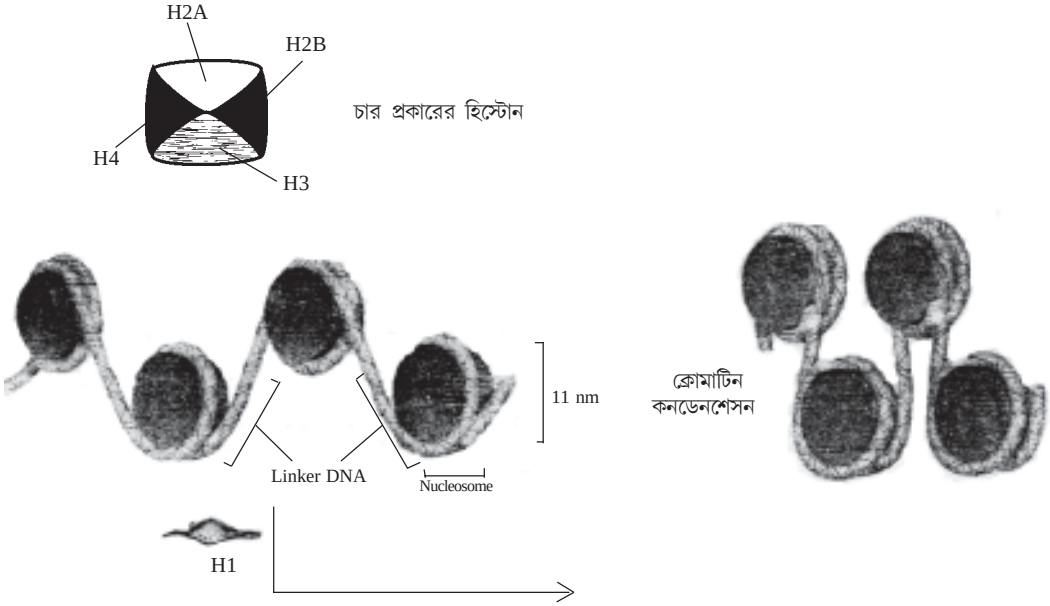

চিত্র 3.4 ঃ নিউক্লিওজোম মডেল

NSOU

তন্তু এবং সর্বপরি 700 nm ব্যাসবিশিষ্ট ক্রোমাটিন তন্তু পেতে পারি যেটা পর্যায়ক্রমে ইন্টারফেজ দশায় এবং মেটাফেজ দশায় দেখতে পাওয়া যায়।

মেটাফেজ ক্রোমোজোমে আমরা নিউক্লিওজোমের বদলে DNA-এর লুপের মত ডোমেন দেখতে পাই (looped domain)। প্রতিটি লুপে DNA-এর পরিমাণ 30000 থেকে 90000 bp হতে পারে। এই ডোমেনগুলি নন হিস্টোন প্রোটিন স্কেফোল্ডের (Scaffold) সঙ্গে যুক্ত থাকে।

নিউক্লিয়ার আবরণীর মধ্যে নিউক্লিয়ার ধাত্র (matrix) থাকে। ইন্টারফেজে ক্রোমাটিন এই ধাত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই ধাত্র প্রোটিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে তৈরী। এই ধাত্রের মধ্যে DNA, প্রোটিনের সঙ্গে MAR

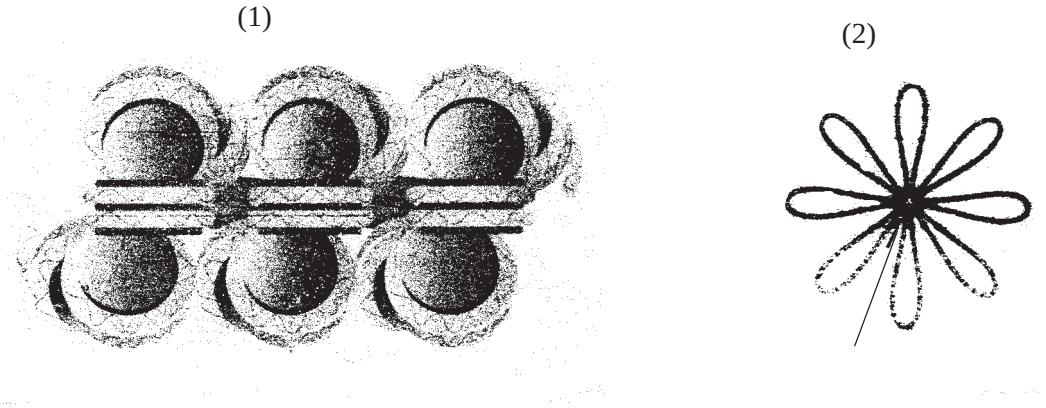

চিত্র 3.5 ঃ (1) নিউক্লিওজোমে 30 nm ব্যাস বিশিষ্ট ক্রোমাটিন তন্তু,
(2) মেটাফেজ ক্রোমোজোমের লুপের মত ডোমেন

(Matrix Attachment Regions) নামক একটি স্থানে যুক্ত থাকে। কোষের এই ধাত্রের মধ্যেই DNAর প্রতিলিপি গঠন এবং প্রোটিন সংশ্লেষের জন্য দরকারী উৎসেচকগুলি পাওয়া যায়।

2.3.8 কিছু অসাধারণ ক্রোমোজোম

এতক্ষণ ক্রোমোজোমের যে গঠনের কথা আলোচনা করা হল, তা মাইটোসিস ও মিয়োসিস কোষ বিভাজনের সময় সাধারণভাবে দৃষ্ট ক্রোমোজোমের গঠন। এই সাধারণ ক্রোমোজোম ছাড়া আরও কয়েক প্রকার অসাধারণ ক্রোমোজোম কোন কোন জীবের বিশেষ বিশেষ অংশে দেখা যায়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পলিটিন ক্রোমোজোম এবং ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোম।

● **পলিটিন ক্রোমোজোম ঃ** ডিপটেরা বর্গের কিছু পতঙ্গের (মাছি, মশা ইত্যাদি), কিছু নির্দিষ্ট কলায় (tissue) কোষের নিউক্লিয়াসগুলি আকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; একটি নিউক্লিয়াসের প্রতিটি ক্রোমোজোমের একের থেকে বেশী বার রেপ্লিকেশন বা প্রতিলিপি গঠনের ফলেই এইরূপ ঘটনা ঘটে। একে **এন্ডোপলিপ্লয়ডি** বলা হয়। এই ঘটনায় প্রতিটি নতুন ক্রোমোজোম তৈরী হওয়ার পর, সেটি পূর্বের ক্রোমোজোমটির থেকে পৃথক না হয়ে বরং পরপর লম্বালম্বিভাবে একসাথে জুড়ে থাকে। এর ফলে ক্রোমোজোমগুলি অত্যন্ত মোটা এবং লম্বা হয়। এই ক্রোমোজোমগুলিকেই **পলিটিন ক্রোমোজোম** বলে। সমান্তরাল ভাবে দ্বিত্বকরণ (parallel duplication) হওয়ার ফলেই এই ক্রোমোজোমগুলিকে পলিটিন ক্রোমোজোম বলা হয়।

পলিটিন ক্রোমোজোমগুলির ব্যাস সব জায়গায় এক হয় না, কোথাও সরু হয় আবার কোথাও ফুলে থাকে। সরু অংশটিকে ওয়েষ্ট (Waist) এবং ফোলা অংশটিকে পাফ (Puff) বলে।

পলিটিন ক্রোমোজোমগুলিতে আড়াআড়িভাবে সজ্জিত বহু ঘন ডোরা এবং হালকা বর্ণের আন্তরডোরা (bands and interbands) অঞ্চল থাকে। সাধারণ ক্রোমোজোম-রঞ্জকে কতকগুলি অঞ্চল কালো ফিতার মত ক্রোমোজোমের সারা প্রস্থ জুড়ে থাকে, এইগুলি হল ঘন ডোরা (Dark band) অঞ্চল। এই ঘন ডোরা অঞ্চলে অধিক পরিমাণে DNA এবং সামান্য পরিমাণ RNA ও প্রোটিন থাকে। এই অঞ্চলটি ইউক্রোমাটিন অঞ্চল। অপরপক্ষে হালকা আন্তরডোরা অঞ্চলটি হল তন্তুময়, হেটোরোক্রোমাটিন অঞ্চল এবং RNA ও প্রোটিনে সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলে স্বল্প পরিমাণ DNA থাকে।

বিভিন্ন প্রজাতিতে ব্যান্ডের সংখ্যার তারতম্য দেখা যায়, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে এই সংখ্যার কোনও তারতম্য হয় না, সেটি নির্দিষ্ট থাকে। ড্রসোফিলা নামক মাছির শূককীটের লালাগ্রন্থি কোষে আমরা পলিটিন ক্রোমোজোম দেখতে পাই। এদের ক্রোমোজোমে প্রায় 5000 ব্যাণ্ড আছে। কখনও কখনও ঘনডোরা (band) অঞ্চলগুলি ফুলে যায় এবং ক্রোমোজোম পাফ (Puff) সৃষ্টি করে। ক্রোমোজোমের এই পাফ সৃষ্টি হওয়া

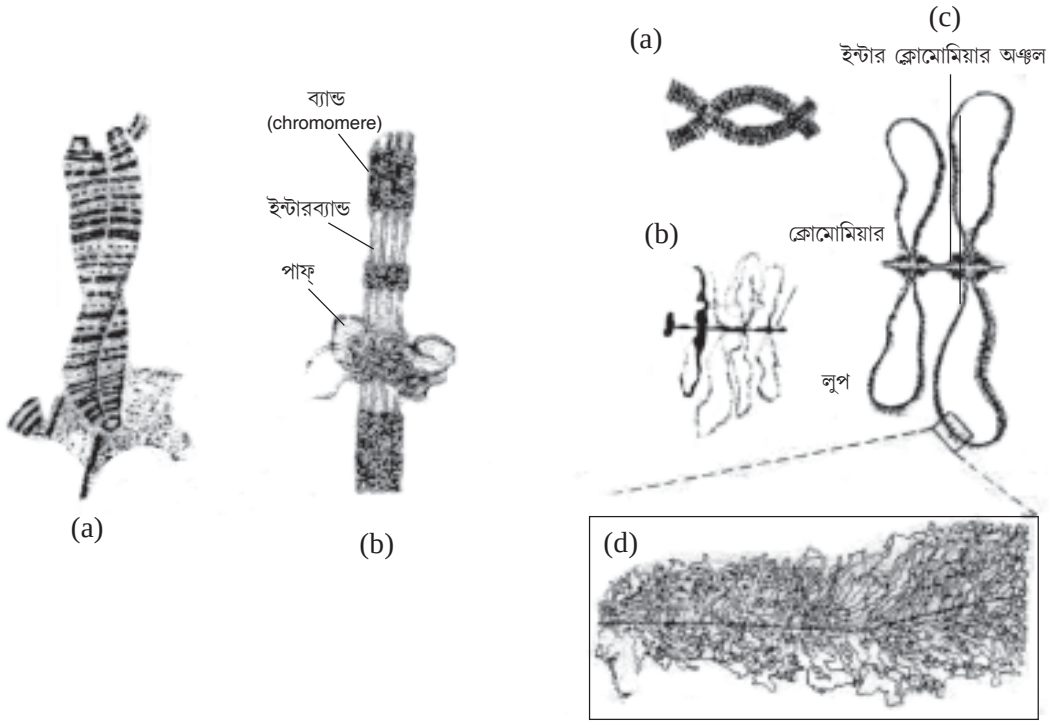

চিত্র 3.6 ঃ (1) (a) ড্রসোফিলা মাছির লার্ভার স্যালাইভারি ক্রোমোজোম;
(b) পলিটিন ক্রোমোজোমের সূক্ষতম গঠন
(2) *Triturus*-এর ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোমের সূক্ষতম গঠন;

NSOU

জীন নিয়ন্ত্রিত এবং চক্রাকারে সংঘটিত হয়। RNA এবং প্রোটিন সংশ্লেষের সঙ্গে এই পাক সৃষ্টির যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। নির্দিষ্ট স্থানে DNA কুণ্ডলীর প্যাঁচ খুলে যাওয়া, RNA-র সংশ্লেষ এবং এই RNA থেকে প্রোটিনের সঞ্চয় ইত্যাদি ঘটনার ফলেই ক্রোমোজোম পাফ সৃষ্টি হয়।

কখনও কখনও পলিটিন ক্রোমোজোমের ক্রোমোনিমাগুলি সারিবদ্ধভাবে বহু পার্শ্ব ভাঁজ সৃষ্টি করে। এই পার্শ্ব ভাঁজগুলি অঙ্গুরির মত বিন্যস্ত হলে তাকে বালবিয়ানি অঙ্গুরি (Balbiani ring) বলে। বালবিয়ানি অঙ্গুরিতে প্রচুর পরিমাণে DNA ও RNA থাকে। ক্রোমোজোম পাফের সৃষ্টি ও কাজ এবং বালবিয়ানি অঙ্গুরির সৃষ্টি ও কাজ একই প্রকারের।

ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোম (Lamp brush chromosome) ঃ

কিছু মেরুদণ্ডী প্রাণীর উসাইট (Oocyte) বা ডিম্বকোষে সঞ্চিত কুসুম (yolk) বেশী থাকে, তাদের ডিম্বকোষগুলি অনেক সময় ফুলে মোটা হয়ে যায় (সাধারণত বৃদ্ধি দশায়) এবং কোষের নিউক্লিয়াসও সাথে সাথে বড় হতে থাকে। এই সকল নিউক্লিয়াসে মিয়োটিক প্রফেজ দশার ক্রোমোজোমগুলি অসাধারণ লম্বা হয় এবং এদের পাশ থেকে অনেকগুলি পার্শ্ব ফাঁস (lateral loops) বিকীর্ণ হয়ে টেস্টটিউব ব্রাশের মত বিন্যস্ত থাকে। এইরূপ ক্রোমোজোমকে **ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোম** বলে। রূকার্ট (Ruckert) নামক এক বিজ্ঞানী 1892 খ্রিস্টাব্দে প্রথম এইরূপ ক্রোমোজোম আবিষ্কার করেন।

ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোমই লম্বায় সবচেয়ে বড় হয়। ইউরোডেল উসাইটে এটি প্রায় 5900 μm পর্যন্ত হয়। দ্বিতন্ত্রী ক্রোমোজোমের প্রতিটি ক্রোমোমিয়ার থেকে এক জোড়া পার্শ্ব ফাঁস তৈরী হয়। মিয়োটিক প্রোফেজের শেষের দিকে এই পার্শ্বফাঁসগুলি অবলুপ্ত হয়ে যায় এবং ক্রোমোজোমগুলি সংকুচিত হয়ে যায়। এই পার্শ্বফাঁসগুলিতে প্রচুর পরিমাণে RNA এবং প্রোটিনের বন্ধন পাওয়া গেছে, যেগুলি কোষ তার প্রয়োজনে ব্যবহার করে। এই RNAগুলি mRNA ধরনের। এই পার্শ্ব ফাঁসগুলির কাছেই প্রোটিন এবং কুসুম সংশ্লেষ হয়। এই সংশ্লেষিত বস্তুগুলি পার্শ্ব ফাঁস থেকে দূরে সরে যাবার পরেই পার্শ্বফাঁসগুলি সঙ্কুচিত হয়। বিজ্ঞানী গল এবং কালান (Gall and Callan) 1963-তে প্রথম এই অবস্থা লক্ষ্য করেন।

2.3.9 সারাংশ

জীবের বংশগতি নিয়ন্ত্রণে ক্রোমোজোমের ভূমিকা অপরিসীম। জীবের যে কোন প্রজাতিতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। দেহকোষ বা সোমাটিক কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা ডিপ্লয়েড (2n) এবং শুক্রাণু বা ডিম্বাণুতে ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্যাপ্লয়েড (n) হয়। ক্রোমোজোমে DNA-এর পরিমাণের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভিন্ন আকৃতির ক্রোমোজোম সৃষ্টি হয়।

আকৃতি অনুযায়ী ক্রোমোজোম চার প্রকারের হয়ে থাকে — মেটাসেন্টিক, সাব-মেটাসেন্ট্রিক, অ্যাক্রোসেন্ট্রিক এবং টেলোসেন্ট্রিক। একটি মেটাফেজ ক্রোমোজোমের গঠনে, ধাত্রবস্তুতে অবস্থিত অনেকগুলি পেঁচানো সূতোর মতো ক্রোমোনিমা দেখা যায়। বাইরের আবরণীর ন্যায় বস্তুটিকে বলে পেলিকল। ক্রোমোনিমাগুলি কতগুলি মাইক্রোফাইব্রিল নিয়ে গঠিত। মাইক্রোফাইব্রিলগুলি প্যারানেমিক অথবা প্লেক্টোনেমিক কুণ্ডলীতে থাকে।

ক্রোমোজোমের দুটি বাহুর সংযোগ স্থলকে সেন্ট্রোমিয়ার বলে। এটিই ক্রোমোজোমের মুখ্য সংকোচ। এছাড়াও ক্রোমোজোমে গৌণ সংকোচও দেখতে পাওয়া যায়। ক্রোমোজোমের দুই বাহুর বিশেষ গুণসম্পন্ন প্রান্ত দুটিকে টেলোমিয়ার বলা হয়।

ইউক্যারিওটিক ক্রোমোজোমের DNA, RNA এবং ক্রোমোজোমাল প্রোটিন নিয়ে একটি যৌগ গঠিত হয়,

যাকে ক্রোমাটিন বলা হয়। ক্রোমাটিন আবার দুই প্রকারের হয়, ইউক্রোমাটিন এবং হেটারোক্রোমাটিন। এই প্রোটিনগুলিকে DNA জড়িয়ে থাকে এবং নিউক্লিওজোম মডেল গঠন করে।

কয়েক প্রকার অসাধারণ ক্রোমোজোমের মধ্যে ল্যাম্পব্রাশ এবং পলিটিন ক্রোমোজোম অন্যতম।

2.3.10 প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) আকৃতি অনুযায়ী ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ করুন, সংক্ষেপে একটি মেটাফেজ ক্রোমোজোমের গঠন বর্ণনা করুন।

(২) ইউক্যারিওটিক ক্রোমোজোমের আণবিক গঠন চিত্রসহ আলোচনা করুন।

(৩) পলিটিন এবং ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোম সম্পর্কে যা জান লিখুন।

(৪) (ক) প্যারানেমিক এবং প্লেক্টোনেমিক কুণ্ডলী বলতে কি বোঝো? (খ) ক্রোমোজোমের মূখ্য এবং গৌণ সংকোচের মধ্যে তফাৎ কি? (গ) ইউক্রোমাটিন এবং হেটারোক্রোমাটিনের পার্থক্যগুলি লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারের আলট্রা গঠন বর্ণনা করুন।

(২) আকৃতি অনুযায়ী ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ করুন।

(৩) টেলোমিয়ারের বিশেষ ধর্মগুলি কি কি?

(৪) ক্রোমোজোমের স্যাটেলাইট বলতে কি বোঝেন ?

(৫) হিস্টোন এবং ননহিস্টোন প্রোটিনের ধর্মগুলি লিখুন।

(৬) পলিটিন ক্রোমোজোমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

(৭) ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোম বলতে কি বোঝো? এটি কোথায় দেখতে পাওয়া যায়?

একক 2.4 ❑ DNA এবং RNA-এর রাসায়নিক গঠন

গঠন

2.4.1 প্রস্তাবনা

2.4.2 **DNA**-এর ভৌত গঠন

2.4.3 **DNA**-ই বংশগতির ধারক এবং বাহক

2.4.4 রেপ্লিকেশন, ট্রান্সক্রিপশন এবং ট্রান্সলেশন

2.4.5 সারাংশ

2.4.6 প্রশ্নাবলী

2.4.1 প্রস্তাবনা

DNA এবং RNA হল ম্যাক্রোমলিকিউলস, অর্থাৎ তাদের আণবিক ওজন হল কমপক্ষে কয়েক হাজার ডালটন (1 ডালটন = $1{\cdot}67 \times 10^{-24}$ gm)। DNA এবং RNA চারটি ভিন্ন মনোমেরিক ইউনিট নিয়ে গঠিত। যাদের বলা হয় নিউক্লিওটাইডস। প্রত্যেকটি নিউক্লিওটাইড তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত ঃ (1) একটি পেন্টোজ সুগার, (2) একটি নাইট্রোজেন ঘটিত বেস এবং (3) একটি ফসফেট গ্রুপ।

RNA-এর পেন্টোজ সুগার হল রাইবোজ এবং DNA-এর হল ডি-অক্সিরাইবোজ।

নাইট্রোজেন ঘটিত বেস আবার দুই প্রকারের হয়, পিউরিন এবং পিরিমিডিন। DNA-এ তে অ্যাডেনিন (A) এবং গুয়ানিন (G) এই দুই ধরনের পিউরিন এবং থাইমিন (T) ও সাইটোসিন (C) এই দুই ধরনের পিরিমিডিন পাওয়া যায়। RNA-এ তে অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন এই তিনটিই থাকে। কিন্তু থাইমিনের স্থানে থাকে ইউরাসিল (U)।

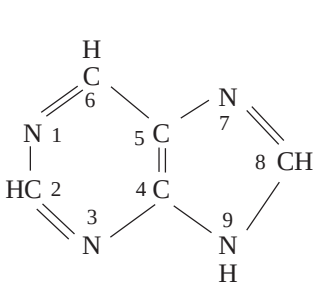

পিউরিন
(Purine)

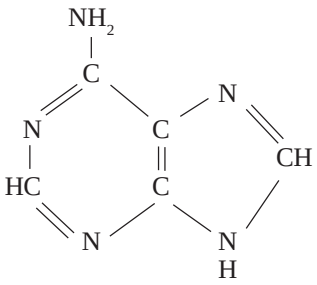

অ্যাডেনিন
(Adenine)

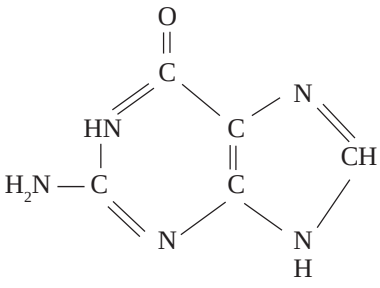

গুয়ানিন
(Guanine)

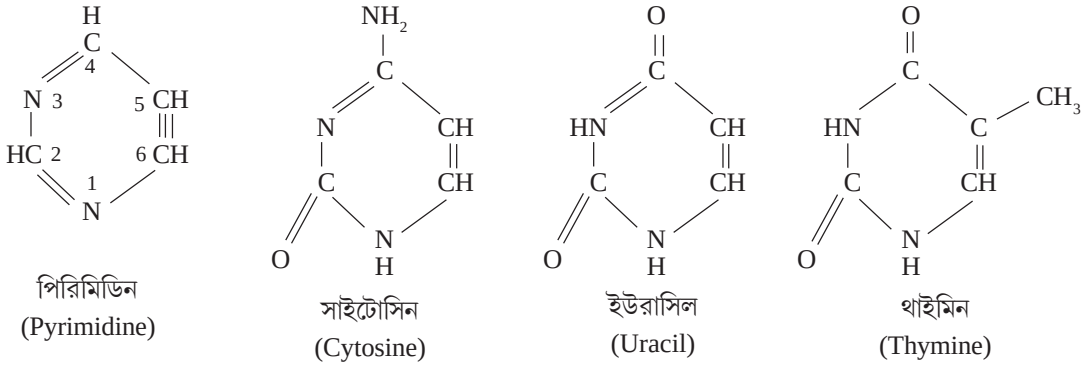

চিত্র 4.1 ঃ DNA এবং RNA-এ তে নাইট্রোজেন ঘটিত বেসের গঠন

একটি নিউক্লিওটাইড, যা দিয়ে বস্তুত DNA এবং RNA গঠিত, আগেই বলা হয়েছে যে তা একটি সুগার, একটি নাইট্রোজেন গঠিত বেস এবং একটি ফসফেট গ্রুপ নিয়ে গঠিত। নাইট্রোজেন গঠিত বেস এবং সুগারকে একত্রে নিউক্লিওসাইড বলা হয়। সুতরাং একটি নিউক্লিওটাইডকে আমরা একটি নিউক্লিওসাইড ফসফেট ও বলতে পারি। DNA-এর চারটি ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড সাবইউনিট হল— ডিঅক্সিঅ্যাডিনোসিন 5′–মোনোফসফেট (dAMP), ডিঅক্সি গুয়ানোসিন 5' মোনোফসফেট (dGMP), ডিঅক্সিসাইটিডিন 5'– মোনোফসফেট (dCMP) এবং ডিঅক্সিথাইমিডিন 5' মোনোফসফেট (dTMP)। RNA-এর চারটি রাইবোনিউক্লিওটাইড সাবইউনিট হল অ্যাডিনোসিন 5'-মোনোফসফেট (AMP), গুয়ানোসিন 5'-মোনোফসফেট (GMP), সাইটিডিন 5' মোনোফসফেট (CMP), এবং ইউরিডিন 5'- মোনোফসফেট (UMP)।

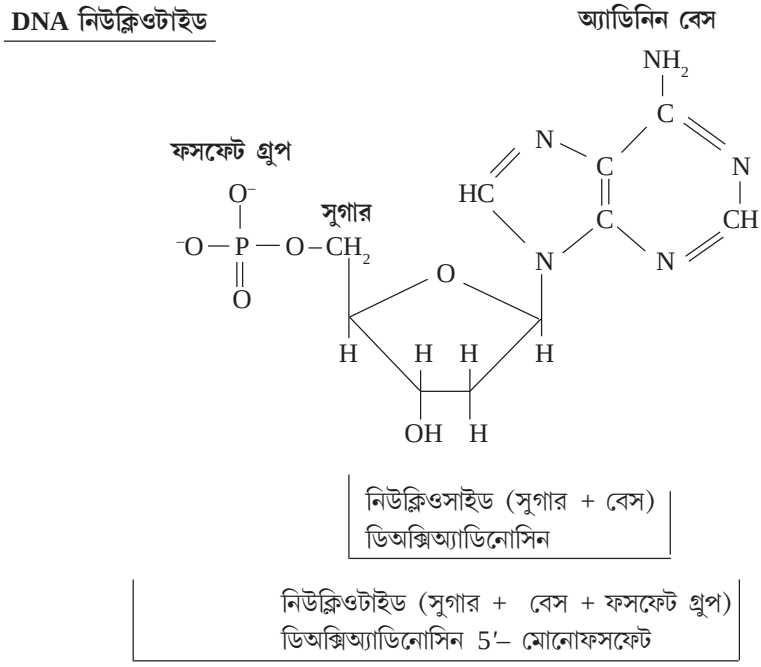

NSOU

RNA নিউক্লিওটাইড

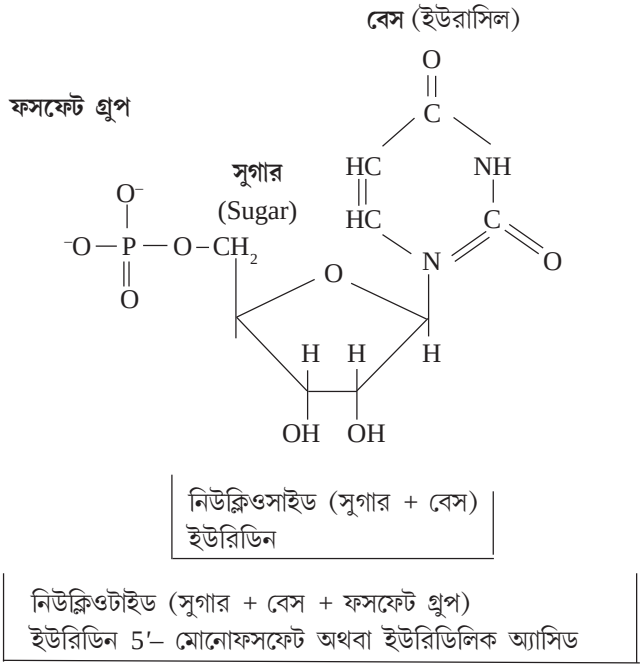

চিত্র 4.2 ঃ DNA এবং RNA-এর রাসায়নিক গঠন

DNA অথবা RNA-এর নিউক্লিওটাইডগুলি সুগার এবং ফসফেট গ্রুপের মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরের সহিত যুক্ত হয়ে পলিনিউক্লিওটাইড গঠন করে। যে বন্ধনের মাধ্যমে সুগার এবং ফসফেট গ্রুপগুলি একে অন্যের সহিত যুক্ত হয়, তা হল কোভ্যালেন্ট বন্ধন (covalent bond)। প্রকৃতপক্ষে একটি নিউক্লিওটাইডের ফসফেট গ্রুপ অপর একটি নিউক্লিওটাইডের পেন্টোজ সুগারের সহিত যুক্ত হয়ে ফসফোডাইএস্টার বন্ধন গঠন করে।

2.4.2 DNA-এর ভৌত গঠন (Physical Structure) ঃ দ্বিতন্ত্রী নক্সা

১৯৫৩ সালে জেমস ডি. ওয়াটসন এবং ফ্রান্সিস এইচ. সি. ক্রিক (James D. Watson and Francis H.C. Crick) সর্বপ্রথম DNA-এর ভৌত এবং রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে তাঁদের নক্সা (model) প্রকাশ করেন। তাঁদের মডেল অনুসারে প্রায় সমস্ত DNA-ই দুটি পলিনিউক্লিওটাইড চেইন (polynucleotide chain) দিয়ে তৈরী। এই চেইন দুটি ঘোরানো সিঁড়ির মত ডান দিকে প্যাঁচ দেওয়া থাকে এবং এদের প্রত্যেকটির ব্যাস হল 2 nm। এই চেইন দুটি বিপরীত পোলারিটি (antiparallel) দেখায় অর্থাৎ একে অন্যের পরিপূরক। DNA-এর দুটি চেইনের বাইরের দিকে থাকে সুগার এবং ফসফেট। ভিতরের দিকে থাকে নাইট্রোজেন ঘটিত বেস। দুটি বিপরীত দণ্ডের বেসগুলি একে অন্যের সঙ্গে দুর্বল হাইড্রোজেন বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে। A অর্থাৎ অ্যাডিনিন সবসময় T অর্থাৎ থাইমিনের সঙ্গে এবং গুয়ানিন (G) সবসময় সাইটোসিনের (C) সঙ্গে মিলিত হতে পারে। A, T-এর সঙ্গে দুটি এবং G, C-এর সঙ্গে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ধনের দ্বারা যুক্ত হয়। এক একটি দণ্ডে দুটি বেস পেয়ার 0·34 nm দূরত্বে থাকে। প্রতিটি ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড পরস্পর 36^0 কোণ করে অবস্থান করে এবং এক একটি প্যাঁচে ১০টি করে বেস পেয়ার (base pairs) থাকে।

(A) Molecular model (B) Stylized diagram (C) Chemical Structure

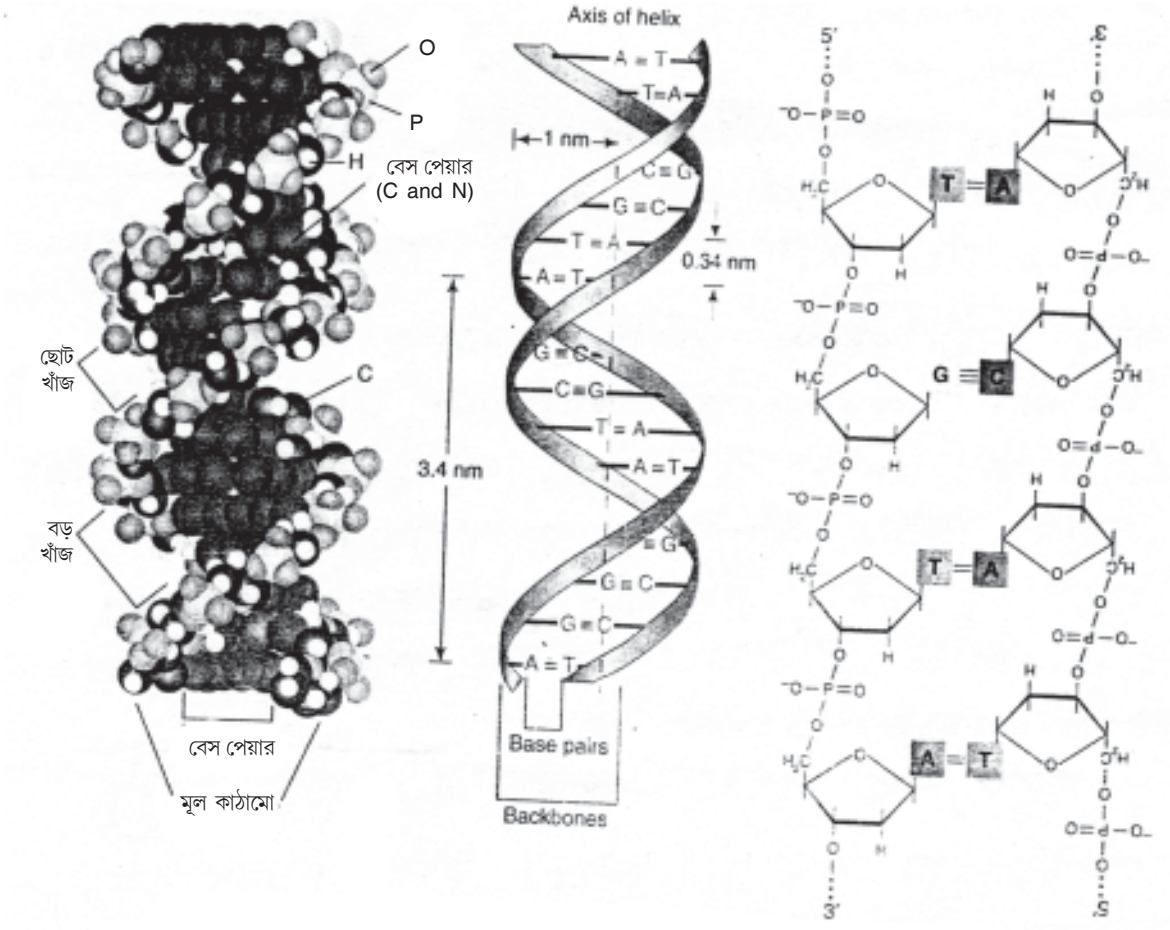

চিত্র 4.3 ঃ DNA-এর আণবিক গঠন ঃ ওয়াটসন ও ক্রিক-এর দ্বি-কুণ্ডলী নক্সা

X-রে ডিফ্রেক্সান (X-ray diffraction) থেকে আমরা DNA-এর ভিন্ন রূপ, যেমন A-রূপ, B-রূপ প্রভৃতি দেখতে পাই। যখন আদ্রতা খুব বেশী থাকে, DNA তখন B-DNA হিসেবে এবং যখন আর্দ্রতা খুব কম থাকে, তখন A-DNA হিসেবে থাকে। এই দুই ধরনের DNA-ই ডান দিকে প্যাঁচ করে থাকে। আর এক ধরনের DNA আমরা দেখতে পাই, তা হল Z-DNA, যা বাম দিকে প্যাঁচ করে থাকে।

2.4.3 DNA-ই বংশগতির ধারক এবং বাহক (DNA-the genetic material)

(ক) **গ্রিফিথের পরীক্ষা** (Experiment by Griffith) ঃ গ্রিফিথ 1928 সালে ডিপ্লোকক্কাস নিউমোনি (*Diplococcus pneumoniae*) নামক নিউমোকক্কাস ব্যাকটিরিয়ার উপর পরীক্ষা চালান। এই ব্যাকটিরিয়ার

কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের উপর 1920 সাল থেকে গবেষণা চলছিল। এই ব্যাকটিরিয়ার দুটি নির্দিষ্ট টাইপ (type) ছিল। S - টাইপ এবং R - টাইপ। S - টাইপের ব্যাকটিরিয়ার পলিস্যাকারাইডের ক্যাপসুলে আবৃত কোষ প্রাকার থাকে। এর ফলে এদের কলোনী মসৃণ এবং চকচকে দেখায় এবং এরা মারাত্মক ক্ষতিকারক (Virulent) হয়। R-টাইপের ব্যাকটিরিয়ার ক্যাপসুল থাকে না এবং এর ফলে এদের দেহ অমসৃণ বা Rough হয় এবং এরা কম ক্ষতিকারক বা ক্ষতিকারক নয় (avirulent)।

চিত্র 4.4 ঃ ব্যাকটিরিয়া ডিপ্লোকক্কাস নিউমনির ইলেকট্রন মাইক্রোগ্রাফ

S type কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, II S এবং III S-এ। S টাইপ আবার পরিব্যক্তি বা মিউটেশনের মাধ্যমে R টাইপে পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু R টাইপ সহজে S টাইপ-এ পরিবর্তিত হতে পারে না। S টাইপ যখন R টাইপে পরিবর্তিত হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে যদি ঐটি II S থাকে, তখন সেটি R টাইপে পরিবর্তিত হয়ে II S-ই থাকবে, III S হবে না।

1928 সালে গ্রিফিথ, টাইপ II S থেকে পরিব্যক্তির দ্বারা পরিবর্তিত R টাইপ ব্যাকটিরিয়া একটি ইঁদুরে ইনজেকশনের দ্বারা প্রবিষ্ট করান। এই R টাইপ ব্যাকটিরিয়া ইঁদুরটির কোন ক্ষতি করতে পারে না এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ইঁদুরটির রক্তে এই ব্যাকটিরিয়া অদৃশ্য হয়ে যায়। এরপর গ্রিফিথ জীবন্ত III S - টাইপ ইঁদুরে প্রবিষ্ট করান এবং এর ফলে ইঁদুরগুলি মরে যায়। যদি টাইপ III S ব্যাকটিরিয়াকে তাপ দিয়ে মেরে ফেলে, তার পর ইঁদুরগুলিতে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রবিষ্ট করান হয়; তাহলে ইঁদুরগুলি জীবিত থাকে। এই পরীক্ষাগুলি থেকে এটা প্রমাণ হয় যে একমাত্র সেই ব্যাকটিরিয়াগুলিই সংক্রমণ ঘটাতে পারে, যাদের পলিস্যাকারাইড আবৃত কোষ প্রাকার থাকে।

সবশেষে, গ্রিফিথ জীবন্ত R ব্যাকটিরিয়া (যা টাইপ II S থেকে পরিবর্তিত) এবং তাপ প্রদানে মৃত টাইপ III S ব্যাকটিরিয়ার একটি মিশ্রণ তৈরী করেন এবং ইনজেকশনের মাধ্যমে ইঁদুরে প্রবিষ্ট করান। এই ক্ষেত্রে ইঁদুরগুলি মারা যায় এবং এদের রক্তে জীবন্ত S - ব্যাকটিরিয়া দেখতে পাওয়া যায়। এই ব্যাকটিরিয়াগুলি সবই ছিল III S টাইপের। এই ব্যাকটিরিয়াগুলি R ব্যাকটিরিয়া থেকে পরিব্যক্তির দ্বারা পরিবর্তিত হয় নি। গ্রিফিথ মন্তব্য করেন যে কিছু R ব্যাকটিরিয়া কোন প্রকারে মসৃণ, সংক্রমক III S টাইপে পরিবর্তিত হয়েছে এবং এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে মৃত III S টাইপের সঙ্গে সংযোগের মাধ্যমে। এই পরিবর্তিত III S টাইপগুলি তাদের সংক্রমণ ধর্ম

বজায় রাখে এবং এর থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এই পরিবর্তন বা ট্রান্সফরমেশন (transformation) হল স্থায়ী। গ্রিফিথ ভেবেছিলেন, যে কোনো অজানা জিনিস (প্রোটিন) এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী এবং তিনি এটিকে বলেছিলেন ট্রানসফরমিং প্রিন্সিপল (transforming principle) বা স্থানান্তরিত বস্তু।

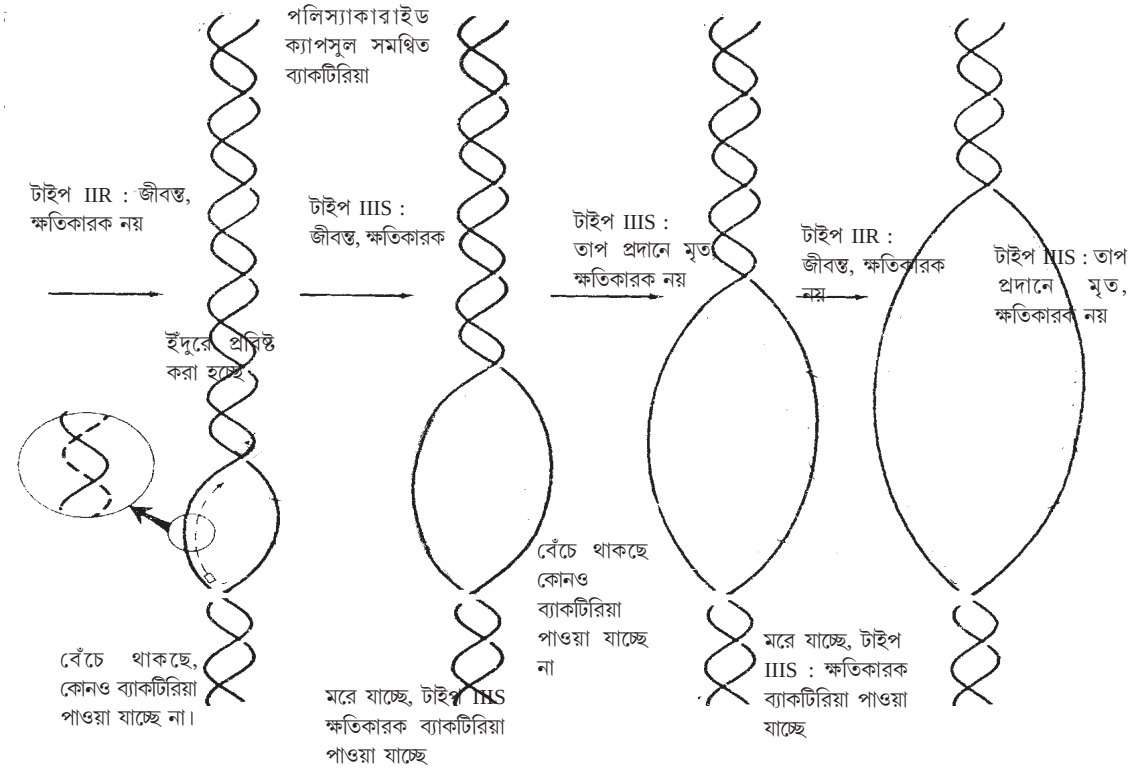

চিত্র 4.5 ঃ গ্রিফিথের পরীক্ষা ঃ

ইঁদুরটিকে টাইপ III S নিউমোকক্কাস ব্যাকটিরিয়া দ্বারা ইনজেক্ট করলে ইঁদুরটি মারা যায়। অপরপক্ষে ইঁদুরকে টাইপ II R অথবা তাপ প্রদানে মৃত টাইপ III S ব্যাকটিরিয়া দ্বারা ইনজেক্ট করলে ইঁদুরগুলি বেঁচে থাকে। যখন ইঁদুরগুলিকে জীবন্ত টাইপ II R ব্যাকটিরিয়া ও তাপ প্রদানে মৃত টাইপ III S ব্যাকটিরিয়ার মিশ্রণ দ্বারা ইনজেক্ট করা হয়, ইঁদুরগুলি মারা যায়।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এবং বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা তাঁদের মতামত প্রকাশ করেন এবং বলেন যে তাপ প্রবাহের মাধ্যমে ভিরুলেন্ট ব্যাকটিরিয়ার বংশগতির কিছু বস্তু নষ্ট হয়নি এবং এইগুলি জীবন্ত অক্ষতিকারক ব্যাকটিরিয়ায় রিকম্বিনেশনের (recombination) মাধ্যমে প্রবেশ করে এবং পরিবর্তিত ক্ষতিকারক ব্যাকটিরিয়ায় পরিবর্তিত হয়।

(খ) **আভেরী, ম্যাকলিওড ও ম্যাক্‌কার্টির পরীক্ষা** (Experiment by Oswald T. Avery, Colin. M. MacLeod and Maclyn McCarty) ঃ 1944 খ্রিস্টাব্দে আভেরী, ম্যাকলিওড ও ম্যাককার্টি দেখান যে DNAই হল বংশগতির বাহক। তারা টেস্টটিউবে R টাইপ থেকে S টাইপের পরিবর্তন লক্ষ্য করেন এবং গ্রিফিথের

NSOU

পরীক্ষার স্থানান্তরিত বস্তুটি যে DNA ছাড়া কিছুই নয় সেটি প্রমাণ করেন। তাঁদের পরীক্ষায় তাঁরা টাইপ (type) III S ব্যাকটিরিয়ার কোষ থেকে লিপিড, পলিস্যাকারাইড, প্রোটিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিড DNA এবং RNA নিষ্কাশিত করেন এবং পরীক্ষা করে দেখান যে, এদের মধ্যে কোনটি হল সেই পরিবর্তিত বস্তু যেটা II S টাইপ থেকে জীবন্ত R টাইপ ব্যাকটিরিয়া হতে সাহায্য করে। তাঁরা এটা প্রমাণ করেন যে নিউক্লিক অ্যাসিডই হল সেই পরিবর্তিত বস্তু যেটি টাইপ III S-এ ছিল এবং যেটি R টাইপ থেকে III S টাইপে পরিবর্তিত হতে সাহায্য করে।

অ্যাভেরী এবং তাঁর বন্ধুরা তারপর নির্দিষ্ট উৎসেচক নিউক্লিয়েজ ব্যবহার করেন যেটি নিউক্লিক অ্যাসিডকে ভেঙ্গে দেয়। তাঁরা এটি এই জন্যই ব্যবহার করেন যে তাঁরা তখনও জানতেন না যে DNA অথবা RNA কোনটি সেই পরিবর্তিত বা স্থানান্তরিত বস্তু ছিল। তাঁরা প্রথমে নিউক্লিক অ্যাসিডের সাথে রাইবোনিউক্লিয়েজ (RNase) মেশান, যেটি RNA-কে ভেঙ্গে দেয় কিন্তু DNA ঠিক থাকে। তখন তাঁরা দেখেন যে ব্যাকটিরিয়ার পরিবর্তন সক্রিয় রয়েছে। তারপর তাঁরা যখন ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিয়েজ (DNase) উৎসেচক ব্যবহার করেন; যেটা DNA-কে ভেঙ্গে দেয়, তখন তারা দেখেন যে ব্যাকটিরিয়ার পরিবর্তন (transformation) হচ্ছে না। সুতরাং এই পরীক্ষা থেকে তাঁরা প্রমাণ করেন যে **DNAই হল সেই পরিবর্তিত বস্তু।** যদিও অ্যাভেরীদের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিন্তু তাঁদের কাজের অনেক সমালোচকও ছিলেন। কারণ ব্যাকটিরিয়া থেকে যে নিউক্লিক অ্যাসিড নিষ্কাশিত করা হয়েছিল, সেটা পুরোপুরি শুদ্ধ ছিল না, কিছু প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিডের সাথে মিশ্রিত ছিল।

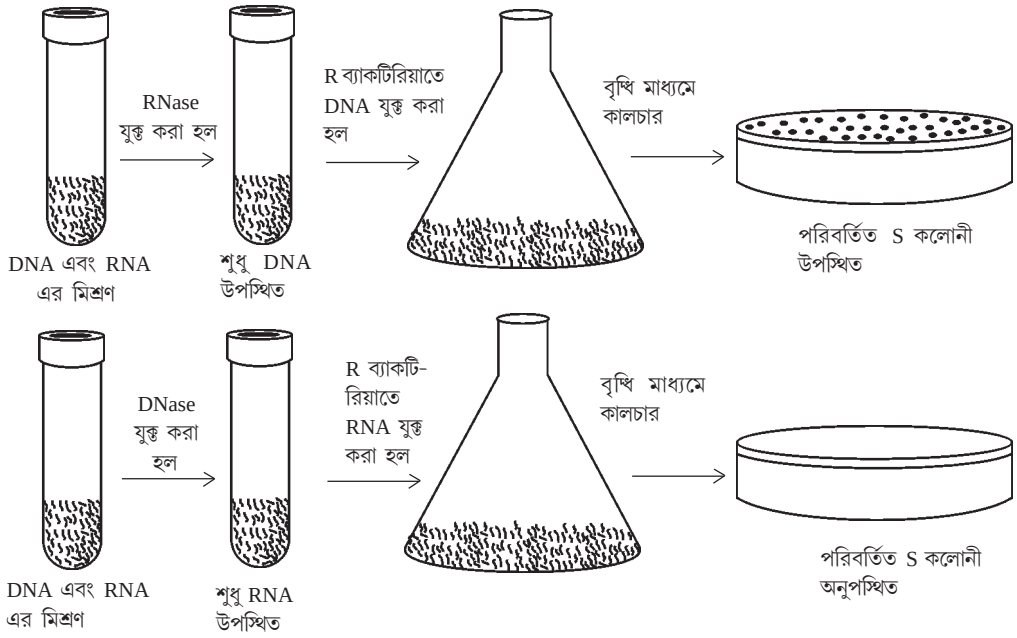

চিত্র 4.6 ঃ উপরের পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে RNA নয়, DNA-ই হল পরিবর্তিত বস্তু।

(গ) **হার্সে এবং চেজের পরীক্ষা** (Experiments by Alfred D. Hershey and Martha Chase) ঃ 1953 সালে হার্সে এবং চেজ আবার পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন যে DNA-ই হল বংশগতির বাহক। তারা ব্যাকটিরিওফাজ T2 (Bacteriophage T2) -কে তাদের কাজের জন্য বেছে নেন। এই ফাজ এসচেরিচিয়া কোলি (*Escherichia coli*) নামক ব্যাকটিরিয়াকে আক্রমণ করে এবং এদের মাধ্যমেই বংশ বিস্তার করে।

হার্সে এবং চেজ, ই. কোলি ব্যাকটিরিয়াকে একটি কালচার মিডিয়ামে বর্ধিত করেন যার মধ্যে তাঁরা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ, যথাক্রমে P^{32} এবং S^{35} প্রয়োগ করেন। P^{32} হল ফসফরাসের এবং S^{35} হল সালফারের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। তাঁরা এই আইসোটোপগুলি একটি নির্দিষ্ট কারণে ব্যবহার করেন। কারণ DNA-এতে ফসফরাস এবং প্রোটিনে সালফার থাকে। তারা এই ব্যাকটিরিয়াগুলিকে T2 ফাজ দ্বারা সংক্রমণ করান এবং এর থেকে যে ফাজগুলি বংশবিস্তারের মাধ্যমে তৈরী হয়, তাদের সংগ্রহ করেন। এর থেকে তাঁরা দু ধরনের ফাজ পান। কিছু ফাজের প্রোটিনে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ S^{35} ছিল এবং কিছু ফাজের DNA-এতে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ P^{32}

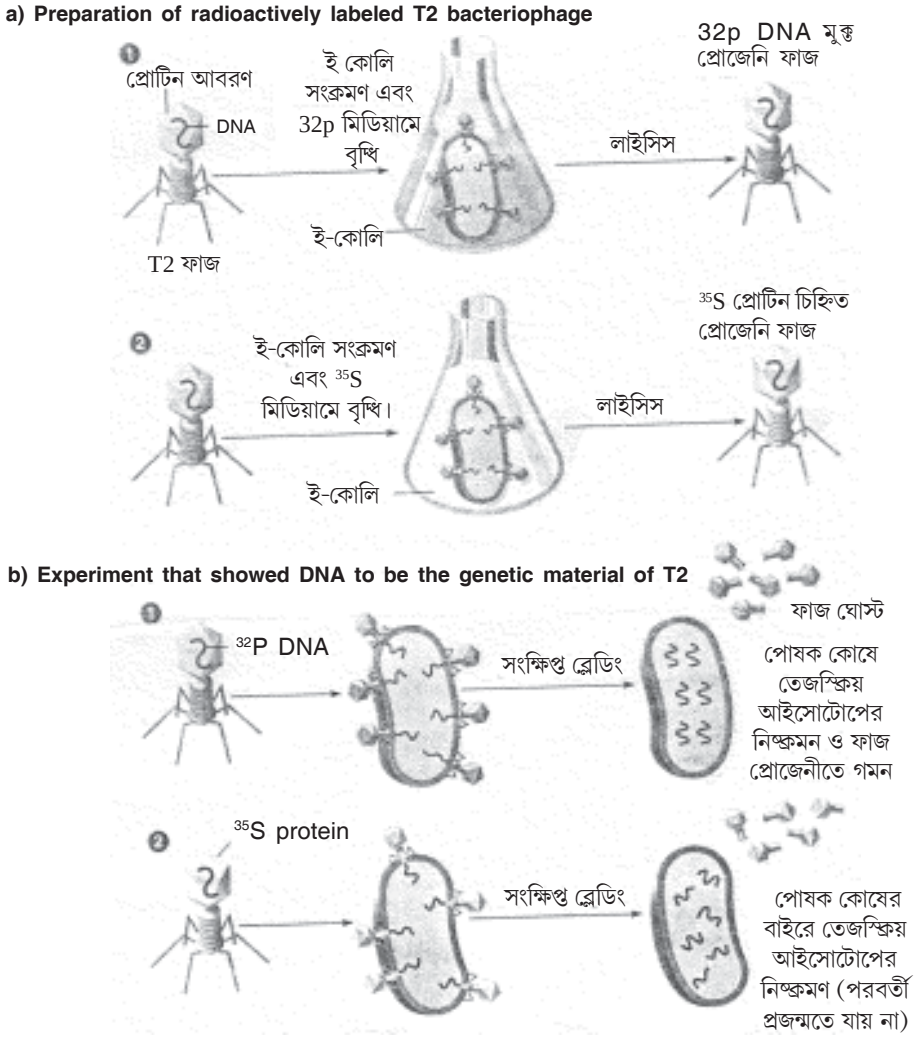

চিত্র 4.7 ঃ হার্সে এবং চেজের পরীক্ষা (a) (1) P^{32} যুক্ত DNA অথবা (2) S^{35} যুক্ত প্রোটিন দ্বারা T2 ফাজ তৈরী করা। (b) DNA-ই যে বংশগতির বাহক সেটাই এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়।
(1) P^{32} যুক্ত আইসোটোপ ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে পাওয়া যায়।
(2) S^{35} যুক্ত আইসোটোপ ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে পাওয়া যায় না।

চিত্র। সেজন্য তাঁরা আশা করেছিলেন যে T2 ফাজের মধ্যে DNA এবং প্রোটিন দুটোই আছে, সুতরাং এদের মধ্যে কোন একটি অবশ্যই হবে DNA নয় প্রোটিন হল জেনেটিক বস্তু।

এর পর তাঁরা কিছু ই. কোলি ব্যাকটিরিয়াকে এই দুই ধরনের ফাজ দ্বারা সংক্রমণ করান। তাঁরা লক্ষ করেন যে, যখন তারা P^{32} তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ যুক্ত ফাজ দ্বারা সংক্রমণ করান, সংক্রমণের কিছুক্ষণ পরেই ঐ তেজস্ক্রিয়তা ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। তারপর কিচেন ব্লেন্ডার (Kitchen blender) দিয়ে পোষক দেহের বাইরে লেগে থাকা ফাজের দেহাবশিষ্টাংশ ছাড়িয়ে, পোষককোষ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলা হয়। কিন্তু এদের মধ্যে P^{32} তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ছিল না। অপরপক্ষে, যখন তাঁরা কিছু ই. কোলি ব্যাকটিরিয়াকে S^{35} তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ যুক্ত ফাজ দ্বারা সংক্রমণ করান, ব্যাকটিরিয়ার দেহে কোন তেজস্ক্রিয়তা লক্ষ করা যায় না। বেশির ভাগ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপই পোষকদেহের বাইরে লেগে থাকা ফাজের দেহাবশিষ্টাংশে খুঁজে পাওয়া যায়। সুতরাং এই পরীক্ষা থেকে বোঝা যায় যে ফাজ-এর প্রোটিন আবরণীতে S^{35} চিহ্নিত বাইরেই থাকে এবং ব্যাকটিরিয়ার দেহে P^{32} যুক্ত হয়েছে। এই ব্যাকটিরিয়ার দেহ বিদীর্ণ করে যে সব নব ফাজের সৃষ্টি হয়, তাদের DNA-তেও P^{32} থাকে।

এই পরীক্ষা থেকে একটি কথা স্পষ্ট যে [illegible] DNA বস্তু পোষক দেহে প্রবেশ করে কিন্তু সকল প্রোটিন বস্তু পোষক দেহের বাইরে থেকে যায়। সুতরাং প্রোটিন বস্তু বংশগতির বাহক হতে পারে না। কেবলমাত্র [illegible] DNA-ই ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে। পোষক কোষের মধ্যে [illegible] নতুন ফাজকণার সংশ্লেষণ ঘটিয়ে থাকে। তখন তার [illegible] কেবল DNA দ্বারা তৈরি থাকে। পরে প্রতিটি DNA এককের চারপাশে প্রোটিন আবরণী তৈরি হয়। এভাবে পূর্ণাঙ্গ [illegible] সংক্রমণকারী P^{32} চিহ্নিত DNA যুক্ত ফাজের সৃষ্টি হয়। সুতরাং DNA-ই হল বংশগতির বাহক।

চিত্র 4.8 ঃ টোবাকো মোজাইক ভাইরাস (TMV) RNA-ই বংশগতির বাহক

RNA বংশগতির বাহক ঃ

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করেছি, তাতে বলা হয়েছে DNA হল বংশগতির বাহক। কিন্তু কিছু ব্যাকটিরিয়াল ভাইরাস (উদাঃ QB), কিছু প্রাণীর ভাইরাস (উদাঃ পোলিও ভাইরাস) এবং কিছু গাছের ভাইরাস (উদাঃ টোবাকো মোজেক ভাইরাস) আছে, যাদের বংশগতির বাহক হল RNA।

নিম্নলিখিত পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে টোবাকো মোজেক ভাইরাসে RNA-ই হল বংশগতির বাহক। এই ভাইরাস তামাক গাছের পাতায় ক্ষতের সৃষ্টি করে।

T2 ফাজের মত TMV ভাইরাসও RNA এবং প্রোটিন নিয়ে গঠিত। RNA কোরের চারিদিকে প্রোটিন ঘেরা থাকে এবং এই প্রোটিন RNA-কে নিউক্লিয়েজ উৎসেচক থেকে রক্ষা করে।

1956 সালে জিরার এবং সারাম (A. Gierer and G. Schramm) পরীক্ষা করে দেখান যে TMV ভাইরাসের RNA (প্রোটিন কোট ছাড়া) দ্বারা কোনো তামাক গাছকে সংক্রমণ করা হলে তারা তামাক গাছের যে ক্ষতি করে তা দেখতে পুরোপুরি ভাইরাস আক্রমণ করলে যেমন হয়, ঠিক সেইরূপ। কিন্তু যদি নিউক্লিয়েজ উৎসেচক দ্বারা RNA-কে ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং তার পরে যদি সেটি কোনোও তামাক গাছকে সংক্রমণ করে তাহলে তামাক গাছের কোনও ক্ষতি হয় না। এই পরীক্ষার ফলাফল থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে TMV ভাইরাসে RNA-ই হল বংশগতির বাহক।

1957 সালে কনরাট এবং সিঙ্গার (Cornat and Singer) পূনরায় প্রমাণ করেন যে RNA-ই হল বংশগতির বাহক। তাঁরা দুটি ভিন্ন TMV স্ট্রেন (strain) নেন এবং একটির থেকে RNA এবং অন্যটির থেকে প্রোটিন আলাদা করেন এবং একটির প্রোটিন থেকে RNA এবং অন্যটির RNA থেকে প্রোটিন তৈরী করেন। তাঁরা তারপর তামাক পাতাকে এই দুই ধরনের সংকর ভাইরাসের দ্বারা সংক্রমণ করান। সংক্রমণের পরে যে ভাইরাসগুলি ক্ষত থেকে আলাদা করা হয় তাদের টাইপ RNA-এর মতই হয়, প্রোটিনের মত নয়। এই ফলাফল থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে TMV (Tobaco Mosaic Virus) ভাইরাসে RNA-ই হল বংশগতির বাহক।

টোবাকো মোজেইক ভাইরাস একটি RNA কোর এবং তার চারিদিকের প্রোটিন নিয়ে তৈরী। একটি ভাইরাসের স্ট্রেন থেকে প্রোটিন এবং অন্য একটি স্ট্রেন থেকে RNA নিয়ে একটি শংকর ভাইরাস তৈরী করা হয়। এই ভাইরাস দ্বারা টোবাকো পাতার সংক্রমণ করা হয় এবং সংক্রমণের পরে যে ভাইরাসগুলি ক্ষতস্থান থেকে পাওয়া যায় তাদের টাইপ RNA-র মতই হয়; প্রোটিনের মত নয়। এর থেকে বোঝা যায় যে প্রোটিন নয়, RNA-ই বংশগতির বাহক।

বংশগতির বাহকের কিছু ধর্ম ঃ

এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, DNA এবং কিছু ক্ষেত্রে RNA উভয়েই বংশগতির বাহক হতে পারে। এদের প্রধান ধর্মগুলি হল —

- নির্ভুল প্রতিলিপি গঠন (replication) করার ক্ষমতা,
- পৃথকীভবন এবং পূনর্মিলন হবার ক্ষমতা,
- সঙ্করায়ন হবার ক্ষমতা,
- মিউটেশন, সংশ্লেষণ ও মেরামত করার ক্ষমতা ইত্যাদি।

2.4.4 DNA রেপ্লিকেশন, ট্রান্সক্রিপশন এবং ট্রান্সলেশন ও প্রোটিন সংশ্লেষ

DNA নির্ভূল প্রতিলিপি গঠন করতে পারে। যে পদ্ধতির দ্বারা এটা সম্ভব, তাকে বলে DNA-এর **রেপ্লিকেশন**

(replication)। রেপ্লিকেশন সর্বদা সেমিকনজারভেটিড (semiconservative) পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। আমরা আগেই বলেছি যে, DNA দুটি পলিনিউক্লিওটাইড চেইন দিয়ে তৈরী। রেপ্লিকেশনের সময় এই চেইন দুটি পরস্পরের থেকে প্রথমে আলাদা হয়ে যায়। হেলিকেজ প্রোটিন এই কাজে প্রধান ভূমিকা পালন করে। S. S. B (Single Strand Binding Protein) প্রোটিনও উপরোক্ত চেইন দুটিকে আলাদা রাখতে সাহায্য করে, কারণ সেটা ছাড়া DNA-এর প্রতিলিপি গঠন করা সম্ভব নয়। এর পর প্রাইমেজ উৎসেচক হেলিকেজের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং একটি ছোট RNA প্রাইমার তৈরী করে। এই প্রাইমার চার প্রকার dNTP-র এবং Mg^{+2} সাহায্যে DNA পলিমারেজ (Polymerase)-III উৎসেচকের দ্বারা DNA পলিমেরাইজেশনে (Polymerization) সাহায্য করে। এর ফলে, পূর্বের আলাদা হওয়া প্রতিটি চেইন থেকে একটি করে নতুন DNA তৈরী হয়। অর্থাৎ পূর্বের প্রতিটি DNA চেইন একটি করে নতুন প্রতিলিপি গঠন করে। DNA লাইগেজ এবং DNA পলিমারেজ-I উপরোক্ত এই ঘটনাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই পুরো প্রক্রিয়াটিতে জনিতৃ বা মূল DNA অণু বিভক্ত হয় এবং দুটি অপত্য DNA অণু তৈরী হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক DNA অণুর অর্ধেক (একটি দণ্ড) থাকে, জনিতৃ DNA এককতন্ত্রী এবং অপর অর্ধেক থাকে নতুন সংশ্লেষিত DNA এককতন্ত্রী।

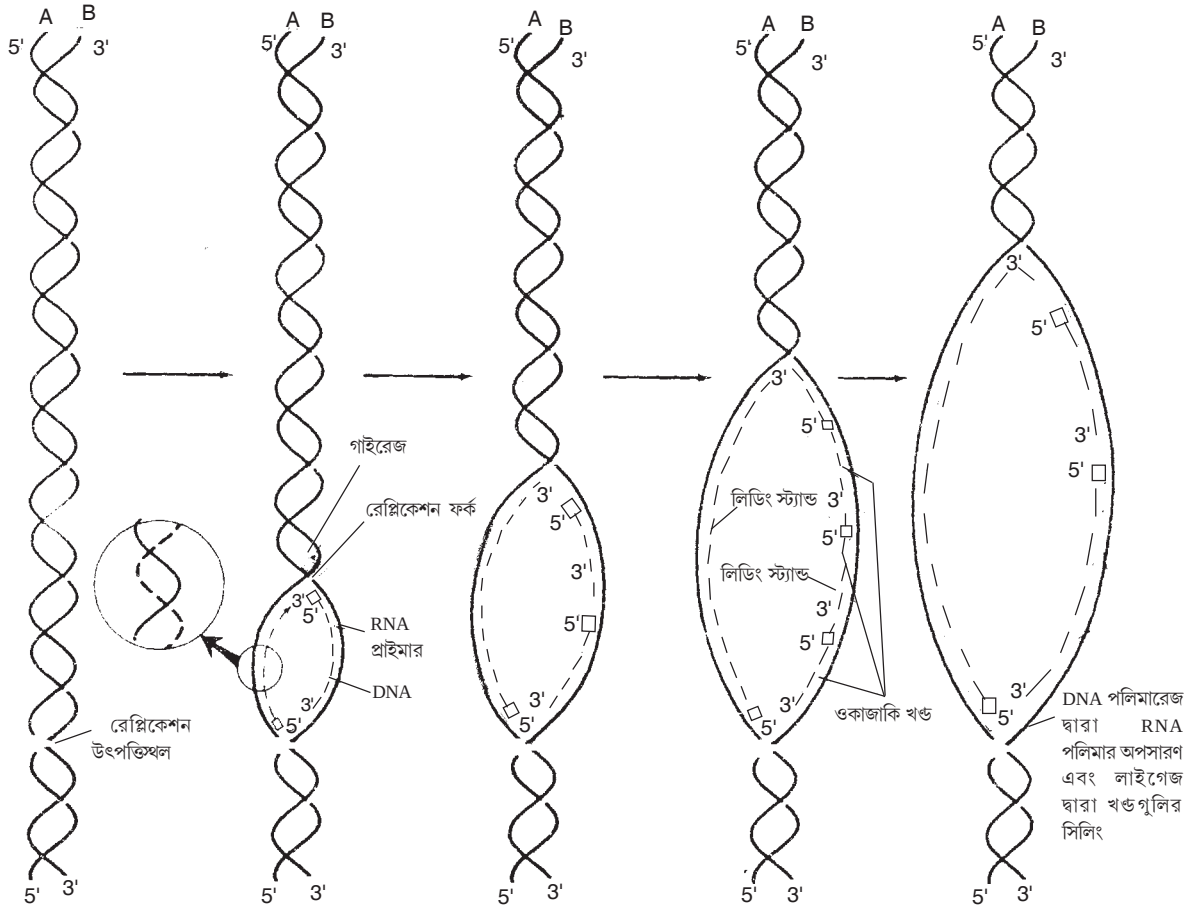

চিত্র 4.9 ঃ DNA রেপ্লিকেশন পদ্ধতি

NSOU

%ব

যে পদ্ধতির মাধ্যমে DNA থেকে RNA তৈরী হয়, ছোট অংশে পরস্পর পরস্পরের থেকে আলাদা হয়ে যায়, RNA পলিমারেজ উৎসেচক সেই DNA থেকে নতুন RNA তৈরী করে। 3' – 5' DNA থেকে 5' _ 3' RNA তৈরী হয়। DNA-এর দুটি চেইনের মধ্যে কেবলমাত্র একটি চেইন থেকেই RNA তৈরী হয়।

প্রোক্যারিওটে (যেমন *ই. কোলি*) একটি নির্দিষ্ট RNA পলিমারেজ উৎসেচকই mRNA, tRNA এবং rRNA তৈরী করতে পারে। কিন্তু ইউক্যারিওটে তিনটি নির্দিষ্ট RNA পলিমারেজ উৎসেচক এই কাজ করে। RNA পলিমারেজ-I 28S, 18S এবং 5·8S রাইবোজোমাল RNA, RNA পলিমারেজ-II mRNA এবং RNA পলিমারেজ-III 5S RNA, tRNA এবং কিছু snRNA তৈরী করতে পারে।

ট্রান্সক্রিপশনের জন্য প্রোমোটার এবং টার্মিনেটর জায়গা দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। RNA পলিমারেজ প্রথম প্রোমোটারের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং এর পরে RNA তৈরী শুরু হয়। অন্যদিকে টার্মিনেটর (terminator) স্থানে এসেই RNA তৈরী বন্ধ হয়ে যায় এবং RNA পলিমারেজ তার কাজ বন্ধ করে দেয়।

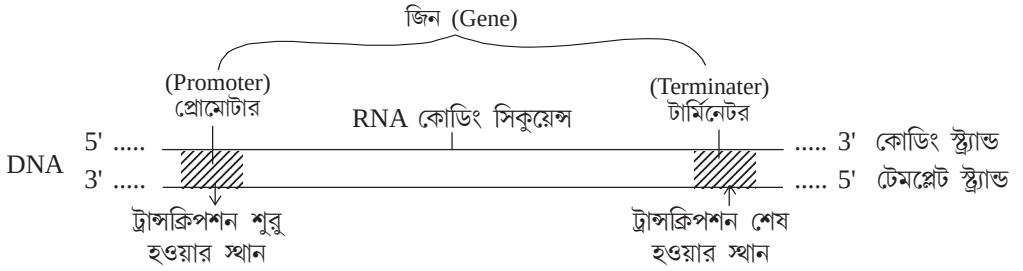

প্রোক্যারিওটে DNA থেকে mRNA তৈরী হওয়ার পর সেই mRNA-এর আর কোনও পরিবর্তন হয় না। কিন্তু ইউক্যারিওটে mRNA তৈরী হওয়ার পর তার কিছু কিছু পরিবর্তন হয়।

(1) 5'-এ একটি মিথাইলেটেড ক্যাপ (methylated cap) যুক্ত হয়।

(2) 3'-এ একটি পলি (A) টেইল (tail) যুক্ত হয়।

(3) Pre mRNA থেকে ইন্ট্রনগুলি (intron যেগুলি থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরী হয় না) আলাদা হয়ে যায় এবং এক্সন (Exon - যেগুলি থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরী হয়) গুলি পরস্পর যুক্ত হয়।

Pre mRNA থেকে mRNA হতে গেলে উপরোক্ত এই তিনটি ঘটনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

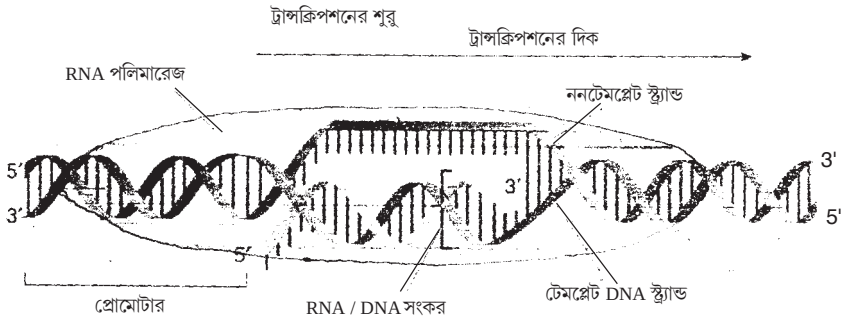

চিত্র 4.10 ঃ ট্রান্সক্রিপশন

RNA থেকে প্রোটিন তৈরী হওয়ার পদ্ধতিকে বলা হয় **ট্রান্সলেশন।** আমরা জানি, প্রোটিন পলিপেপটাইড দিয়ে তৈরী। অনেকগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিড পেপটাইড বন্ধনীর দ্বারা পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি পলিপেপটাইড চেইন তৈরী করে। mRNA-এর তিনটি নিউক্লিওটাইডের একটি সেট, যাকে কোডনও বলা হয়; সেটি পলিপেপটাইড চেইনে একটি অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরী করে। ফ্র্যান্সিস ক্রিক (Francis Crick) 1960-এ প্রথম **জেনেটিক কোড** আবিষ্কার করেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী হরগোবিন্দ খোরানা, প্রথম দেখান যে মোট 64টি কোডনের জন্য 20টি অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে। অনেক সময় একের বেশি কোডনের দ্বারা একটি অ্যামাইনো অ্যাসিড নির্ধারিত হতে পারে। বিশ্বের সর্বত্র এই কোডনগুলি একই ভাবে ব্যবহৃত হয়। AUG কোডন, যেটি মিথিওনিন নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড নির্ধারণ করে, সেটিই প্রোটিন তৈরী হওয়া শুরু করে এবং প্রোটিন তৈরী হওয়া বন্ধ হয় UAG (amber) UAA (ochre) এবং UGA (opal) এই তিনটির কোনও একটি কোডন দ্বারা। এই কোডন তিনটিকে টার্মিনেশন কোডন বলা হয়।

Second letter

First letter	U	C	A	G	Third letter
U	UUU	UCU	UAU	UGU	U
	UUC^{Phc}	UCC	UAC^{Tyr}	UGC^{Cys}	C
	UUA	UCA^{Ser}	UAA^{Stop}	UGA^{Stop}	A
	UUG^{Leu}	UCG	UAG^{Stop}	UGG	G
C	CUU	CCU	CAU	CGU	U
	CUC	CCC	CAC^{His}	CGC	C
	CUA^{Leu}	CCA^{Pro}	CAA	CGA^{Arg}	A
	CUG	CCG	CAG^{Gln}	CGG	G
A	AUU	ACU	AAU	AGU	U
	AUC^{Ile}	ACC	AAC^{Asn}	AGC^{Ser}	C
	AUA	AC ^{Thr}	AAA	AGA	A
	AUG ^{Met}	ACG	AAG^{Lys}	AGG^{Arg}	G
G	GUU	GCU	GAU	GGU	U
	GUC	GCC	CAC^{Asp}	GGC	C
	GUA^{Val}	GCA^{Ala}	GAA	GGA^{Gly}	A
	GUG	GCG	GAG^{Glu}	GGG	G

চিত্র 4.11 ঃ জেনেটিক ট্রিপ্লেট কোড এবং উহার দ্বারা নির্দিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড

রাইবোজোমে ট্রান্সলেশন অর্থাৎ প্রোটিন সংশ্লেষ হয়। যে RNA, কোষের অ্যামাইনো অ্যাসিড ভাণ্ডার থেকে প্রোটিন সংশ্লেষের স্থানে mRNA কর্তৃক নির্দেশিত কোডন বুঝে সঠিক অ্যামাইনো অ্যাসিড পরিবহণ করে, তাকে পরিবাহক বা ট্রান্সফার RNA (tRNA) বলে। tRNA-এর একটি প্রান্তে তিনটি অযুগ্ম বেস থাকে, এই তিনটি

অযুগ্ম বেসকে অ্যান্টিকোডন (anticodon) বলে। এই অঞ্চলই mRNA-র পরিপূরক বেসগুলি বুঝতে পারে। AUG কোডন (মিথিওনিন) প্রোক্যারিওট এবং ইউক্যারিওটে প্রোটিন সংশ্লেষ শুরু করে। সাধারণত প্রোটিন সংশ্লেষের আগে রাইবোজোমগুলি বিচ্ছিন্ন ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। 30 S রাইবোজোম উপএককের সহিত IF3 প্রোটিন ফ্যাক্টরের উপস্থিতিতে mRNA সংযুক্ত হয়। শীঘ্রই সাইটোপ্লাজম থেকে ফরমিল-মিথিওনিন-tRNA (formyl methionine) এসে mRNA-র প্রথম ত্রয়ী সংকেত AUG-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রারম্ভিক যৌগ (Initiation complex) তৈরী করে প্রোটিন সংশ্লেষ শুরু হয়।

এর পর 30S রাইবোজোম উপএকক 50S উপএককের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 70S রাইবোজোম গঠন করে। M^{+2} এই ঘটনায় সাহায্য করে। অ্যামাইনো অ্যাসিড ভাণ্ডার থেকে tRNA অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলিকে পরিবহণ করে প্রোটিন সংশ্লেষের স্থানে নিয়ে যায়। সাইটোপ্লাজমে 20 রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিড নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। প্রথমে প্রত্যেকটি অ্যামাইনো অ্যাসিড নির্দিষ্ট উৎসেচক অ্যামাইনো-অ্যাসাইল-সিনথেটেজ ও ATP দ্বারা সক্রিয় হয়। মুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড ATP-র সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যামাইনো অ্যাসাইল অ্যাডেনিলেট তৈরী করে।

			অ্যামাইনো অ্যাসাইল			
AA	+	ATP	——————®	AA~AMP	+	PP
অ্যামাইনো অ্যাসিড			সিনথেটেজ Mg^{+2}	অ্যামাইনো অ্যাসাইল অ্যাডিনাইলেট		পাইরোফসফেট

অ্যামাইনো অ্যাসাইল অ্যাডিনাইলেট উৎসেচকের সঙ্গে মনোকোভ্যালেন্ট কমপ্লেক্স হিসেবে যুক্ত থাকে। অ্যামাইনো অ্যাসাইল অ্যাডিনাইলেট যতক্ষণ না নির্দিষ্ট tRNA-র সংস্পর্শে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎসেচকের সঙ্গে যুক্ত থাকে। tRNA-র সংস্পর্শে আসার পর অ্যামাইনো অ্যাসাইল tRNA তৈরী হয়।

AA–AMP উৎসেচক + tRNA ® AA–tRNA + AMP + উৎসেচক

অ্যামাইনো
অ্যাসাইল
tRNA

এই অ্যামাইনো অ্যাসাইল tRNA প্রোটিন সংশ্লেষের স্থানে এগিয়ে যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে mRNA-এর প্রথম কোডনটি AUG এবং এটি মিথিওনিন সৃষ্টি করে। এটি ফরমিলেটেড অবস্থায় থাকে। প্রত্যেকটি প্রোটিনের প্রথমেই মিথিওনিন থাকে, কিন্তু প্রোটিন সংশ্লেষ শেষ হলে উৎসেচকের সাহায্যে ফলমাইল-মিথিওনিন আলাদা হয়ে যায়। tRNA গুলি বিভিন্ন প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড বহন করে প্রোটিন সংশ্লেষের স্থানে আসে এবং রাইবোজোমে প্রবেশ করে।

রাইবোজোমের দুটি সাইট আছে, A এবং P সাইট (Site)। প্রথমে fMet – tRNA রাইবোজোমের P সাইটে এসে বসে। এর পর EF – Tu এবং GTP-র সাহায্যে পরের অ্যামাইনো অ্যাসাইল tRNAটি অন্য একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডকে বহন করে A সাইটটি পূরণ করে। এরপর পেপটাইডাল ট্রান্সফারেজ নামক উৎসেচকের সাহায্যে পর পর দুটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে পেপটাইড বন্ধন গঠিত হয় এবং যুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি A সাইটের t-RNA-র সঙ্গে যুক্ত হয়। এই tRNA টি হল একটি নতুন পেপটাইডাল tRNA। এর পর mRNA-তে রাইবোজোম 5′ থেকে 3′-এর দিকে সঞ্চালিত হয়। EF-G এবং GTP এতে সাহায্য করে। এর ফলে পেপটাইডাল tRNAটি P সাইটে সরে যায় এবং অন্য tRNAটি রাইবোজোম ত্যাগ করে। উপরোক্ত এই ঘটনায় A সাইটটি মুক্ত হয়ে যায় এবং অপর একটি অ্যামাইনো অ্যাসিড বহনকারী tRNA ঐ স্থান দখল করে। এই ঘটনা

ততক্ষণ ঘটতে থাকে যতক্ষণ না UAG, UAA অথবা UGA এই তিনটি কোডনের কোনও একটি কোডন রাইবোজোমের A সাইটে mRNA বরাবর এসে পৌঁছায়। এর পরেই রাইবোজোম থেকে পলিপেপটাইডটি এবং tRNA মুক্ত হয়। রাইবোজোমটিও mRNA থেকে মুক্ত হয় এবং এই ভাবে প্রোটিন সংশ্লেষ সমাপ্ত হয়।

2.4.5 সারাংশ

বস্তুত সকল প্রকার প্রাণীর ক্ষেত্রে DNA এবং কিছু ভাইরাসের ক্ষেত্রে RNA-ই হল বংশগতির বাহক। DNA অর্থাৎ ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড ডিঅক্সি রাইবোজ নামক পেন্টোজ সুগার, ফসফেট গ্রুপ এবং চার প্রকার নাইট্রোজেন ঘটিত বেস, যথা অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, থাইমিন ও সাইটোসিন নিয়ে গঠিত। অপর পক্ষে RNA অর্থাৎ রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডে রাইবোজ নামক পেন্টোজ সুগার, ফসফেট গ্রুপ এবং অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন এবং ইউরাসিল এই চার ধরনের নাইট্রোজেন ঘটিত বেস থাকে।

একটি DNA অণু, দুটি পলিডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইডের দণ্ডের দ্বারা তৈরী। অনেকগুলি ডিঅক্সি-রাইবোনিউক্লিওটাইড পরপর যুক্ত হয়ে একটি পলিডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড গঠন করে। আবার একটি ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড গঠিত হয় একটি ফসফরিক অ্যাসিড, একটি ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার ও একটি বেসের সুনির্দিষ্ট মিলনে।

পলিডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড দণ্ড দুটি ঘোরানো সিঁড়ির মত ডানদিকে প্যাঁচ দেওয়া থাকে এবং প্রতি 34Å দূরত্বে একটি করে প্যাঁচ পূর্ণ হয়। প্রতি প্যাঁচে দশটি করে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড থাকে।

DNA, বংশগতির বৈশিষ্ট্য সমূহ এক জনু থেকে পরবর্তী জনুতে স্থানান্তরিত করে; এটি RNA-সংশ্লেষ করে এবং প্রোটিন সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রিণ করে। এটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোষের সকল প্রকার জৈবিক কার্য নিয়ন্ত্রণ করে।

DNA বংশগতির বাহক এবং ধারক তা গ্রিফিথের পরীক্ষা, অ্যাভেরী, ম্যাকলিওড ও ম্যাক্‌কার্টির পরীক্ষা এবং হার্সে ও চেজের পরীক্ষা দ্বারা সঠিক ভাবে প্রমাণ করা যায়।

RNA একটি মাত্র বৃহৎ তন্ত্রী নিয়ে গঠিত। RNA আবার ভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে, যেমন mRNA, tRNA, rRNA, snRNA।

DNA রেপ্লিকেশনের মাধ্যমে নির্ভুল প্রতিলিপি গঠন করতে পারে। ট্রান্সক্রিপশনের মাধ্যমে DNA থেকে RNA এবং ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে RNA থেকে প্রোটিন তৈরী হয়।

2.4.6 প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) DNA এবং RNA-এর গঠন বর্ণনা করুন।

(২) DNA এবং RNA-এর গঠনের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

(৩) সংক্ষেপে গ্রিফিথের পরীক্ষাটি বর্ণনা কর। অ্যাভেরী ও তাঁর বন্ধুরা পরবর্তীকালে কি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন?

(৪) DNA বংশগতির বাহক — হার্সে এবং চেজ এর পরীক্ষায় এটি কিভাবে প্রমাণিত হয়?

(৫) RNA-কি বংশগতির বাহক হতে পারে? একটি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করুন।

(৬) রেপ্লিকেশন, ট্রান্সক্রিপশন এবং ট্রান্সলেশন সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) DNA-এর ভৌত গঠন বর্ণনা করুন।
(২) DNA এবং RNA-এর রাসায়নিক গঠনের তুলনামূলক আলোচনা করুন।
(৩) DNA বংশগতির বাহক তা কে প্রথম এবং কিভাবে প্রমাণ করেন?
(৪) বংশগতির বাহকের ধর্মগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
(৫) সংক্ষেপে DNA-এর প্রতিলিপি গঠন বর্ণনা করুন।
(৬) কোন প্রক্রিয়ায় DNA থেকে RNA তৈরী হয়?
(৭) জেনেটিক কোড বলতে কি বোঝ? স্টার্ট কোডন ও স্টপ কোডনগুলি কি কি?
(৮) রাইবোজোমে প্রোটিন সংশ্লেষের পদ্ধতিটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

একক 2.5 ❑ মানুষ এবং ড্রসোফিলার লিঙ্গ নির্ধারণ (Sex determination in man and *drosophila*)

গঠন

2.5.1 প্রস্তাবনা

2.5.2 Y-ক্রোমোজোমের মাধ্যমে লিঙ্গ নির্ধারণ

2.5.3 অতিরিক্ত X-ক্রোমোজোম এবং ডোসেজ কমপেনসেশন

2.5.4 পুরুষের লিঙ্গ নির্ধারণে Y-ক্রোমোজোমাল জীন

2.5.5 ড্রসোফিলায় লিঙ্গ নির্ধারণ

2.5.6 ব্রীজেসের পরীক্ষা

2.5.7 ড্রসোফিলায় লিঙ্গ নির্ধারণের একটি ছক

2.5.8 ড্রসোফিলার ডোসেজ কমপেনসেশন ঃ 1X-কে 2X-এ পরিণত করা

2.5.9 সারাংশ

2.5.10 প্রশ্নাবলী

2.5.1 ভূমিকা

এই অধ্যায়ে আমরা মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণের পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করব। আমরা জানি যে, স্বাভাবিক মানুষের ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যা 46। এর মধ্যে 22 জোড়া হল অটোজোম, অর্থাৎ এই সব ক্রোমোজোম দেহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (somatic characters) বাহক জীন বহন করে। বাকী 1 জোড়া হল সেক্স ক্রোমোজোম, অর্থাৎ এই ক্রোমোজোমগুলি জীবের লিঙ্গ নির্ধারণে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করে। সেক্স ক্রোমোজোম দুই প্রকারের হয় 'X' এবং 'Y'। স্বাভাবিক পুরুষে X এবং Y ; এবং স্বাভাবিক মহিলাতে X- এই এক প্রকারের ক্রোমোজোম থাকে। স্বাভাবিক পুরুষকে আমরা XY এবং স্বাভাবিক মহিলাকে আমরা XX- এই চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করে থাকি।

মানুষে Y-ক্রোমোজোমই প্রধানত লিঙ্গ নির্ধারণ করে বলা যেতে পারে। Y ক্রোমোজোম উপস্থিত থাকলে পুরুষের এবং অনুপস্থিত থাকলে মহিলার সৃষ্টি হয়। Y ক্রোমোজোমের গুরুত্ব বোঝা যায় কিছু কিছু সেক্স ক্রোমোজোমের সংখ্যার কমবেশীতে যেসকল পরিবর্তন হয় তার মাধ্যমে। মানুষের ক্ষেত্রে সেক্স ক্রোমোজোমের কম বেশী সংখ্যার জন্য যে সকল বিশেষ বৈশিষ্ট দেখা যায় তাদের সিনড্রোম বলে (Syndrome)।

2.5.2 Y-ক্রোমোজোমের মাধ্যমে লিঙ্গ নির্ধারণ

Y-ক্রোমোজোম যে মানুষে লিঙ্গ নির্ধারণ করে তার প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় মিয়োটিক ননডিসজাংশনের (meiotic nondisjunction) ফলে উদ্ভূত হওয়া এক ধরনের অস্বাভাবিক সেক্স ক্রোমোজোমের পরিপূরকতা দেখে (sex chromosome complement)।

ননডিসজাংশনের ফলে অনেক ধরনের অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয়, তাদের মধ্যে একটি হল XO মানুষজন। এদের X ক্রোমোজোম থাকে, কিন্তু কোনও Y ক্রোমোজোম থাকে না। এদের অটোজোমগুলি স্বাভাবিকই থাকে এবং এরা মহিলা হন কিন্তু এই সকল মহিলারা বন্ধ্যাত্বের শিকার হন (Sterile)। এই সকল মহিলাদের কেরিওটাইপ (কোষে মেটাফেজ ক্রোমোজোমের একটি সম্পূর্ণ সেট) লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এদের দুটির স্থানে একটি মাত্র সেক্স ক্রোমোজোম থাকে। এই ধরনের ঘটনা 20000-এ 1টি হয়। যে সহজাত অস্বাভাবিকতায় এরা ভোগেন তাকে বলা হয় **টার্নার সিনড্রোম** (Turner syndrome)। এটি হিসেব করে দেখা গেছে যে প্রায় 99 শতাংশ 45, X-ভ্রূণ জন্মের আগেই মারা যায়। 1938 খ্রিস্টাব্দে হেনরী এইচ টার্নার (Henry H. Turner) প্রথম এইরূপ সিন্ড্রোম লক্ষ্য করেন। এই রোগে মহিলারা সাধারণত অস্বাভাবিক বেঁটে হন, গলার পিছনের চামড়া কুঞ্চিত হয়। ঢালের ন্যায় বক্ষ ও চওড়া ঘাড় হয়। এদের যৌবনে যৌন বৈশিষ্টগুলি প্রকাশিত হয় না, ডিম্বাশয় খুব ছোট হয় অথবা অনেক সময় থাকেও না।

XO মানুষে এই ধরনের অস্বাভাবিকতা প্রমাণ করে যে, মহিলাদের স্বাভাবিক গঠনের জন্য দুটি X-ক্রোমোজোম অত্যাবশ্যকীয়।

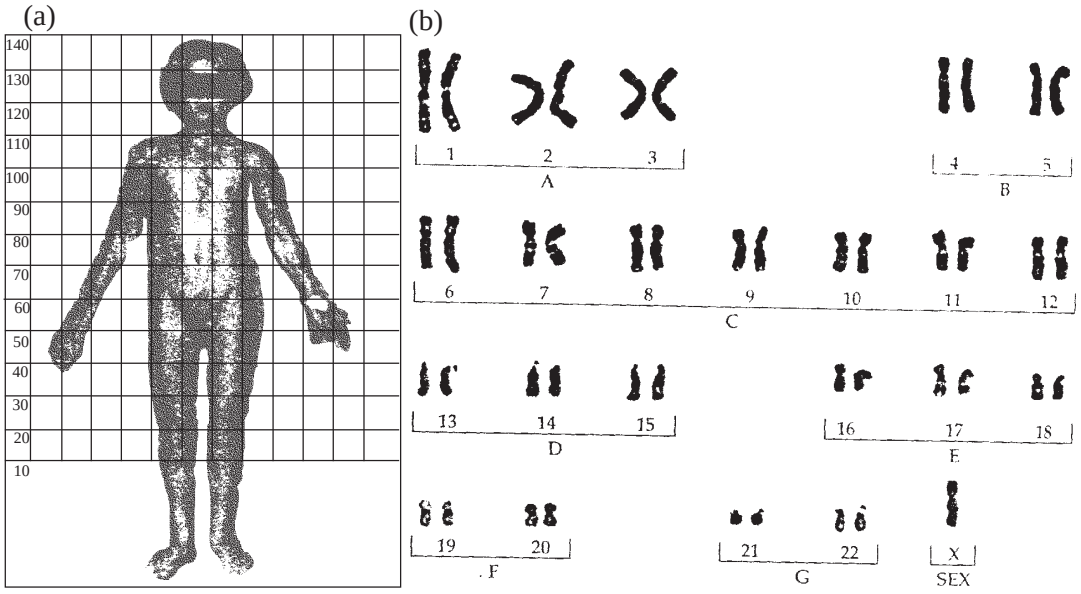

চিত্র 5.1 ঃ টার্নার সিনড্রোম (XO) : (a) এই সিনড্রোম বিশিষ্ট মহিলা; (b) কেরিওটাইপ।

ননডিসজাংশনের ফলে অনেক সময় XXY ধরনের মানুষের সৃষ্টি হয়। এরা সাধারণতঃ পুরুষ হয় এবং তারা ক্লাইনফেলটার সিনড্রোমে ভোগেন। 1942 খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান চিকিৎসক হ্যারী এফ. ক্লাইনফেল্টার (Harry F. Klinefelter) এই সিন্ড্রোমের আবিষ্কর্তা। এটি পুরুষদের একপ্রকার যৌন অস্বাভাবিকতা সমন্বিত ব্যাধি যাতে পুরুষের (1) শুক্রাশয় অতি ক্ষুদ্র, (2) স্ফীত স্তনগ্রন্থি, (3) অনুন্নত গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য এবং (4) উপাঙ্গগুলি লম্বা হয়।

পরবর্তীকালে এডিনবার্গের ওয়েস্টার্ন জেনারেল হাসপাতালে এ. জ্যাকব (A. Jacob) এবং জে. এ. স্ট্রং (J. A. Strong) প্রথম এই সিনড্রোমগ্রস্থ রোগীর 47 টি ক্রোমোজোম গণনা করেন। এই অতিরিক্ত ক্রোমোজোমটি হল 'X'। এর থেকেই জানা যায় যে XXY সমন্বিত ব্যক্তিদের ক্লাইনফেল্টার হয়। পরবর্তীকালে এই ক্লাইনফেল্টার সিন্ড্রোমগ্রস্থ রোগীদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ক্রোমোজোম সংখ্যা পাওয়া গেছে, যাদের X ক্রোমোজোমের সংখ্যা

ক্রমাগত বাড়তে থাকে। যেমন — 47 = 44A + XXY; 48 = 44A + XXXY; 49 = 44A + XXXXY। এই ধরনের ঘটনা 1000-এ 1টি হয়। ক্লাইনফেল্টার মানুষজনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অস্বাভাবিকতা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে পুরুষদের স্বাভাবিক গঠনের জন্য একটি X এবং একটি Y ক্রোমোজোম অতি আবশ্যক।

উপরের উদাহরণগুলি ছাড়াও আমরা XYY সিনড্রোম এবং XXX সিনড্রোম দেখতে পাই। 47, XYYY-রা হল পুরুষ এবং মিয়োসিসে Y-ক্রোমোজোমে ননডিসজাংশনের ফলেই এটা হয়। 47, XXX-রা হল মহিলা (triplox)। এরা মোটামুটি স্বাভাবিক হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এদের মধ্যে বন্ধ্যাত্বতা দেখা যায়।

2.5.3 অতিরিক্ত X-ক্রোমোজোম এবং ডোসেজ কমপেনসেশন (Dosage Compensation Mechanism for Extra X-Chromosome)

সেক্স ক্রোমোজোমের কার্যাবলী, লিঙ্গ নির্ধারণ প্রক্রিয়া বোঝার পক্ষে একটি ভিন্ন ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করে। কারণ X -ক্রোমোজোমে যে সকল জীন থাকে, Y-ক্রোমোজোমে সেগুলি থাকে না। অতএব, মহিলাদের ক্ষেত্রে X-ক্রোমোজোমের, ডবল ডোজ (Double dose) বা দুই মাত্রা থাকে। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে থাকে একমাত্রা। এখন প্রশ্ন, কিভাবে এই জীনমাত্রার অসমতা দূরীভূত হয়। ভারসাম্যের এই অসাম্য দূরীকরণ হয় এক বা একাধিক ক্রোমোজোমের ঘনীভূত হওয়ার ফলে এবং এর ফলে প্রজননিক অর্থে একটিমাত্র X ক্রোমোজোমই সক্রিয় থাকে। এই ঘনীভূত ক্রোমোজোমকেই **বার বডি** (Barr Body) বলা হয়। মুরে বার (Murray Barr) প্রথম এই বার বডি আবিষ্কার করেন। তিনি দেখান যে স্বাভাবিক XX মহিলাদের একটি মাত্র ঘনীভূত ক্রোমাটিন বা বার বডি থাকে এবং XY পুরুষদের কোনও বার বডি থাকে না। পরবর্তীকালে 1961 খ্রীস্টাব্দে লিওন (Lyon) তাঁর তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তাঁর মতে—

(১) বার বডি হল ঘনীভূত X-ক্রোমোজোম ছাড়া আর কিছুই না।

(২) নিষেকের পর 16 দিনের থেকেই এই X-ক্রোমোজোমের নিষ্ক্রিয়তা শুরু হয়।

(৩) পিতা এবং মাতার থেকে প্রাপ্ত, কোন X-ক্রোমোজোম নিষ্ক্রিয় হবে তা এলোপাথাড়িভাবে (randomly) ঠিক হয় এবং এক কোষ থেকে অন্য কোষে সেটা স্বাধীন ভাবে হয়।

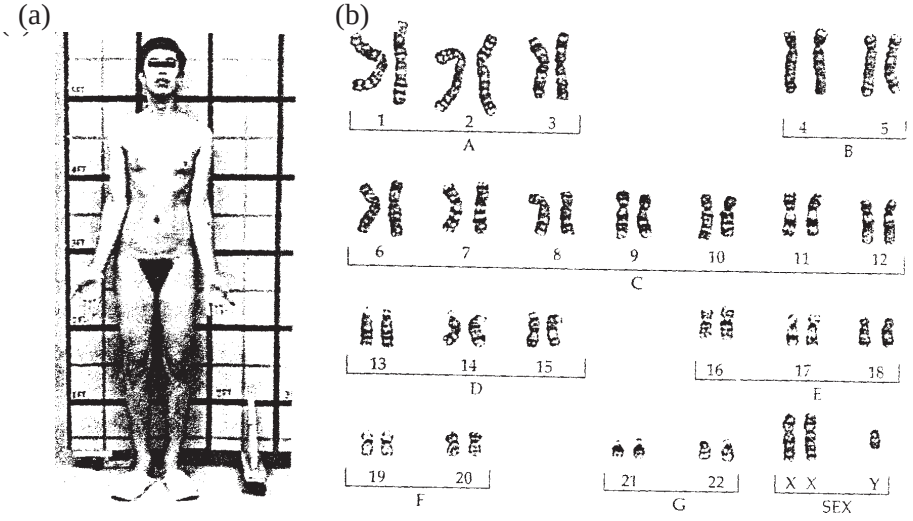

চিত্র 5.2 ঃ ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম (XXY) : (a) এই সিনড্রোম বিশিষ্ট পুরুষ, (b) কেরিওটাইপ।

Table ঃ X এবং Y ক্রোমোজোমের সংখ্যার পরিবর্তনের ফলে মানুষের বিভিন্ন অস্বাভাবিকতা এবং লিঙ্গ নির্ধারণে Y ক্রোমোজোমের ভূমিকা ঃ

ক্রোমোজোমের সংখ্যা	অস্বাভাবিকতা	সম্ভাব্য বার বডির সংখ্যা
46, XX	স্বাভাবিক ♀	1
46, XY	স্বাভাবিক ♂	0
45, X	টার্নার সিনড্রোম ♀	0
47, XXX	ট্রিপলো - X ♀	2
47, XXY	ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম ♂	1
48, XXXY	ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম ♂	2
48, XXYY	ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম ♂	1
47, XYY	XYY সিনড্রোম ♂	0

যে সাধারণ ফরমুলার দ্বারা বার বডির সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়, সেটি হল → X-ক্রোমোজোমের সংখ্যা–1

স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক মানুষের X-ক্রোমোজোমের সঙ্গে বার বডির সংখ্যার সদৃশতা উপরের টেবিলে দেখানো হয়েছে।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা ডোসেজ কমপেনসেশনে X-ক্রোমোজোম নিষ্ক্রিয়তার বিভিন্ন কারণ খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছেন। অনেক বিজ্ঞানীর মতে X-ইনঅ্যাক্টিভেশন সেন্টার (X-inactivation centre)-এ, X-ক্রোমোজোমের প্রথম নিষ্ক্রিয় হওয়া শুরু হয় এবং এর পর এটি ক্রোমোজোমের উভয় দিকে ছড়িয়ে পড়ে। একটি X-ক্রোমোজোমাল জীন, যার নাম **XIST** (for X inactive specific transcripts) সেটি এই নিষ্ক্রিয়তার ঘটনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে একমাত্র নিষ্ক্রিয় X-ক্রোমোজোমেই এই জীনটি সক্রিয় থাকে এবং সক্রিয় X-ক্রোমোজোমে এই জীনটি নিষ্ক্রিয় থাকে। এই জীনটি অন্যান্য X-ক্রোমোজোমাল জীনগুলি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু কিভাবে এই **XIST** জীনটি নিষ্ক্রিয় X-ক্রোমোজোমে সক্রিয়ভাবে কাজ করে, তা এখন পর্যন্ত পরিষ্কার নয়।

2.5.4 পুরুষের লিঙ্গ নির্ধারণে Y-ক্রোমোজোমাল জীন (The gene on the Y chromosome for male sex determination)

যেহেতু Y ক্রোমোজোম পুরুষের লিঙ্গ নির্ধারণে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে, এর থেকে বোঝা যায় যে Y-ক্রোমোজোমে কিছু নির্দিষ্ট জীন আছে যাদের প্রকাশিত বস্তু (product) পুরুষের লিঙ্গ নির্ধারণে সক্ষম। এই নির্ধারিত বস্তুটি হল টেস্টিস ডিটারমিনিং ফ্যাক্টর (testis determining factor) বা যেটি পুরুষে টেস্টিস তৈরী হতে সাহায্য করে এবং সেই জীনটিকে বলা হয় **TDF** gene (Testis Determining Factor gene)। এই জীনটিই প্রথম জনন কোষকে ডিম্বাশয় না করে শুক্রাশয়ে পরিণত করে। সাম্প্রতিক কালে রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজির সাহায্যে TDF জীনটিকে সনাক্ত করা এবং তার ধর্মসমূহ জানা সম্ভব হয়েছে।

সম্প্রতি **SRY** (Sex Determining Region Y) নামক অপর একটি Y-ক্রোমোজোমাল জীন আবিষ্কৃত হয়েছে, যেটি TDF জীনের মতই। এখন প্রশ্ন হল কি করে এই জীনটিকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। মানুষের

লিঙ্গ নির্ধারণ করার সময় বিজ্ঞানীরা এক ধরনের XX পুরুষ এবং XY মহিলা সনাক্ত করেন। পরীক্ষা করে দেখা যায় যে এই XX-পুরুষের Y ক্রোমোজোমের ছোট বাহুর উপরের দিকের একটি অংশ ভেঙ্গে দুটি X-ক্রোমোজোমের মধ্যে একটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

অপরপক্ষে XY মহিলাতে Y ক্রোমোজোমের ঐ নির্দিষ্ট অংশটি অবলুপ্ত ছিল। উপরের এই ঘটনাগুলি থেকে এটাই বোঝা যায় যে পুরুষদের ক্ষেত্রে যে জীনটি শুক্রাশয় তৈরী করে, সেটি Y-ক্রোমোজোমের ছোট বাহুটির উপরের অংশে অবস্থিত। এই জীনটিই হল SRY জিন। এই জীনটিই পুরুষে লিঙ্গ নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। শুক্রাশয় থেকে নিঃসরিত বিভিন্ন ধরনের হরমোন লিঙ্গ নির্ধারণে গৌণ ভূমিকা পালন করে। এদের মধ্যে টেষ্টোস্টেরণ এবং অ্যান্টিমুলারিয়ান হরমোন অন্যতম। শুক্রাশয়ের লিডিগ কোষ এবং সারটোলি কোষ থেকে এরা যথাক্রমে নিঃসরিত হয়।

এছাড়াও দুটি জীন **SOX9** এবং **SFI** শুক্রাশয় তৈরীতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এই জীন দুটি হল অটোজোমাল জীন। ঠিক সেই রকমই **Wnt4a** এই অটোজোমাল জীনটি ডিম্বাশয় তৈরীতে সাহায্য করে। এছাড়াও ডিম্বাশয় তৈরীর জন্য একটি X-ক্রোমোজোমাল জীন খুব গুরুত্বপূর্ণ, এটি হল **DAX1**।

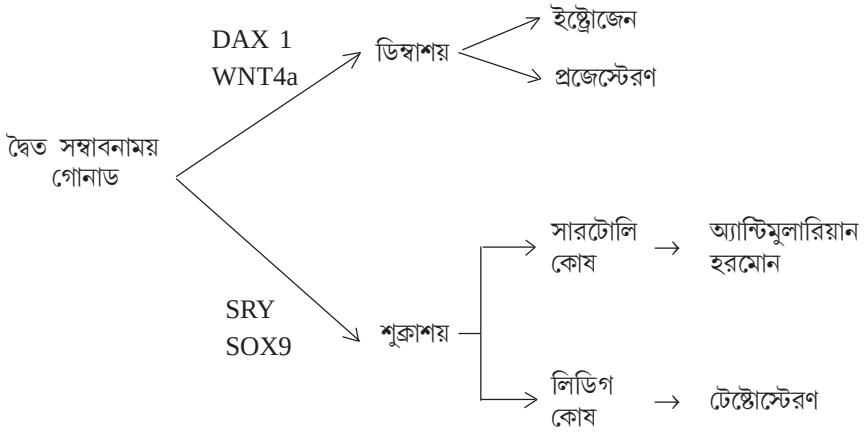

চিত্র 5.3 ঃ জীন এবং হরমোনের সমন্বয়ে মানুষের মুখ্য এবং গৌণ লিঙ্গ নির্ধারণের একটি ছক

ডিম্বাশয় থেকে নিঃসারিত দুটি হরমোন ইষ্ট্রোজেন এবং প্রজেষ্টেরন মহিলাদের ক্ষেত্রে লিঙ্গ নির্ধারণে গৌণ ভূমিকা পালন করে।

2.5.5 ড্রসোফিলায় লিঙ্গ নির্ধারণ (Sex determination in *Drosophila*)

ড্রসোফিলা মাছি অতি ক্ষুদ্র ফলের মাছি। এরা ডিপ্টেরা বর্গের পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণী। বংশগতির নানা পরীক্ষা নিরীক্ষায় এই মাছি ব্যবহার করে বংশগতির নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভবপর হয়েছে বলে একে জেনেটিক্সের সিনডারেলা (Cinderella) বলা হয়। 1909 খ্রিস্টাব্দে মরগ্যান (T. H. Morgan) প্রথম ড্রসোফিলা মাছি বংশগতির পরীক্ষায় ব্যবহার করেন।

পুরুষ এবং স্ত্রী ড্রসোফিলার বহিরাকৃতির যথেষ্ট তফাৎ আছে। স্ত্রী ড্রসোফিলাগুলি আকৃতিতে বড় হয়, এদের বক্ষদেশের কূর্চ (bristle) খুব বড় হয় এবং এদের উদরে পাঁচটি গাঢ় ব্যান্ড আছে। পুরুষ ড্রসোফিলা আকৃতিতে ছোট হয়। বক্ষদেশের কূর্চ খুব ছোট হয় এবং এদের উদরে তিনটি ব্যান্ড আছে।

ড্রসোফিলায় (*Drosophila melanogaster*) 4 জোড়া ক্রোমোজোম থাকে, এক জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম এবং তিন জোড়া অটোজোম। এদের ক্ষেত্রে স্ত্রীরা হল হোমোগ্যামেটিক (XX) এবং পুরুষরা হল হেটোরোগ্যামেটিক (XY)। যদিও এদের ক্ষেত্রে Y ক্রোমোজোম লিঙ্গ নির্ধারণে কোন ভূমিকা পালন করেনা। এদের ক্ষেত্রে X-**ক্রোমোজোমের সংখ্যা এবং অটোজোমের সেটের সংখ্যার অনুপাতের** দ্বারা লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। স্বাভাবিক স্ত্রী ড্রসোফিলায় দুটি X ক্রোমোজোম এবং দুই সেট অটোজোম থাকে। সুতরাং এদের ক্ষেত্রে X ঃ A হল 1। স্বাভাবিক পুরুষ ড্রসোফিলায় একটি X ক্রোমোজোম এবং দুই সেট অটোজোম থাকে অর্থাৎ এদের X ঃ Y হল 0·50। যদি এই X ঃ A অনুপাত 1 অথবা 1-এর বেশি হয়, তাহলে স্ত্রী ড্রসোফিলার সৃষ্টি হয়। যদি এই X ঃ A অনুপাত 0·50 অথবা এর কম হয়, তাহলে পুরুষ ড্রসোফিলার সৃষ্টি হয়। যখন এই অনুপাত 0·50 এবং 1-এর মধ্যবর্তী হয়, তাহলে মাছিটি পুরুষ অথবা মহিলা না হয়ে **ইন্টারসেক্স** হয়। এই ধরনের মাছিদের শরীরের ভিতরে অবস্থিত লিঙ্গ নির্ধারক অঙ্গগুলি এবং জেনিটালিয়া, পুরুষ এবং স্ত্রী মাছিগুলির শরীরে অবস্থিত অঙ্গগুলির মিশ্রণে তৈরী হয় এবং এরা প্রজননে অসমর্থ হয়।

ব্রিজেস (Bridges) 1922 খ্রিস্টাব্দে, ড্রসোফিলা নিয়ে পরীক্ষা করার সময় হঠাৎ একপ্রকার স্ত্রী মাছি পান, যারা ট্রিপ্লয়েড (3n) স্ত্রী মাছি। অনেক সময় এইরকম ট্রিপ্লয়েড স্ত্রী মাছির জননকোষ সৃষ্টির সময় মিয়োসিসে সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলি পৃথক না হয়ে একটি গ্যামেটেই প্রবেশ করে। এই পদ্ধতিকে বলে ননডিসজাংশন (nondisjunction)। ব্রিজেস এই এরকম একটি ননডিসজাংশনাল স্ত্রী মাছির সঙ্গে একটি স্বাভাবিক মাছির মিলন ঘটান। এর থেকে তৈরী হওয়া XXX বহনকারী স্ত্রী মাছিগুলিকে বলা হয় **সুপার ফিমেল**। এরা বাঁচে না। ব্রিজেস এই প্রকার স্ত্রী মাছির সঙ্গে পুনরায় স্বাভাবিক মাছির মিলন ঘটান। এই প্রকার পরীক্ষাকে সেকেন্ডারী ননডিসজাংশন পরীক্ষা বলে। এই পরীক্ষায় সুপার ফিমেল, ইন্টারসেক্স, পুরুষ এবং সুপার মেল এই চার ধরনের অপত্য মাছি সৃষ্টি হয়।

2.5.6 ব্রীজেসের পরীক্ষা

(ক) নন ডিসজাংশনের ফলে সুপার ফিমেল তৈরী ঃ

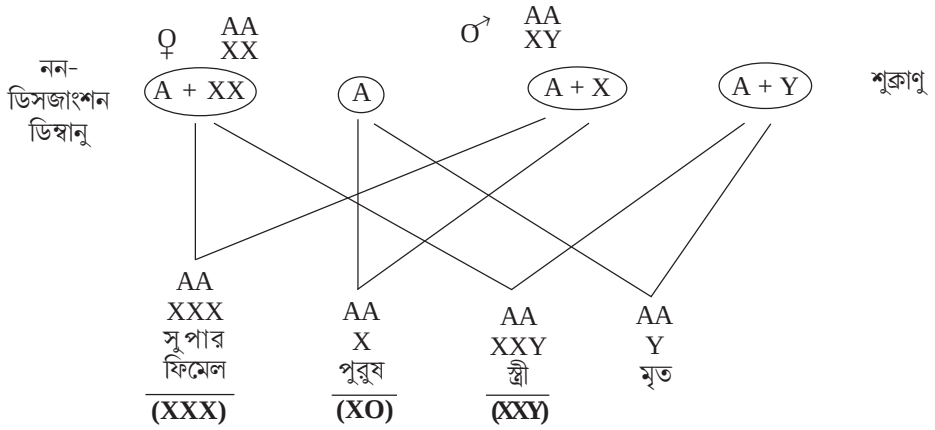

NSOU

(খ) সুপার ফিমেলের সঙ্গে সাধারণ পুরুষের মিলন ঃ

একটি ট্রিপ্লয়েড স্ত্রী মাছি (3A3X) চার প্রকার ডিম্বানু (2A2X, AX, A2X, 2AX) উৎপন্ন করে। একটি স্বাভাবিক ডিপ্লয়েড পুরুষ দুই প্রকার শুক্রাণু (AX, AY) উৎপন্ন করে।

ডিম্বাণু

শুক্রাণু	AX	2AX	A2X	2A2X
AX	2A 2X ডিপ্লয়েড স্ত্রী	3A 2X ইন্টারসেক্স	2A 3X সুপার স্ত্রী	3A 3X ট্রিপ্লয়েড স্ত্রী
AY	2AXY ডিপ্লয়েড পুং	3AXY সুপার পুং	2A 2XY ডিপ্লয়েড স্ত্রী	3A 2XY ইন্টারসেক্স

তালিকা ঃ ট্রিপ্লয়েড ফিমেল এবং স্বাভাবিক পুরুষের মিলনের ফলাফল ঃ

ক্রোমোজোম সমাবেশ	লিঙ্গের প্রকার	অটোজোম সেট	X-ক্রোমোজোমের সংখ্যা	X ঃ Y অনুপাত মূল্য
3A3X	ট্রিপ্লয়েড স্ত্রী	3	3	1
2A2X	স্বাভাবিক ডিপ্লয়েড স্ত্রী	2	2	1
2A2XY	ডিপ্লয়েড স্ত্রী	2	2	1
3A2X	ইন্টারসেক্স	3	2	0·67
3A2XY	ইন্টারসেক্স	3	2	0·67
2AXY	স্বাভাবিক পুং	2	1	0·50
2A3X	সুপার স্ত্রী	2	3	1·50
3AXY	সুপার পুং	3	1	0·23

উপরের তালিকা থেকে এটাই বোঝা যায় যে X ঃ A অনুপাতের উপরেই ড্রসোফিলায় লিঙ্গ নির্ধারিত হয় এবং লিঙ্গ নির্ধারণে Y ক্রোমোজোম কোনও ভূমিকা পালন করে না।

এই X ঃ A অনুপাত প্রকৃতপক্ষে কিছু X-লিঙ্গ ''নিউমারেটর'' জিন এবং অটোজোমালি ''ডিনমিনেটর'' জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। **sis - a, sis - b, sis - c** এবং **run** ইত্যাদি হল নিউমারেটর (Numerator) জিনের উদাহরণ। অপর পক্ষে **dpn** হল ডিনমিনেটর জিনের উদাহরণ। ভ্রূণ তৈরীর সময় কিছু জিন প্রকাশিত বস্তু যেগুলি মায়ের থেকে আসে যেমন **da, her, emc** এবং **gro** বিভিন্ন নিউমারেটর এবং ডিনমিনেটর প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে SIS প্রোটিন তৈরী করতে সাহায্য করে। এই প্রোটিন প্রথম **Sxl** জিন থেকে **Sxl** প্রোটিন হতে সাহায্য করে। পুরুষ এবং স্ত্রী ড্রসোফিলাতে দুটি ভিন্ন প্রোমোটারের (Promoter) মাধ্যমে Sxl প্রোটিন তৈরী হয়। এর ফলে দুটি ভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে পুরুষ এবং স্ত্রী ড্রসোফিলা তৈরী হয়। স্ত্রী ড্রসোফিলায় একটি ক্রিয়াশিল Sxl প্রোটিন তৈরী হয়, কিন্তু পুরুষ মাছিতে কোনো ক্রিয়াশীল Sxl প্রোটিন তৈরী হয় না, Sxl প্রোটিন স্ত্রী মাছিতে tra pre mRWA থেকে একটি ক্রিয়াশিল tra প্রোটিন তৈরী করতে সাহায্য করে। অপরপক্ষে পুরুষ মাছিতে

কোন কার্যক্ষম tra প্রোটিন তৈরী হয় না। স্ত্রী মাছিতে tra প্রোটিন, tra 2 প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে dsx pre - mRNA থেকে dsx ♀ প্রোটিন তৈরী করে। অপরদিকে পুরুষে dsx ♂ প্রোটিন তৈরী হয়। Dsx ♀ প্রোটিন ix প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পুরুষ পৃথকীকরণের জিনগুলি দমিয়ে রাখে এবং এর থেকে স্ত্রী ড্রসোফিলার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে dsx ♂প্রোটিন স্ত্রী পৃথকীকরণের জিনগুলি দমিয়ে রাখে এবং এর থেকে পুরুষ ড্রসোফিলার সৃষ্টি হয়। উপরের এই পুরো ঘটনাটি ছকের সাহায্যে নিম্নে দেখানো হল।

2.5.6 ড্রসোফিলায় লিঙ্গ নির্ধারণের একটি ছক ঃ

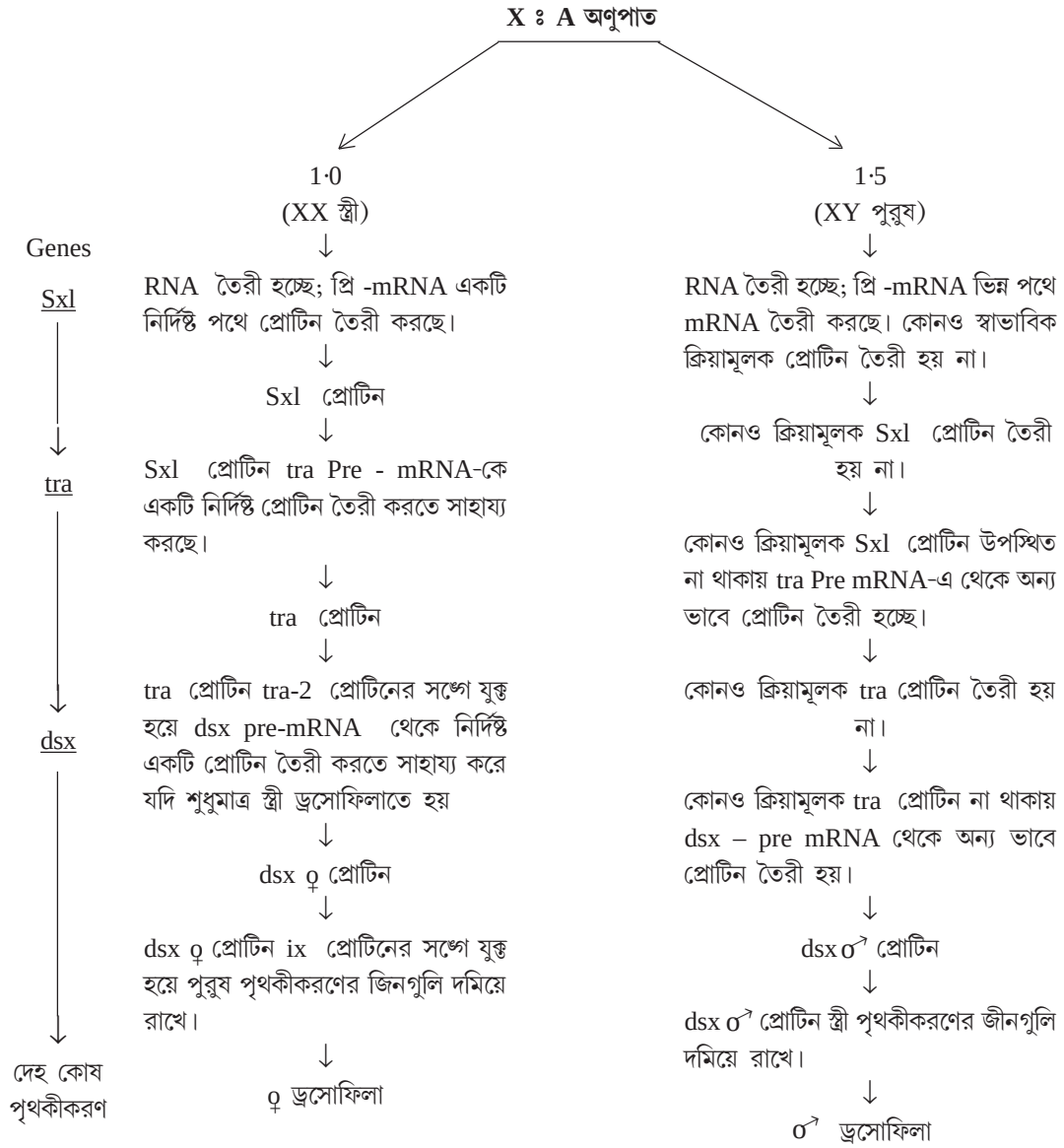

2.5.8 ড্রসোফিলার ডোসেজ কমপেনসেশন ঃ 1X-কে 2X-এ পরিণত করা

পুরুষ ড্রসোফিলাতে হেটারোমরফিক সেক্স ক্রোমোজোম দেখা যায় কিন্তু স্ত্রী ড্রসোফিলায় দুটি X-ক্রোমোজোম দেখা যায়। পুরুষ ড্রসোফিলায় X ক্রোমোজোমের হাইপারট্রান্সক্রিপটিভ কার্যক্ষমের (hypertranscriptive activity) দ্বারাই ডোসেজ কমপেনসেশন হয়ে থাকে (**মুখার্জী এবং মীরম্যান**, 1965)। 1981 খ্রিস্টাব্দে এবং 1985 খ্রিস্টাব্দে পৃথক পৃথক ভাবে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী আর. এন. চ্যাটার্জী এবং বিজ্ঞানী এ. মুখার্জী দেখান যে পুরুষ ড্রসোফিলার একটি X ক্রোমোজোমে ননহিস্টোন ক্রোমোটিন প্রোটিনের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে এবং এর ফলেই এই X ক্রোমোজোম অতিরিক্ত কার্যক্ষম যুক্ত হয়। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখেছেন যে পুরুষ মাছির X-ক্রোমোজোমে msl - 1, msl - 2, msl - 3 এবং mle এই চার প্রকার জিনের উপস্থিতি। এদের প্রোটিনগুলিই প্রকৃত পক্ষে ডোসেজ কমপেনসেশনের জন্য দায়ি। স্ত্রী মাছিতে এই চার প্রকার জীনের কোনটিই উপস্থিত নয়। উপরোক্ত প্রোটিন চারটিকে একত্রে MSL প্রোটিন বলা হয়। বিজ্ঞানীরা এও দেখিয়েছেন যে rox1 এবং rox2 এই দুইটি জিনের RNA, MSL প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি RNA-প্রোটিন কমপ্লেক্স (complex) তৈরী করে এবং সেটি ডোসেজ কমপেনসেশনে সাহায্য করে। এই rox - RNA গুলিই পুরুষ ড্রসোফিলার X ক্রোমোজোমের সঙ্গে MSL প্রোটিনগুলিকে একত্রিত হতে সাহায্য করে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

2.5.9 সারাংশ

জন্মের সময় কীভাবে জীনের লিঙ্গ নির্ধারণ হয়, তা নিয়ে অনেকদিন ধরেই নানা আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন জীবে লিঙ্গ নির্ধারণের ক্রিয়াকৌশলও ভিন্ন। লিঙ্গ নির্ধারণ প্রধানত ক্রোমোজোম নিয়ন্ত্রিত, তবে অনেক সময় হরমোন এবং পরিবেশের প্রভাবও লিঙ্গ নির্ধারণে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ হেটারোগ্যামেসিস বা সেক্স ক্রোমোজোম প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। পুরুষের ক্ষেত্রে সেক্স ক্রোমোজোমগুলি হল XY এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে XX। মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণে Y ক্রোমোজোম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ Y ক্রোমোজোমের উপস্থিতিতে পুরুষের এবং অনুপস্থিতিতে মহিলার সৃষ্টি হয়। Y ক্রোমোজোমের TDF জীনটিই এর জন্য দায়ী। মানুষের ক্ষেত্রে সেক্স ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট সংখ্যার তারতম্যের ফলে যে সকল বৈশিষ্ট্য জীনে প্রকাশ পায় তাদের সিনড্রোম বলে।

পুরুষের ক্ষেত্রে একটি X ক্রোমোজোম এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে দুটি X ক্রোমোজোম থাকা সত্ত্বেও জীনগত বৈশিষ্ট্য মহিলাদের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ হয় না। ডোসেজ কমপেনসেশনের ফলেই এটা সম্ভব হয়। Xist নামক X-ক্রোমোজোমাল একটি জীন ডোসেজ কমপেনসেশনে মূখ্য ভূমিকা পালন করে।

ড্রসোফিলা মাছিতে X-ক্রোমোজোমে এবং অটোজোমে অবস্থিত জীনের সংখ্যাগত ভারসাম্যের উপর লিঙ্গ নির্ধারণ নির্ভরশীল। যখন X-ক্রোমোজোম এবং অটোজোম সেটের অনুপাত অর্থাৎ X ঃ A, 1 অথবা 1 এর বেশি হয় তখন স্ত্রী ড্রসোফিলা এবং যখন X ঃ A, 0·5 বা এর কম হয় তখন পুরুষ ড্রসোফিলার সৃষ্টি হয়। ড্রসোফিলার লিঙ্গ নির্ধারণে Y ক্রোমোজোম কোনও ভূমিকা পালন করে না। Sxl, tra, ix, dsx প্রভৃতি জীনগুলিই এবং এই জীনগুলির থেকে সৃষ্ট RNA এবং প্রোটিনই প্রকৃতপক্ষে লিঙ্গ নির্ধারণে দায়ী। আবার msls এবং mle ড্রসোফিলার ডোসেজ কমপেনশেনে মূখ্য ভূমিকা পালন করে।

2.5.10 প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) সেক্স ক্রোমোজোম বলতে কি বোঝো? মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণে এই সেক্স ক্রোমোজোমের ভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

(২) বারবডি কাকে বলে? এর গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

(৩) ডোসেজ কমপেনসেশন বলতে কি বোঝ? কিভাবে Xist জীনটি ডোসেজ কমপেনসেশনে মূখ্য ভূমিকা পালন করে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

(৪) "Y ক্রোমোজোম মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে" — এই বক্তব্যটিতে TDF-এর ভূমিকা কতখানি তা যুক্তিসহ লিখুন।

(৫) ড্রসোফিলা মাছিতে কিসের দ্বারা লিঙ্গ নির্ধারিত হয়? Y ক্রোমোজোমের কোনও প্রভাব কি লিঙ্গ নির্ধারণে আছে? ব্রিজের পরীক্ষাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

(৬) ড্রসোফিলার লিঙ্গ নির্ধারণে 'নিউমারেটর', 'ডিনমিনেটর' এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জীনগুলির ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(৭) ড্রসোফিলার ডোসেজ কমপেনসেশনে কোন কোন জীন মূখ্য ভূমিকা পালন করে এবং তাদের কার্যপদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) হোমোগ্যামেটিক এবং হেটারোগ্যামেটিক সেক্স বলতে কি বোঝো?

(২) মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণে Y ক্রোমোজোমের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

(৩) টার্নার সিন্ড্রোম বলতে কি বোঝো? এই অস্বাভাবিকতার লক্ষণগুলি কি?

(৪) ক্লাইন ফেল্টার সিনড্রোমের ক্যারিওটাইপ কি? এই সিনড্রোমের লক্ষণগুলি বর্ণনা করুন।

(৫) জেনেটিক্সের সিন্ডারেলা কাকে বলে? এর কারণ কি?

(৬) সুপার ফিমেল বলতে কি বোঝেন? এর ক্যারিওটাইপ বর্ণনা করুন।

(৭) msl জীন সম্পর্কে যা জান লিখুন।

(৮) Xist কথাটির পুরো অর্থ কি? এই জীনের ভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

(৯) TDF কথাটির পুরো অর্থ কি? এর সম্পর্কে যা জান লিখুন।

(১০) লিওন তত্ত্ব বলতে কি বোঝেন?

একক 2.6 ❑ থ্যালাসেমিয়া (Thalassemia)

গঠন

2.6.1 প্রস্তাবনা

2.6.2 থ্যালাসেমিয়ার প্রকার

2.6.3 α-থ্যালাসেমিয়া

2.6.4 β-থ্যালাসেমিয়া

2.6.5 থ্যালাসেমিয়ার লক্ষণ

2.6.6 চিকিৎসা প্রণালী

2.6.7 সারাংশ

2.6.8 প্রশ্নাবলী

2.6.1 ভূমিকা

স্বাভাবিক মানুষের ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যা 46। এর মধ্যে 22 জোড়া হল অটোজোম এবং এক জোড়া হল সেক্স ক্রোমোজোম। থ্যালাসেমিয়া হল একটি অটোজোম বাহিত অস্বাভাবিকতা।

থ্যালাসেমিয়া কথাটি দুটি ভাগে বিভক্ত। থ্যালাসা এবং এমিয়া (Thalasa = the sea + emia = blood) — থ্যালাসা কথাটির অর্থ হল সমুদ্র এবং এমিয়া অর্থাৎ রক্ত।

থ্যালাসেমিয়া হল এমন একটি অস্বাভাবিকতা, যেটি পিতামাতা থেকে সন্তান সন্ততিতে যায়। এটি হল এক ধরনের অ্যানিমিয়া (anaemia) বা রক্তাল্পতা যেখানে হিমোগ্লোবিন তৈরীর জিনে ত্রুটি থাকে। আমরা জানি যে হিমোগ্লোবিন হল লোহিত রক্ত কণিকায় অবস্থিত এক ধরনের প্রোটিন, যেটি অক্সিজেন বহন করে।

2.6.2 থ্যালাসেমিয়ার প্রকার

বিভিন্ন ধরনের জিন, ভিন্ন ভাবে নিজেদের মধ্যে মিলিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের থ্যালাসেমিয়া গঠন করে। হিমোগ্লোবিন সাধারণত α এবং β এই দুই ধরনের প্রোটিন চেইন দিয়ে তৈরী। যদি হিমোগ্লোবিনের α-গ্লোবিন অংশে অসুবিধার জন্য থ্যালাসেমিয়ার সৃষ্টি হয়, তখন তাকে α (আলফা) থ্যালাসেমিয়া বলা হয়। যখন হিমোগ্লোবিনের β (বিটা) গ্লোবিন অংশে ত্রুটির ফলে উপরোক্ত অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয়, তখন তাকে β থ্যালাসেমিয়া বলা হয়।

2.6.3 α-থ্যালাসেমিয়া

পিতা এবং মাতার প্রত্যেকের দুটি করে জিন নিয়ে মোট 4টি জিন হিমোগ্লোবিনের α-গ্লোবিন অংশ সৃষ্টি করে। এই জিনগুলির কোনও একটিতে ত্রুটির ফলে অথবা কোনও জিন অনুপস্থিত থাকলে α থ্যালাসেমিয়া হয়ে থাকে।

α থ্যালাসেমিয়া আবার বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে।

(1) যে সমস্ত মানুষে উপরোক্ত 4টি জীনের একটিতে ত্রুটি থাকে, তারা হল থ্যালাসেমিয়া বহনকারী (silent carriers) এবং এদের মধ্যে এই রোগের কোন চিহ্নই দেখা যায় না।

(2) α গ্লোবিন অংশের দুটি জীনের ত্রুটির ফলে সামান্য রক্তাল্পতা (mild anemia) দেখা যায়। এরাই হল এই রোগের প্রকৃত বহনকারী (carriers)। এই ধরনের থ্যালাসেমিয়াকে α-থ্যালাসেমিয়া মাইনর (α-thalassemia minor) বলা হয়।

(3) α-গ্লোবিন অংশের তিনটি জীনের ত্রুটির ফলে যে থ্যালাসেমিয়ার সৃষ্টি হয়, তাকে হিমোগ্লোবিন H-অস্বাভাবিকতা বলা হয়ে থাকে। এতে রোগীরা ভীষণ ধরনের রক্তাল্পতার শিকার হন।

(4) যে সমস্ত শিশুদের উপরোক্ত চারটি জীনই ত্রুটিযুক্ত হয়, তারা সাধারণত জন্মের পূর্বেই অথবা পরে মারা যায়। এই ধরনের থ্যালাসেমিয়াকে α-থ্যালাসেমিয়া মেজর (α-thalassemia major) বলা হয়।

● যদি α থ্যালাসেমিয়া বহনকারী পিতা ও মাতার একটি শিশু সন্তান জন্মায়; তার মধ্যে সামান্য অথবা ভীষণ রক্তাল্পতা দেখা যেতে পারে অথবা শিশুটি স্বাস্থ্যবানও হতে পারে।

2.6.4 β-থ্যালাসেমিয়া

পিতা এবং মাতার প্রত্যেকের একটি করে জিন নিয়ে মোট দুটি জিন হিমোগ্লোবিনের β-গ্লোবিন অংশ তৈরী করে। যখন এই জিন দুটির একটি অথবা উভয়েই ত্রুটিপূর্ণ হয়, তখনই β-থ্যালাসেমিয়া হয়। β-থ্যালাসেমিয়া আবার দুই ধরনের হয় ঃ

(1) যদি দুটি জিনের মধ্যে একটি জিন ত্রুটিপূর্ণ হয়, তখন একজন ব্যক্তি এই রোগের বহনকারী হন এবং তার মধ্যে সামান্য রক্তাল্পতা দেখা যায়। এই ধরনের থ্যালাসেমিয়াকে β থ্যালাসেমিয়া মাইনর (β-thalassemia minor) বলা হয়।

(2) যদি দুটি জিনই ত্রুটিযুক্ত হয়, তাহলে একজন ব্যক্তি মধ্যবর্তী থেকে, ভীষণ ধরনের রক্তাল্পতার শিকার হন। এই দুই ধরনের অবস্থাকে যথাক্রমে β থ্যালাসেমিয়া ইন্টারমিডিয়া (β-thalassemia intermedia) এবং β থ্যালাসেমিয়া মেজর (β-thalassemia major) বলা হয়ে থাকে।

● যদি β-থ্যালাসেমিয়া বহনকারী পিতা ও মাতার একটি শিশু সন্তান জন্মায়; নীচের তিনটি ঘটনার যে কোন একটি ঘটতে পারে ঃ

(a) শিশুটি পিতা এবং মাতা দুজনের থেকেই স্বাভাবিক জিনদুটি পেতে পারে এবং শিশুটির রক্ত স্বাভাবিক হয়। এইরূপ ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে 25%।

(b) শিশুটি পিতা মাতার একজনের থেকে স্বাভাবিক জিন এবং অন্যজনের থেকে ত্রুটিযুক্ত জিন পেতে পারে এবং তার থ্যালাসেমিয়া মাইনর হতে পারে। এর সম্ভাবনা 50%।

(c) শিশুটি পিতা মাতা প্রত্যেকের থেকেই ত্রুটিপূর্ণ জিনদুটি পেতে পারে এবং এদের মধ্যে ভীষণ ধরনের রক্তাল্পতা দেখা যায়। এর সম্ভাবনা 25%।

2.6.5 থ্যালাসেমিয়ার লক্ষণ (Symptoms)

থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সাধারণত নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখতে পাওয়া যায়—

(১) দুর্বল ও ক্লান্ত হওয়া।

(২) গায়ের রং হালকা অথবা হলুদ হয়ে যাওয়া।

(৩) মাথা ব্যাথা হওয়া।

(৪) যকৃৎ এবং প্লীহার আকার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া।

(৫) হৃৎপিণ্ডের আকার বৃদ্ধি পাওয়া।
(৬) লোহিত রক্ত কণিকার আকার হ্রাস পায়।
(৭) রক্তে লোহিত রক্ত কণিকার আকৃতির পরিবর্তন হয়।
(৮) রক্তাল্পতা দেখা দেয়।
(৯) ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে হয়।
(১০) খিদে কমে যায় ইত্যাদি।

2.6.6 চিকিৎসা প্রণালী (Treatment)

নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়া রোগের চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

(১) **পরিশ্রুত রক্ত প্রবিষ্ট করা** (Blood transfusion) ঃ

যে সকল রোগীদের ক্ষেত্রে থ্যালাসেমিয়া ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, তাদের নিয়মিত পরিশ্রুত রক্ত প্রদানের মাধ্যমে এই রোগের চিকিৎসা করা হয়। এই পদ্ধতিতে একজন স্বাস্থ্যবান দাতার স্বাভাবিক লোহিত রক্ত কণিকা সূচের মাধ্যমে রোগীর শিরায় প্রবিষ্ট করানো হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিটি একটি নিয়মিত সময় অন্তর (সাধারণত 2 – 4 সপ্তাহ অন্তর) করা হয়। কারণ তাতে লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যা এবং হিমোগ্লোবিনের মাত্রা রক্তে স্বাভাবিক থাকে। পরিশ্রুত রক্ত গ্রহণ করে রোগী অনেক সুস্থ থাকেন, স্বাভাবিক জীবন যাপন করেন এবং অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারেন।

এই পদ্ধতি যেমন সুবিধাজনক, তেমনি অনেক অসুবিধাও এই পদ্ধতিতে আছে। এই পদ্ধতিতে রোগী যেমন তার জীবন ফিরে পান কিন্তু এটি খুব ব্যয়সাপেক্ষ। এই পদ্ধতি চলাকালীন অনেক ভাইরাস এবং ব্যাকটিরিয়া ঘটিত রোগ দাতা থেকে রোগীর দেহে প্রবেশ করতে পারে। শুধু তাই নয়, রোগীর দেহের রক্তে লোহার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যেটি রোগীর যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড এবং শরীরের অন্যান্য অংশের ক্ষতি করে। এই জন্য এই অতিরিক্ত লোহা দেহ থেকে বের করে দেওয়া অত্যন্ত জরুরী।

(২) **দেহের অতিরিক্ত লৌহ অপসারিত করা** (Iron chelation therapy) ঃ

যখন কোনও রোগী নিয়মিত পরিস্রুত রক্ত গ্রহণ করে, তখন তার দেহে অতিরিক্ত লোহা জমা হতে থাকে। শরীরের এই অতিরিক্ত লোহা, আয়রন চিলেশন থেরাপির দ্বারা শরীর থেকে অপসারিত করা হয়ে থাকে। আগেই বলা হয়েছে যে যদি এই অতিরিক্ত লোহা রোগীর দেহ থেকে অপসারণ করা না হয়, তাহলে রোগীর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ, যেমন যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদির ক্ষতি হয়।

ডিফেরোক্সামিন (deferoxamine) নামক একটি বিশেষ ঔষধ এইজন্য ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধটি রোগীর ত্বকের নীচে সারারাত ধরে একটি ছোট পোর্টেবেল পাম্পের সাহায্যে প্রবেশ করানো হয়। এই চিকিৎসা পদ্ধতির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে কিন্তু এটি খুব বেদনাদায়ক। সেইজন্য অনেক রোগী এই চিকিৎসাপদ্ধতি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। 2005 খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাস থেকে USA-তে ডিফেরাসিরক্স নামক একটি ঔষধ বড়ির মাধ্যমে বাজারে বিক্রির অনুমতি পেয়েছে।

যে সমস্ত রোগীদের দেহে অতিরিক্ত লোহা থাকে, তাদের কোন ভিটামিন বা আয়রন জাতীয় কোনও বস্তু খাওয়া নিষিদ্ধ।

(৩) **শল্যচিকিৎসা** (Surgery) ঃ

যখন রোগীর শরীরের কোনও অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে সেই অঙ্গটি দেহ থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। আগেই বলা হয়েছে যে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের যকৃৎ, প্লীহা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও রোগীর প্লীহা অত্যাধিক বড় হয়ে যায়, তখন সেটি উপরোক্ত পদ্ধতিতে বাদ দেওয়া যায়।

(৪) **অস্থি মজ্জা বা স্টেম কোষ এক দেহ থেকে অপসৃত করে অন্য দেহে সংযোজন** (Bone marrow or stem cell transplants) ঃ

কিছু থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের ক্ষেত্রে অস্থি মজ্জা বা স্টেম কোষ দাতার দেহ থেকে অপসৃত করে এদের দেহে সংযোজিত করা হয়েছে। এটি একটি বিপদজনক পদ্ধতি কিন্তু এটি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে।

(৫) **অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিসমূহ** ঃ

থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীরা সহজেই কোনও সংক্রমণের শিকার হয়। তাদের ভিন্ন ধরনের টীকাকরণের সাহায্য নিতে হয়।

রক্তাল্পতার জন্য ফোলিক অ্যাসিড বা ভিটামিন B-এর খুব প্রয়োজন হয়, কারণ এটি লোহিত রক্ত কণিকা গঠনে খুবই উপকারী। তাই রোগীদের নিয়মিত ভিটামিন B সেবন করা দরকার।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা জিন থেরাপি এবং আরও অন্যান্য পদ্ধতিতে থ্যালাসেমিয়া রোগটি সারাবার অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এমন দিন দূরে নেই, যেদিন থ্যালাসেমিয়ার আক্রান্ত কোনও শিশুর জন্মের আগেই তার দেহের স্টেম কোষে স্বাভাবিক জিনটি প্রবেশ করিয়ে শিশুটিকে থ্যালাসেমিয়া থেকে বাঁচানো সম্ভবপর হবে।

2.6.7 সারাংশ

থ্যালাসেমিয়া হল এমন এক ধরনের অস্বাভাবিকতা, যেটি পিতা মাতা থেকে সন্তান সন্ততিতে প্রকাশ পায়। থ্যালাসেমিয়া রোগীদের প্রধান সমস্যা হল রক্তাল্পতা, যেখানে লোহিত রক্ত কণিকার অক্সিজেন বহনকারী প্রোটিন হিমোগ্লোবিন তৈরীর জিনটি ত্রুটিযুক্ত থাকে।

থ্যালাসেমিয়া সাধারণত দুই ধরনের হয়, α (আলফা) থ্যালাসেমিয়া এবং β (বিটা) থ্যালাসেমিয়া। হিমোগ্লোবিনের α-গ্লোবিন অংশের ত্রুটিজনিত কারণে α থ্যালাসেমিয়া এবং β-গ্লোবিন অংশের ত্রুটিজনিত কারণে β থ্যালাসেমিয়া হয়ে থাকে। এই দুই ধরনের থ্যালাসেমিয়ার আবার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণগুলির মধ্যে প্রধান হল রক্তাল্পতা। এছাড়াও রোগীদের মধ্যে দুর্বলতা, মাথা ব্যাথা, গায়ের রং হলুদ হওয়া, যকৃৎ এবং প্লীহার আকারের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়।

নিয়মিত রোগীর দেহে পরিস্রুত রক্ত প্রবিষ্ট করানো, রোগীর দেহ থেকে অতিরিক্ত লৌহ অপসারণ করা প্রভৃতির মাধ্যমে রোগীরা ভয়ঙ্কর এই মারণরোগ থেকে মুক্তি পেতে পারে।

2.6.8 প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? থ্যালাসেমিয়া সাধারণত কয় প্রকারের হয় ও কি কি তা সংক্ষেপে বৈশিষ্ট্য সহ বর্ণনা করুন।

(২) থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণসমূহ এবং এই রোগের চিকিৎসাপ্রণালী সম্পর্কে যা জান লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) থ্যালাসেমিয়া রোগটি আসলে কি? কি দেখে আমরা বুঝতে পারি যে কোনও রোগী থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত?

(২) α ও β থ্যালাসেমিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

(৩) থ্যালাসেমিয়া রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রধান দুটি চিকিৎসাপদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

একক 2.7 ❑ পরিব্যক্তি বা মিউটেশন (Mutation)

গঠন

2.7.1 ভূমিকা

2.7.1 পরিব্যক্তির কারণ

2.7.1 ক্রোমোজোমাল মিউটেশন

2.7.1 ক্রোমোজোমের সংখ্যার পরিবর্তন

2.7.1 জিন মিউটেশন

2.7.1 বিষয় সংক্ষেপ

2.7.1 প্রশ্নাবলী

2.7.1 ভূমিকা

পরিব্যক্তি হল কোন প্রাণীর DNA-এর পরিমাণ, বিন্যাস, অথবা গঠনের কোনোও পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের ফলে কোন প্রাণীর জেনোটাইপ তার স্বাভাবিক জেনোটাইপের থেকে পরিবর্তিত হয়ে কোনও অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করতে পারে। একমাত্র জননকোষে যে পরিব্যক্তি হয়, সেটাই বংশানুক্রমে পিতা মাতা থেকে নবজাতকের দেহে প্রবেশ করে।

DNA-এর বিন্যাস বা পরিমাণের পরিবর্তনের ফলে যে পরিব্যক্তি হয়, তাকে ক্রোমোজোমাল পরিব্যক্তি (chromosomal mutation) বা ক্রোমোজোমাল অ্যাব্যারেশন (chromosomal aberration) বলা হয়। অপর পক্ষে DNA-এর একটি নির্দিষ্ট লোকাসে গঠনের পরিবর্তনের ফলে যে পরিব্যক্তির সৃষ্টি হয় তাকে জিন পরিব্যক্তি বা জিন মিউটেশন বলা হয়। সাধারণত পরিব্যক্তি বলতে আমরা জিন পরিব্যক্তিকেই বুঝি।

1901 খ্রিস্টাব্দে ডাচ উদ্ভিদবিদ হিউগো ডি ভ্রিস (Hugo de Vries) প্রথম হঠাৎ হঠাৎ উৎপত্তি হওয়া নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহের কারণ উদ্বাবন করতে গিয়ে পরিব্যক্তি বা মিউটেশনের কথা বলেন। তার 9 বছর পর টি. এইচ. মরগ্যান (T. H. Morgan) ড্রসোফিলার উপর প্রায় 500 পরিব্যক্তি খুঁজে পেতে সমর্থ হন।

2.7.2 পরিব্যক্তির কারণ

পরিব্যক্তি যখন তখন, যে কোন স্থানে হতে পারে। মিউটেশন স্বাভাবিক কারণেও হতে পারে আবার উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন যেমন আলট্রাভায়োলেট রশ্মি, X-রশ্মি, গামা (γ) রশ্মি ইত্যাদিও পরিব্যক্তি ঘটাতে সক্ষম। নিউট্রন, কসমিক রেডিয়েশন, α এবং β কণাও পরিব্যক্তির কারণ হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ, যেমন ফরম্যালডিহাইড, মাস্টার্ড গ্যাস, ক্যাফিন, কলচিসিন, তামাকের কিছু অংশ, কিছু ঔষধ, খাদ্য সংরক্ষক কিছু জিনিস এবং কীটনাশক পরিব্যক্তির কারণ হতে পারে।

2.7.3 ক্রোমোজোমাল মিউটেশন

ক্রোমোজোমের সংখ্যা বা গঠনের পরিবর্তনের ফলে যে মিউটেশন বা পরিব্যক্তির সৃষ্টি হয়, তাকে ক্রোমোজোমাল মিউটেশন বলা হয়।

● **ক্রোমোজোমের গঠনের পরিবর্তন ঃ**

ক্রোমোজোমের কোনও অংশের গঠনের পরিবর্তনের ফলে অনেক সময় পরিব্যক্তির সৃষ্টি হয়। কিন্তু এতে ক্রোমোজোমের সংখ্যার কোনও পরিবর্তন হয় না। এই ধরনের পরিব্যক্তি চার প্রকারের হতে পারে —

(ক) ডিলিশন (Deletion)

(খ) ডুপ্লিকেশন (Duplication)

(গ) ইনভারশন (Inversion)

(ঘ) ট্রান্সলোকেশন (Translocation)

ডিলিশন এবং ডুপ্লিকেশন-এ একটি ক্রোমোজোমে DNA-এর পরিমাপের পরিবর্তন ঘটে। ইনভারশনে ক্রোমোজোমের বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটে এবং ট্রান্সলোকেশনে ক্রোমোজোমের অংশের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে।

(ক) **ডিলিশন ঃ** ডিলিশন হল এমন একটি ক্রোমোজোমাল পরিব্যক্তি, যেখানে ক্রোমোজোমের একটি অংশ লুপ্ত (loss) হয়ে যায়। সেই অবলুপ্ত অংশটি ক্রোমোজোমটির অন্য কোনও অংশে গিয়ে পুনরায় যুক্ত হতেও পারে।

পরিব্যক্তি ঘটায় এমন কোনও বস্তু যেমন ডিলিশন ঘটাতে পারে, তেমনি রিকম্বিনেশনে ভুলের কারণেও ত্রুটি হতে পারে।

ডিলিশনে যেহেতু ক্রোমোজোমের একটি অংশ লুপ্ত হয়ে যায়, সেহেতু এই প্রকারের পরিব্যক্তি আর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না।

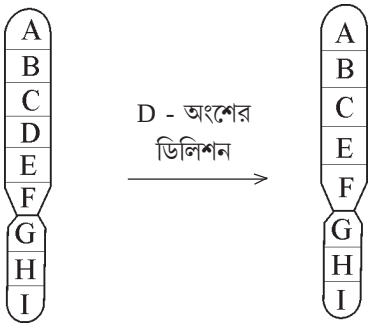

চিত্র 7.1 ঃ ক্রোমোজোমের একটি খণ্ডের ডিলিশন (এখানে D)

ডিলিশনের প্রকার কেমন হবে, সেটা নির্ভর করে সেই জিনগুলির উপর, যারা ডিলিশনের ফলে লুপ্ত হয়ে যায়। ডিপ্লয়েড প্রাণীদের উপর ডিলিশনের প্রভাব সেইরকম প্রকট হয় না, কারণ একটি ক্রোমোজোমের অবলুপ্ত জীনগুলির সেট তার হোমোলোগাস (homologous) ক্রোমোজোমে বর্তমান থাকে। কিন্তু হোমোলোগাস ক্রোমোজোমটি যদি কোন বাজে রোগের প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য (Recessive) বিশিষ্ট কোনও জীন বহন করে, তাহলে তার ফল মারাত্মক হয়। ডিলিশনের ফলে যদি কোনও ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার লুপ্ত হয়ে যায়, তবে সেটি অ্যাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমে (Acentric chromosome) পরিণত হয় এবং মিয়োসিসের মাধ্যমে লুপ্ত হয়ে যায়। এর ফলে পুরো জিনোম থেকে ক্রোমোজোমটির অবলুপ্তি ঘটে।

ক্রোমোজোমের বিভিন্ন অংশের অবলুপ্তির ফলে মানুষের মধ্যে অনেক প্রকার অস্বাভাবিকতা দেখতে পাওয়া যায়। এইরূপ একটি অস্বাভাবিকতা যা হেটারোজাইগাস ডিলিশনের ফলে হয়ে থাকে, তা হল **ক্রাই-ডিউ চ্যাট সিনড্রোম** (Cri - du - chat syndrome)। ক্রোমোজোম 5-এর ছোট বাহুর কিছু অংশের ডিলিশনের ফলেই এটি হয়। যে সব শিশুদের এই অস্বাভাবিকতা দেখা যায়, তারা মানসিক ভাবে অপরিণত হয়। তাদের শারীরিক কিছু দুর্বলতা থাকে এবং তারা যখন কাঁদে সেটা বিড়ালের 'মিউ' ডাকের মত শোনায়।

আর একটি হেটারোজাইগাস ডিলিশন, যেটি ক্রোমোজোম - 15-এর দীর্ঘ বাহুর একটি অংশের ডিলিশনের ফলে সৃষ্টি হয়। এর ফলে যে অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয়, তা হল **প্রেডার-উইলি সিন্ড্রোম** (Prader - Willi - Syndrome)। যে সব শিশুর মধ্যে এই অস্বাভাবিকতা দেখা যায়, তাদের দুগ্ধপানে অসুবিধা হয়, মানসিক পরিণতি আসতে দেরি হয় এবং তাদের ব্যবহার সাধারণ শিশুদের মত হয় না।

(খ) ডুপ্লিকেশন ঃ ডুপ্লিকেশন হল এমন একটি ক্রোমোজোম পরিব্যক্তি, যেখানে ক্রোমোজোমের একটি অংশ দ্বিগুণ হয়ে যায়। ডুপ্লিকেশন একটি প্রাণীর কাছে ক্ষতিকর হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। অসমান ক্রসিং ওভার (unequal crossing over) অনেকক্ষেত্রে ডুপ্লিকেশনের জন্য দায়ী।

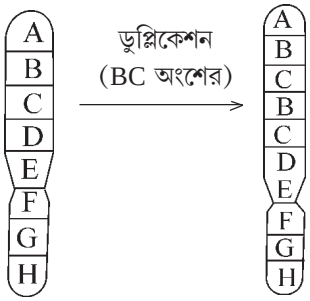

চিত্র 7.2 ঃ ক্রোমোজোমের একটি অংশের ডুপ্লিকেশন (এখানে BC)

ক্রোমোজোমের একটি অংশের ডুপ্লিকেশন পরপরও হতে পারে (tandem) আবার ভিন্ন স্থানেও হতে পারে। যখন দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া অংশে জিনের বিন্যাস আসল বিন্যাসের বিপরীতে হয়, তাকে বিপরীত ডুপ্লিকেশন বলে (reverse duplication)। যখন দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া ক্রোমোজোমের অংশ একটি ক্রোমোজোমের প্রান্তে পরপর থাকে, তাকে টার্মিনাল ডুপ্লিকেশন (terminal duplication) বলে।

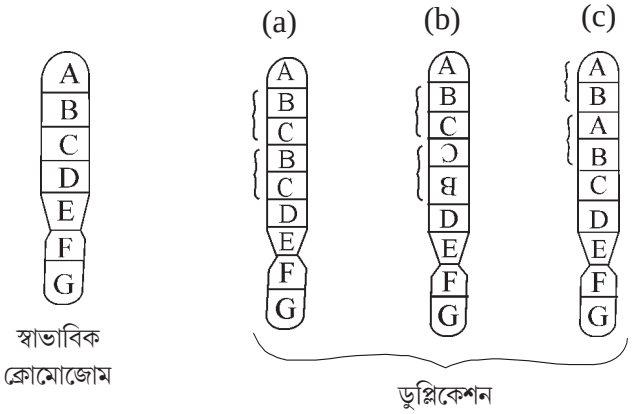

চিত্র 7.3 ঃ বিভিন্ন ধরনের ক্রোমোজোমাল ডুপ্লিকেশন ঃ (a) পর পর বা tandem (b) বিপরীত বা reverse (c) প্রান্তিক বা terminal

NSOU

(গ) ইনভারশন (Inversion) ঃ

ইনভারশন হল এমন একটি ক্রোমোজোমাল মিউটেশন যেখানে ক্রোমোজোমের একটি অংশ প্রথমে ক্রোমোজোম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং পরে 180^0 আবর্তন করে পুনরায় ঐ ক্রোমোজোমে যুক্ত হয়। যে অংশটি পুনরায় যুক্ত হয় সেটি যদি সেন্ট্রোমিয়ার যুক্ত হয়, তাহলে তাকে পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশন (pericentric inversion) বলে। যদি সেই পুনরায় যুক্ত হওয়া অংশটি ক্রোমোজোমের বাহুর একটি প্রান্তে যুক্ত হয় এবং যদি সেটি সেন্ট্রোমিয়ার মুক্ত হয়, তখন তাকে বলে পেরাসেন্ট্রিক ইনভারশন (peracentric inversion)।

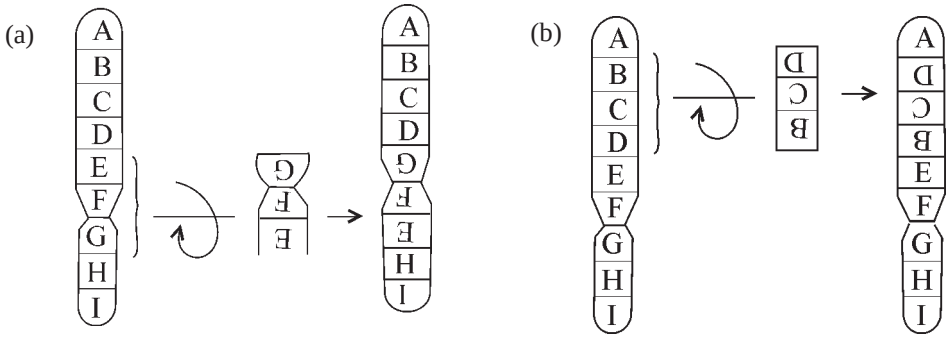

চিত্র 7.4 ঃ ইনভারশন (a) পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশন (সেন্ট্রোমিয়ার যুক্ত) (b) পেরাসেন্ট্রিক ইনভারশন (সেন্ট্রোমিয়ার মুক্ত)

(ঘ) ট্রান্সলোকেশন (Translocation) ঃ

ট্রান্সলোকেশন হল এমন একটি ক্রোমোজোমাল মিউটেশন যেখানে ক্রোমোজোমের একটি খণ্ডের অবস্থানগত পরিবর্তন হয়। ট্রান্সলোকেশন সাধারণত দুই প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথমটিতে একটি নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমেই সেই ক্রোমোজোমটির খণ্ড বিশেষের অবস্থানগত পরিবর্তন হয়। একে বলা হয় ইনট্রাক্রোমোজোমাল ট্রান্সলোকেশন (intrachromosomal translocation)। অপরটিতে একটি নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমের খণ্ড বিশেষ ঐ ক্রোমোজোম থেকে অন্য একটি ননহোমোলোগাস ক্রোমোজোমে স্থানান্তরিত হয়। একে ইনটারক্রোমোজোমাল ট্রান্সলোকেশন

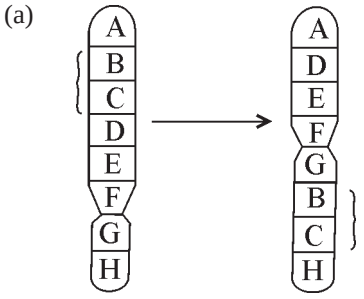

চিত্র 7.5 ঃ ননরেসিপ্রোকাল ইনট্রাক্রোমোজোমাল ট্রান্সলোকেশন

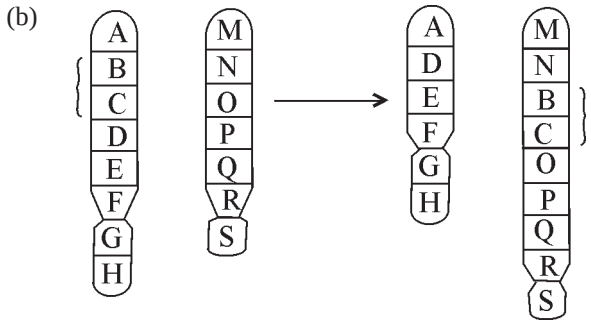

চিত্র 7.6 ঃ ননরেসিপ্রোকাল ইনটারক্রোমোজোমাল ট্রান্সলোকেশন

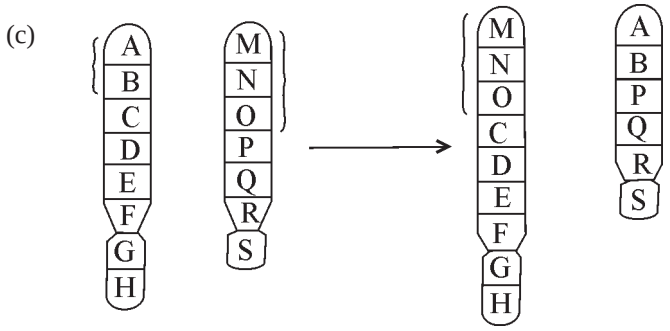

রেসিপ্রোকাল ইন্টারক্রোমোজোমাল ট্রান্সলোকেশন

চিত্র 7.7 ঃ ট্রান্সলোকেশন ঃ (a) ননরেসিপ্রোকাল ইনট্রাক্রোমোজোমাল, (b) ননরেসিপ্রোকাল ইন্টারক্রোমোজোমাল, (c) রেসিপ্রোকাল ইন্টারক্রোমোজোমাল।

(interchromosomal translocation) বলা হয়। যদি এই স্থানান্তর একটি ক্রোমোজোম থেকে অন্য একটি ক্রোমোজোমে হয়, তখন তাকে নন রেসিপ্রোকাল ট্রান্সলোকেশন (nonreciprocal translocation) বলে। অপরপক্ষে যদি একটি ক্রোমোজোমের খণ্ডবিশেষ অপর একটি ক্রোমোজোমে এবং অপর ক্রোমোজোমটির খণ্ডবিশেষ প্রথম ক্রোমোজোমটিতে স্থানান্তরিত হয়, তখন তাকে রেসিপ্রোকাল ট্রান্সলোকেশন (reciprocal translocation) বলা হয়।

2.7.4 ক্রোমোজোমের সংখ্যার পরিবর্তন

ক্রোমোজোমের সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যার থেকে বেড়ে বা কমে গেলেও অনেক সময় পরিব্যক্তির সৃষ্টি হয়। মিয়োসিস I অথবা II -তে নন-ডিসজাংশনের ফলে অপত্য কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা স্বাভাবিকের থেকে বেড়ে বা কমে যায়। এই ধরনের পরিব্যক্তি ভিন্ন ধরনের হতে পারে।

(ক) **অ্যানিউপ্লয়ডি** (Aneuploidy)

অ্যানিউপ্লয়ডিতে এক বা একাধিক ক্রোমোজোম নর্মাল বা স্বাভাবিক ক্রোমোজোম সেটের সঙ্গে যুক্ত হয় অথবা হ্রাস পায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অ্যানিউপ্লয়ডি প্রাণীদের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হয়।

ডিপ্লয়েড প্রাণীদের ক্ষেত্রে আমরা ৪ প্রকারের অ্যানিউপ্লয়ডি দেখতে পাই।

(১) **নালিসোমি** (Nullisomy) ঃ

এইক্ষেত্রে এক জোড়া হোমোলোগাস ক্রোমোজোম স্বাভাবিক সেটের থেকে হ্রাস পায় এবং কোষটি 2N – 2-তে পরিণত হয়। মিয়োসিসে ননডিসজাংশনের ফলেই এইরূপ হয়।

(২) **মেনোসোমি** (Monosomy) ঃ

মোনোসোমিক কোষে স্বাভাবিক ক্রোমোজোম সেট থেকে একটি ক্রোমোজোম কমে যায় এবং কোষটি 2N–1-এ পরিণত হয়।

(৩) **ট্রাইসোমি** (Trisomy) ঃ

ট্রাইসোমিক কোষে একটি ক্রোমোজোম বেশী থাকে। তার মানে হল এই কোষগুলিতে একটি ক্রোমোজোমের

তিনটি অনুকৃতি (copy) থাকে এবং অন্য ক্রোমোজোমগুলির দুটি করে অনুকৃতি থাকে। একটি ট্রাইজোমিক কোষ হল 2N + 1।

(৪) **টেট্রাসোমি** (tetrasomy) ঃ

টেট্রাসোমিক কোষে এক জোড়া ক্রোমোজোম বেশী থাকে। তার মানে একটি ক্রোমোজোমের ৪টি অনুকৃতি থাকে এবং অন্য ক্রোমোজোমগুলির দুটি করে অনুকৃতি থাকে। একটি টেট্রাসোমিক কোষ হল 2N + 2।

● **ট্রাইসোমি** 21 (Trisomy 21) ঃ

এই রকম ঘটনা তখনই ঘটে যখন কোনও কোষে 21 নম্বর ক্রোমোজোমটির তিনটি অনুকৃতি থাকে। প্রায় 1 লক্ষ মানুষের মধ্যে 1430 জন এই অস্বাভাবিকতার শিকার। এই নির্দিষ্ট প্রকারের অস্বাভাবিকতাকে বলা হয় ডাউন সিনড্রোম (Down syndrome)।

যে শিশুরা এই অস্বাভাবিকতায় ভোগে তাদের বুদ্ধি কম হয়, হাত ছোট হয়, উচ্চতা কম হয়, চোখের নীচের চামড়া ফুলে যায় ইত্যাদি।

মায়েদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই রোগের প্রবণতা আরও বাড়তে থাকে। দেখা গেছে যে 45 থেকে 47 বছরের বয়সী মায়েদের শিশুদের এই প্রকার রোগ হবার প্রবণতা সবথেকে বেশি হয়। (10000 এ 333 জন)।

(খ) **মোনোপ্লয়ডি** (Monopolidy) ঃ

কোনোও মোনোপ্লয়েড প্রাণীতে, সাধারণত দুটি ক্রোমোজোম সেটের স্থানে একটি মাত্র ক্রোমোজোম সেট থাকে। মোনোপ্লয়ডিকে অনেক সময় হ্যাপ্লয়ডিও বলা হয়। মোনোপ্লয়ডি সচারচর দেখা যায় না। কিছু কিছু প্রজাতিতে আমরা মোনোপ্লয়েড প্রাণীদের দেখতে পাই। উদাহরণ হিসেবে পুরুষ বোলতা, পিপীলিকা এবং মৌমাছিদের কথা বলা যেতে পারে।

(গ) **পলিপ্লয়ডি** (Polyploidy) ঃ

পলিপ্লয়েড প্রাণীদের ক্রোমোজোম সেটের সংখ্যা স্বাভাবিকের থেকে বেশী হয়। উদ্ভিদ জগতেই আমরা বেশীর ভাগ পলিপ্লয়ডি দেখতে পাই। একমাত্র উত্তর অ্যামেরিকার মিষ্টি জলের এক প্রকারের সাকার মাছেদের মধ্যে এবং কিছু স্যালামান্ডারের (Salamander) মধ্যে আমরা পলিপ্লয়ডি দেখতে পাই। এছাড়া কোনও জীবন্ত প্রাণীতে আমরা পলিপ্লয়ডি দেখতে পাই না।

পলিপ্লয়ডি আবার দুই ধরনের হয়। অটোপলিপ্লয়ডি (Autopolyploidy) এবং অ্যালোপলিপ্লয়ডি (Allopolyploidy)। এই দুটি প্রকারই আমরা উদ্ভিদ জগতে দেখতে পাই।

● **অটোপলিপ্লয়ডি ঃ**

অটোপলিপ্লয়ডিতে সমস্ত ক্রোমোজোম সেটগুলি একই প্রজাতি থেকে উদ্ভূত হয়। মিয়োসিসে কিছু ত্রুটির জন্যই এটা হয় এবং এর ফলে ডিপ্লয়েড (2N) অথবা ট্রিপ্লয়েড (3N) জনন কোষের সৃষ্টি হয়। যখন একটি ডিপ্লয়েড জনন কোষ (2N) একটি স্বাভাবিক জনন কোষের (N) সঙ্গে মিলিত হয়। তাহলে এর থেকে যে অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়, তাতে তিনটি ক্রোমোজোম সেট থাকে (3N)। বাজারে যে চাষ করা কলা পাওয়া যায়, সেটি টিপ্লয়েড অটোপলিপ্লয়েডের একটি উদাহরণ।

● **অ্যালোপলিপ্লয়ডি** (Allopolyploidy) ঃ

অ্যালোপলিপ্লয়ডিতে ক্রোমোজোমের সেটগুলি ভিন্ন ধরনের প্রজাতি থেকে উদ্ভূত হয়। কিন্তু প্রজাতিগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়। এই ঘটনার সৃষ্টি হয় নিম্নরূপ ভাবে ঃ

প্রথমে দুটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সংকরায়ণ (hybridisation) ঘটানো হয় এবং এর থেকে যে অপত্য কোষটির সৃষ্টি হয় (2N) তাতে পিতা এবং মাতার প্রত্যেকের হ্যাপ্লয়েড (N) ক্রোমোজোম সেট থাকে। এর পরে অপত্য কোষের ক্রোমোজোম সেটটিকে দ্বিগুণ করে দিয়ে আমরা (4N) অ্যালোপলিপ্লয়েড পেতে পারি।

সংকরায়ণের মাধ্যমে যে সব উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়, তাদের মধ্যে বন্ধাত্ব দেখতে পাওয়া যায়।

1928 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী কারপেচেনকো (Karpechenko) প্রথম, বাঁধাকপি (*Brassica oleracea*) এবং মূলোর (*Raphanus sativus*) মধ্যে সংকরায়ণ ঘটিয়ে অ্যালোপলিপ্লয়েড তৈরী করেন। এদের দেখতে বাঁধাকপি এবং মূলার মধ্যবর্তি হয়েছিল এবং এদের নাম দেওয়া হয়েছিল *Raphanobrassica* (দুটি জেনাসের মধ্যবর্তী নাম)।

কৃষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যালোপলিপ্লয়েড হল গম (*Triticum aestivum*), যা সংকরায়ণের মাধ্যমে চাষ করা হয়।

2.7.5 জিন মিউটেশন

কোনও জিনের অনুক্রমের (gene sequence) পরিবর্তনের ফলে যে পরিব্যক্তির সৃষ্টি হয়, তাকে জিন পরিব্যক্তি বলে। একটি মাত্র বেস পেয়ারে (base pair) DNA ক্রমের যে পরিবর্তন হয়, তাকে পয়েন্ট মিউটেশন (point mutation) বলা হয়। জিন মিউটেশন আবার নিম্নলিখিত প্রকারের হয়ে থাকে ঃ

(১) **বেস পেয়ার সাবসটিটিউশন মিউটেশন** (base pair substitution mutation) ঃ

একেই পয়েন্ট মিউটেশন বলা হয়। এটি একটি জিনের পরিবর্তন, যেখানে একটি বেস পেয়ার অন্য একটি বেস পেয়ারের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

উদা ঃ AT থেকে GC হওয়া।

(২) **ট্রান্জিসন মিউটেশন** (Transition mutation) ঃ

এটি একটি নির্দিষ্ট প্রকারের বেস পেয়ার সাবসটিটিউশন মিউটেশন যেখানে একটি পিউরিন-পিরিমিডিন বেস পেয়ার অন্য একটি পিউরিন - পিরিমিডিন বেস পেয়ারে পরিবর্তিত হয়।

উদা ঃ AT থেকে GC, GC থেকে AT, TA থেকে CG, এবং CG থেকে TA।

(৩) **ট্রান্সভারসন মিউটেশন** (transversion mutation) ঃ

এটি হল অন্য এক প্রকারের বেস পেয়ার সাবসটিটিউশন মিউটেশন যেখানে একটি পিউরিন-পিরিমিডিন বেস পেয়ার অপর একটি পিরিমিডিন-পিউরিন বেস পেয়ারে পরিবর্তিত হয়।

উদা ঃ AT থেকে TA, GC থেকে CG, AT থেকে CG এবং GC থেকে TA।

আমরা জানি যে অ্যামাইনো অ্যাসিড (amino acid) ক্রমানুসারে সজ্জিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন তৈরী করে। সুতরাং প্রোটিনে অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিবর্তনের ফলেও অনেক সময় পরিব্যক্তির সৃষ্টি হয়। নিম্নলিখিত পরিব্যক্তিগুলি হল এই প্রকারের ঃ

(৪) **মিসসেনস পরিব্যক্তি** (missense mutation) ঃ

এটি হল এক ধরনের জিন মিউটেশন যেখানে DNAএর একটি বেস পেয়ার পরিবর্তনের ফলে mRNA কোড (Codon)-এর পরিবর্তন ঘটে এবং এর ফলে প্রোটিনের পলিপেপটাইডে স্বাভাবিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের স্থানে একটি ভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড যুক্ত হয় এবং এর ফলে একটি ভিন্ন ফেনোটাইপ সৃষ্টি হয়।

উদা ঃ একটি AT থেকে GC পরিবর্তন, DNA-এর নিম্নরূপ পরিবর্তন ঘটায়।

$$\begin{array}{l} 5' - AAA - 3' \\ 3' - TTT - 5' \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} 5' \; GAA - 3' \\ 3' \; CTT - 5' \end{array}$$

এই পরিবর্তনের ফলে mRNA কোডনের নিম্নরূপ পরিবর্তন ঘটে।

$$5' - AAA - 3' \rightarrow 5' - GAA - 3'$$

এর ফলে অ্যামাইনো অ্যাসিড লাইসিন (lysine) অ্যামাইনো অ্যাসিড গ্লুটামিন-এ পরিবর্তিত হয় (glutamine)।

(৫) **নিউট্রাল পরিব্যক্তি** (Neutral mutation) ঃ

এটি হল এমন এক ধরনের জিন মিউটেশন যেখানে DNA -এর একটি বেস পেয়ারের পরিবর্তনের ফলে mRNA কোডন এর পরিবর্তন ঘটে কিন্তু এর ফলে যে ভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড, স্বাভাবিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের স্থান দখল করে সেটি সেই একই প্রোটিন তৈরী করে।

উদা ঃ AT থেকে GC পরিবর্তন, কোডনে নিম্নরূপ পরিবর্তন ঘটায়।

$$5' - AAA - 3' \rightarrow 5' - AGA - 3'$$

এর ফলে লাইসিনের (lysine)-এর স্থানে আর্জিনিন (arginine) তৈরী হয়। কিন্তু যেহেতু এই দুটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের ধর্মগুলি প্রায় একই রকমের হয়, এর ফলে প্রোটিনের ধর্মের কোন পরিবর্তন হয় না।

(৬) **ননসেনস পরিব্যক্তি** (Nonsense mutation) ঃ

ননসেনস পরিব্যক্তিতে DNA-এর বেস পেয়ারে এমন একটি পরিবর্তন ঘটে যার ফলে mRNA কোডন দ্বারা একটি নির্দিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডের স্থানে UAC, UAA অথবা UGA এই অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলির কোনও একটি তৈরী হয়। আমরা জানি যে, এই তিনটি অ্যামাইনো অ্যাসিড RNA থেকে প্রোটিন তৈরী হওয়া বন্ধ করে দেয়।

উদা ঃ AT থেকে TA পরিবর্তন DNA-এর নিম্নরূপ পরিবর্তন ঘটায়।

$$\begin{array}{l} 5' - AAA - 3' \\ 3' - TTT - 5' \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} 5' \; TAA - 3' \\ 3' \; ATT - 5 \end{array}$$

এর ফলে mRNA কোডন-এর নিম্নরূপ পরিবর্তন হয়।

$$5' - AAA - 3' \rightarrow 5' - UAA - 3'$$

(৭) **সাইলেন্ট পরিব্যক্তি** (Silent mutation) ঃ

সাইলেন্ট পরিব্যক্তিতে জিনের বেস পেয়ারে পরিবর্তনের ফলে mRNA কোডনের যে পরিবর্তন হয় তার ফলে একই অ্যামাইনো অ্যাসিড পূর্বের অ্যামাইনো অ্যাসিডের স্থানে তৈরী হয়। এর ফলে প্রোটিনের স্বাভাবিক ধর্মের কোনও পরিবর্তন হয় না।

উদা ঃ AT থেকে GC পরিবর্তনের ফলে mRNA কোডন নিম্নরূপে পরিবর্তিত হয়

$$5' - AAA - 3' \rightarrow 5' - AAG - 3'$$

এই দুটি অ্যামাইনো অ্যাসিডই লাইসিন (lysine) তৈরী করে।

(৮) **ফ্রেমশিফ্ট পরিব্যক্তি** (Frameshift mutation) ঃ

ফ্রেমশিফ্ট পরিব্যক্তি হল এমন একটি মিউটেশন যেখানে এক বা একাধিক বেস পেয়ার জিনে যুক্ত হয় অথবা জিন থেকে মুক্ত হয়। এর ফলে mRNA কোডন-এর পরিবর্তন হয় এবং এর ফলে যে প্রোটিন তৈরী হয় তা ধর্মের দিক থেকে পরিবর্তিত হয়।

2.7.6 সারাংশ

কোনও প্রাণীর DNA-এর পরিমাণ, বিন্যাস অথবা গঠনের কোনও পরিবর্তনকেই পরিব্যক্তি বা মিউটেশন বলা হয়। পরিব্যক্তি স্বাভাবিক কারণেও হতে পারে আবার কৃত্রিম উপায়েও সৃষ্টি করা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ সমূহ, কিছু ঔষধ, কীটনাশক ও খাদ্যসংরক্ষক কিছু বস্তু, পরিব্যক্তির কারণ হতে পারে।

ক্রোমোজোমের সংখ্যার পরিবর্তনের ফলে এবং গঠনের পরিবর্তনের ফলে ক্রোমোজোমাল পরিব্যক্তি সৃষ্টি হয়। ক্রোমোজোমের কোনও অংশের গঠনের পরিবর্তনের ফলে সাধারণত 4 ধরনের মিউটেশনের সৃষ্টি হয়। এগুলি হল - ডিলিশন, ডুপ্লিকেশন, ইনভারশন এবং ট্রান্সলোকেশন। আবার ক্রোমোজোমের সংখ্যা স্বাভাবিকের থেকে বেড়ে বা কমে গেলেও পরিব্যক্তির সৃষ্টি হয়। এগুলি হল অ্যানিউপ্লয়ডি, মনোপ্লয়ডি এবং পলিপ্লয়ডি।

ক্রোমোজোমাল পরিব্যক্তির মত আমরা জিন পরিব্যক্তিও দেখতে পাই যা কোনও জিনের অনুক্রমের পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে। জিন মিউটেশন আবার বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন বেস পেয়ার সাবসটিটিউশন, ট্রানজিশন, ট্রান্সভারসন, নিউট্রাল, মিসসেনস, ফ্রেমশিফট, সাইলেন্ট এবং ননসেনস পরিব্যক্তি।

2.7.7 প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) পরিব্যক্তি বা মিউটেশন বলতে কি বোঝো? এটি কি কি কারণে হতে পার? সংক্ষেপে ক্রোমোজোমাল মিউটেশন বর্ণনা করুন।

(২) পরিব্যক্তি কয় প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত আলোচনা করুন।

(৩) জিন মিউটেশন কি? সংক্ষেপে বিভিন্ন ধরনের জিন মিউটেশনগুলির বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) পরিব্যক্তি বা মিউটেশনের কারণগুলি কি?

(২) স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম পরিব্যক্তি বলতে কি বোঝেন?

(৩) ডিলিশন এবং ডুপ্লিকেশন বলতে কি বোঝেন?

(৪) ইনভারশন এবং ট্রান্সলোকেশন পরিব্যক্তি কিভাবে ঘটে থাকে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

(৫) ক্রাই-ডিউ-চ্যাট এবং প্রেডার উইলি সিনড্রোম বলতে কি বোঝেন?

(৬) ট্রাইজোমি - 21 বলতে কি বোঝ? এর লক্ষণগুলি কি কি?

(৭) অটোপলিপ্লয়ডি এবং অ্যালোপলিপ্লয়ডি বলতে কি বোঝ? এদের মধ্যে প্রধান তফাৎ কি?

(৮) মিসসেনস, ননসেনস এবং সাইলেন্ট মিউটেশন বলতে কি বোঝেন?

(৯) নিউট্রাল মিউটেশন কি? এর সঙ্গে ফ্রেমশিফ্ট মিউটেশনের পার্থক্য কোথায়?

(১০) ট্রান্সজিশন এবং ট্রান্সভারসন মিউটেশনের মধ্যে পার্থক্যটি উল্লেখ কর। একটি উদাহরণ দিন।

একক 3 ❑ কলা শারীরবৃত্ত ও জৈব রসায়ন (Histophysiology and Biochemistry)

গঠন

3.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

3.2 পিটুইটারী ও থাইরয়েড গ্রন্থির কলা শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য এবং এদের দ্বারা নিঃসৃত হরমোনগুলির কার্যকারিতা

- 3.2.1 পিটুইটারী গ্রন্থি
  - 3.2.1.1 পিটুইটারী গ্রন্থির কলাস্থানিক সংগঠন
  - 3.2.1.2 পিটুইটারী হরমোনের কার্যকারিতা
  - 3.2.2.1 থাইরয়েড গ্রন্থির কলাস্থানিক সংগঠন
  - 3.2.2.2 থাইরয়েড হরমোনগুলির জৈবসংশ্লেষ পদ্ধতি
  - 3.2.2.3 থাইরয়েড হরমোনগুলির কার্যকারিতা
- 3.2.3 অনুশীলনী

3.3 শ্বসনে হিমোগ্লোবিনের কার্যকারিতা

- 3.3.1 হিমোগ্লোবিনের রাসায়নিক গঠন
- 3.3.2 অক্সিজেন পরিবহনে হিমোগ্লোবিনের ভূমিকা
- 3.3.3 কার্বনডাই অক্সাইড পরিবহনে হিমোগ্লোবিনের ভূমিকা
- 3.3.4 অনুশীলনী

3.4 ABO রক্ত শ্রেণী ও Rh ফ্যাক্টর

- 3.4.1 ABO রক্ত শ্রেণী
- 3.4.2 Rh ফ্যাক্টর
- 3.4.3 অনুশীলনী

3.5 স্নায়ু ও স্নায়ুসন্নিধির মধ্য দিয়ে উদ্দীপনা পরিবহণ

- 3.5.1 স্নায়ুতন্তুর গঠন ও বৈশিষ্ট্য
- 3.5.2 স্নায়ুতন্তুর বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য
- 3.5.3 নার্ভতন্তুতে আবেগের উৎপত্তি
- 3.5.4 স্নায়ুতন্তুতে আবেগের পরিবহন
- 3.5.5 স্নায়ুসন্ধি
  - 3.5.5.1 স্নায়ুসন্ধির গঠন
  - 3.5.5.2 স্নায়ুসন্ধির মাধ্যমে উদ্দীপনা পরিবহন
- 3.5.6 অনুশীলনী

3.6 সারাংশ

3.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

3.8 উত্তরমালা

3.1 প্রস্তাবনা

প্রাণী দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও গ্রন্থি তাদের শারীরবৃত্তীয় কাজ পরিচালনা করে। তাই এই অঙ্গ ও গ্রন্থি সম্বন্ধে আমাদের কিছু ধারণা থাকা দরকার। এই এককে আমরা প্রাণীদেহের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তঃসারী গ্রন্থি তথা পিটুইটারী ও থাইরয়েড গ্রন্থি সম্বন্ধে আলোচনা করব। এছাড়া এই এককে স্নায়ু ও স্নায়ুসন্ধির মধ্য দিয়ে উদ্দীপনা পরিবহন, অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহনে হিমোগ্লোবিনের ভূমিকা এবং ABO ও Rh রক্ত শ্রেণী সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

উদ্দেশ্য ঃ

এই একক পাঠ করে নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে ঃ—

(i) পিটুইটারী ও থাইরয়েড গ্রন্থির কলাস্থানিক সংগঠন ও তাদের দ্বারা নিঃসৃত হরমোনের কাজ।
(ii) স্নায়ু ও স্নায়ুসন্ধির মধ্য দিয়ে উদ্দীপনা পরিবহন।
(iii) শ্বসনজনিত গ্যাস অর্থাৎ অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহনে হিমোগ্লোবিনের ভূমিকা।
(iv) ABO রক্ত শ্রেণী।
(v) Rh ফ্যাক্টর এবং তার গুরুত্ব।

3.2 পিটুইটারী ও থাইরয়েড গ্রন্থির কলা-শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য এবং এদের দ্বারা নিঃসৃত হরমোনগুলির কার্যকারিতা

3.2.1 পিটুইটারী গ্রন্থি ঃ

দেহের বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির মধ্যে পিটুইটারী গ্রন্থি এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়। কারণ এটি কমপক্ষে **দশটি** হরমোন ক্ষরণ করে এবং অন্যান্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। এই গ্রন্থিকে 'Master gland' ও বলা হয়। মানুষের পিটুইটারী গ্রন্থিটি ক্ষুদ্র এবং চ্যাপ্টাকৃতি আঙুলের ন্যায়, ওজন 0.5-0.6 গ্রাম, দৈর্ঘ্য আনুমানিক 1 সেমি. ও প্রস্থ 1-1.3 সে.মি. হয়। সন্তানসম্ভবা অথবা সদ্যজন্মদাত্রী স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে গ্রন্থির ওজন সামান্য বেশী হয়। পিটুইটারী গ্রন্থি **হাইপোফাইসিস** (Hypophysis) নামেও পরিচিত।

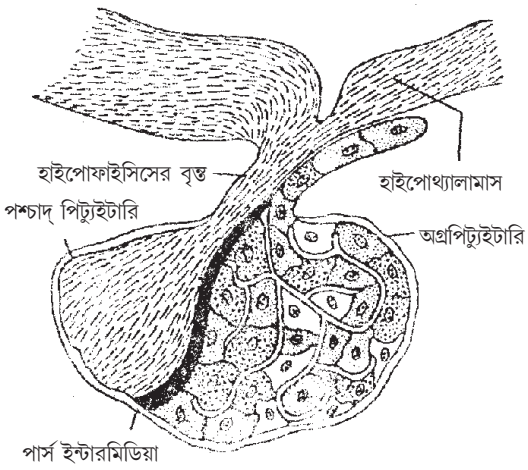

চিত্র নং 1 ঃ পিটুইটারি গ্রন্থির প্রস্থচ্ছেদ

অবস্থান ঃ পিটুইটারী গ্রন্থি মস্তিষ্কের মূলদেশে সেলা টারসিকা (Sella turcica) নামে অস্থিময় গহ্বরে পাওয়া যায়। গ্রন্থিটি পিটুইটারী বৃন্ত বা হাইপোফেসিয়াল বৃন্তের সাহায্যে হাইপোথ্যালামাসের সাথে যুক্ত থাকে। শারীরবৃত্তীয় কারণে পিটুইটারী গ্রন্থি দুটি স্পষ্ট অংশে বিভাজিত। অংশ দুটি হল অগ্র পিটুইটারী বা অ্যাডিনোহাইপোফাইসিস (Adenohypophysis) এবং পশ্চাদ্ পিটুইটারী বা নিউরোহাইপোফাইসিস

NSOU

(Neurohypophysis) অগ্র ও পশ্চাৎ পিট্যুইটারী গ্রন্থির মধ্যবর্তী স্থানে একটি ক্ষুদ্র ও তুলনায় প্রায় রক্তসংবহন বর্জিত অঞ্চল থাকে, অঞ্চলটি **পার্স ইন্টারমিডিয়া** (Pars intermedia) নামে পরিচিত। মানব প্রজাতিতে পার্শ ইন্টারমিডিয়া অঞ্চলটি প্রায় অনুপস্থিত থাকলেও নিম্নেতর প্রাণীতে পার্স ইন্টারমিডিয়া অনেকটা বড় ও অনেকটা বেশী ক্রিয়াশীল (চিত্র 1)।

3.2.1.1 কলাস্থানিক সংগঠন ঃ

পিট্যুইটারী গ্রন্থির অ্যাডিনোহাইপোসাইসিসের তিনটি উপবিভাজন আছে। যথা— **পার্স ডিসটালিস** বা অগ্রখন্ড, **পার্স ইনফানডিবিউলারিস** (পার্স টিউবারাসা) ও পার্স ইন্টারমিডিয়া। নিউরোহাইপোফাইসিসকে সাধারণত তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়, যথাঃ মিডিয়ান এমিনেন্স (টিউবার সিনোরিয়ামের চোঙের মত প্রলম্বন), ইনফানডিবিউলার বৃন্ত ও ইনফানডিবিউলার প্রসেস বা প্রবর্ধন।

A. অ্যাডিনোহাইপোফাইসিস

পার্স ডিসটালিস (Pars distalis) বা অগ্রখন্ড ঃ এটি হাইপোফাইসিসের সর্ববৃহৎ বিভাজন। এটি হাইপোফাইসিসের 75% অংশ এবং গ্রন্থিময় কোষে রচিত।

- কোষগুলো রজ্জুতে সূক্ষ্ম প্রাচীরের অসংখ্য রক্ত সাইনাস সমৃদ্ধ এবং অনিয়তাকার রজ্জুতে বিন্যস্ত থাকে।
- গ্রন্থিকোষগুলি দুই প্রকারের হয়, যথা- ক্রোমোফিল এবং ক্রোমোফোব।
- ক্রোমোফিল কোষ দুই প্রকারের— অ্যাসিডোফিল এবং বেসোফিল। এদের যথাক্রমে আলফা (α) কোষ ও বিটা (β) কোষও বলা হয়।
- ক্রোমোফোর কোষগুলিকে চিফ (chief) কোষ বা C-কোষ বা রিজার্ভ (Reserve) কোষ বলে।

আলফা (α) কোষ বা অ্যাসিডোফিল ঃ

- এই কোষগুলি 14-19 μm ব্যাসযুক্ত এবং গোলাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি।
- ক্রোমোফোব কোষগুলির থেকে আকারে বড় এবং কোষপর্দা সুস্পষ্ট।
- সাইটোপ্লাজমে অসংখ্য ক্ষুদ্র দানা আছে যেগুলি বিভিন্ন রঞ্জকাসক্ত যথা- ইওসিন, অ্যাসিড ফুকসিন, অরেঞ্জ ডি এবং এ্যাডোকারমাইন।
- রঞ্জনধর্মীতা অনুযায়ী এই কোষগুলি দুই ধরনের হয়। যেমন, *Orangiophils* অথবা α-*অ্যাসিডোফিলস্* এবং *Carminophils* অথবা ε *(এপসিলন) অ্যাসিডোফিলস্।*
- গলগি যন্ত্র নিউক্লিয়াসের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত ও সুগঠিত।
- মাইটোকনড্রিয়া দন্ডাকার।
- 35% অ্যাসিডোফিল কোষ পিট্যুইটারী অংশে থাকে।
- Orangiophils কোষ সোমাটোট্রফিন (STH) হরমোন এবং Carminophils ল্যাক্টোজেনিক হরমোন (প্রোল্যাকটিন, লিউটোট্রপিক হরমোন বা LTH) ক্ষরণ করে। এই কোষগুলিকে যথাক্রমে সোমাটোট্রফ ও ম্যামোট্রফ বলে।

বেসোফিল বা বিটা (β) কোষ।

আলফাকোষ থেকে আকারে বড়। পারআয়োডিক-স্কিফ (PAS) রঞ্জক দ্বারা রঞ্জিত করে শনাক্ত করা যায়। কারণ এই কোষের দানাগুলি গ্লাইকোপ্রোটিন চরিত্রের হয়। কোষগুলি হিমাটক্সিলিন দ্বারা দুর্লভভাবে রঞ্জিত হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীতে দুই প্রকার বেসোফিল পরিলক্ষিত হয়, যথা— β বেসোফিল বা থাইরোট্রফ এবং δ ।

বেসোফিল বা গোনাডোট্রফ

- β বেসোফিল অ্যালডিহাইড ফুকসিন রঞ্জকাসক্ত।

- δ বেসোফিল অ্যালডিহাইড ফুকসিন রঞ্জকাসক্ত নয়।
- β বেসোফিল তুলনামূলকভাবে বড় এবং বহুসংখ্যক দানা পরিধীয় সাইটোপ্লাজমে পুঞ্জীভূত থাকে।
- দানাগুলি ঘন এবং 100-150nm ব্যাসযুক্ত।
- এরা থাইরোট্রপিক হরমোন (TSH) ক্ষরণ করে।
- δ বেসোফিল ফলিক্‌ল উদ্দীপক হরমোন FSH এবং লিউটিনাইজিং হরমোন (LH) ক্ষরণ করে।
- 15% বেসোফিল কোষ পিট্যুইটারীর এই অংশে থাকে।

ক্রোমোফোব বা 'C' কোষ।

ইহা আকারে ছোট এবং স্বল্প সাইটোপ্লাজম যুক্ত। সাইটোপ্লাজমে বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত কোন দানা নেই। যদিও ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে প্রমাণিত যে কিছু কোষ ক্ষুদ্র দানাযুক্ত।

(ii) পার্স ইন্টারমিডিয়া (Pars intermedia)

- মানবদেহের পিট্যুইটারীর পারস্ ইন্টারমিডিয়া অংশটি কম উন্নত এবং অস্পষ্টভাবে বিভেজিত।
- হাইপোফাইসিসের মাত্র 2% স্থান অধিকার করে থাকে। কিন্তু ইঁদুরে 19% অংশই পার্স ইন্টারমিডিয়া।
- কোষগুলি বহুভূজাকার অথবা প্রিজমের মত ও বেসোফিলিক থাকে।
- সাইটোপ্লাজমে 200μm-300μm ব্যাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা থাকে।
- শুধুমাত্র মেলানোসাইট উদ্দীপন হরমোন (Melanocyte stimulating hormone ; MSU) ক্ষরণ করে।

(iii) পার্স টিউবেরালিস (Pars tuberalis) :

- একে পার্স ইনফান্ডিবুলারিসও বলা হয়।
- হাইপোফাইসিসের স্বল্প স্থান জুড়ে থাকে।
- স্থূলতা 25μ থেকে 60μm এবং বৃন্ত জামার হাতার মত দেখায়।
- অত্যন্ত রক্তবাহ সমৃদ্ধ হয়।
- পার্স টিউবারলিসের আবরণী কলায় প্রধানত ঘনকাকার, স্তম্ভাকার প্রকৃতি কোষ থাকে।
- এই ঘনকাকার স্তম্ভাকার কলাকোষ আকারে 12μm-18μm ও বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র দানা অথবা ক্ষেত্রবিশেষে কলয়েড বিন্দু সমৃদ্ধ।
- কোষের মাইটোকনড্রিয়া ক্ষুদ্র দন্তের ন্যায়।
- কোষগুলির কোনও হরমোন ঘটিত কাজ নেই।

B. নিউরোহাইপোফাইসিস (Neurohypophysis) :

(i) ইনফান্ডিবুলার প্রসেস বা পার্স নার্ভোসা (Pars Nervosa) ঃ এই অঞ্চলের কোষে বিভিন্ন আকারের দানার প্রাচুর্যতা লক্ষ্য করা যায়। এই দানাগুলি কোষ-অ্যালাম-হিমাটক্সিলিন রঞ্জক দ্বারা ঘনভাবে রঞ্জিত হয়। এদের হেরিং বস্তু (Hearing bodies) বলে। এই বস্তুগুলি প্রকৃতপক্ষে হাইপোথ্যালামো হাইপোফাইসিয়াল স্নায়ুতন্ত্রের অ্যাসোপ্লাজমস্থ স্নায়ুজ ক্ষরণ বস্তু (neuro-secretory materials)। এইগুলি পরবর্তীকালে অক্সিটোসিন (Oxytocin) এবং ভেসোপ্রেসিন (vasopressin) রূপে ক্ষরিত হয়।

- এই অঞ্চলের অন্তর্বর্তী স্থানে পিট্যুইসাইট অবস্থিত।
- পিট্যুইসাইটের সাইটোপ্লাজমে চর্বিবিন্দু, দানা এবং রঞ্জক বস্তু দেখা যায়।
- রূপাঘটিত রঞ্জনবস্তু প্রয়োগে বিজারণ ক্রিয়া দ্বারা কোষগুলি কালো রং ধারণ করে এবং চার প্রকার পিট্যুইসাইট কোষ শনাক্ত করা যায়, যথা—রেটিকুলা-পিট্যুইসাইট, মাইক্রোপিট্যুইসাইট, ফাইব্রোপিট্যুইসাইট এবং অ্যাডিনোপিট্যুইসাইট।

গ্রন্থিতে রক্ত সরবরাহ ঃ পিট্যুইটারী গ্রন্থির রক্ত সরবরাহ অস্বাভাবিক প্রকৃতির ও ক্ষরণক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। গ্রন্থির আধারস্থিত এবং অন্তঃক্যারোটিড ধমনী থেকে উৎপন্ন দুটি ইনফিরিয়ার হাইপোফেসিয়েল ধমনী গ্রন্থির পশ্চাদখন্ড ও অগ্রখন্ডের সেলুলয়েডে শাখা বিতরণ করে। অন্তঃক্যারোটিড ধমনী থেকে উৎপন্ন

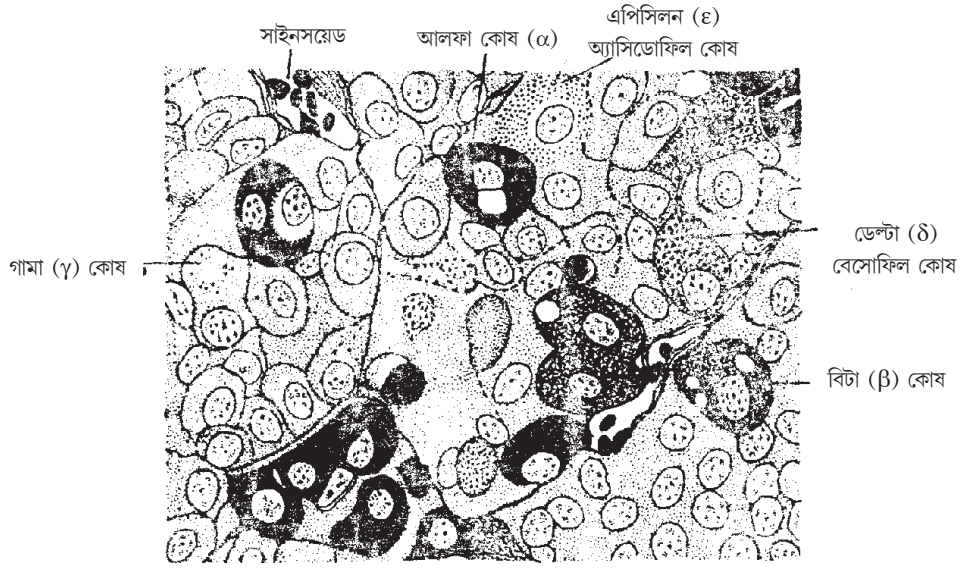

চিত্র নং 2 ঃ অগ্র পিট্যুইটারি গ্রন্থির কোষীয় গঠন

কতিপয় সুপরিয়ার হাইপোফেসিয়াল ধমনী ও পশ্চাদ সংযোগী ধমনী হাইপোথ্যালামাসের সাধ্যিক এমিনেন্সে জালকরূপে বিস্তৃত থেকে পিট্যুইটারী বৃন্তে প্রসারিত। সাধ্যিক এমিনেন্সের জালিকায় সংশ্লিষ্ট উপশিরা অগ্রমস্তকের সাইনুনয়েড জালিকার সঙ্গে যুক্ত থেকে *হাইপোফাইসিয়োপোর্টাল* (Hypophysioportal) তন্ত্র সৃষ্টি করেছে (চিত্র নং 2)।

3.2.1.2 পিট্যুইটারী হরমোনের কার্যকারিতা

A. অগ্র পিট্যুইটারী

(i) সোমাটোট্রপিক হরমোন (STH) :

- প্রোটিন সংশ্লেষ উদ্দীপিত করে অধিকাংশ কোষ ও কলার সার্বিক বৃদ্ধি ঘটায়।
- এই হরমোনের হ্রাসক্রিয়ায় বামনত্ব (dwarfism) প্রকাশ পায়।
- অতিক্রিয়ার ফলে দৈত্যাকৃতি (gigantism) এবং অ্যাক্রোমেগালি (acromegaly) হয়।

(ii) প্রোল্যাকটিন (P.R.H/L.T.H)

- বিভিন্ন প্রজাতিতে বহুবিধ জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ করে, যেমন ইঁদুর জাতীয় (rodents) প্রাণীতে ডিম্বাশয়ের কর্পাস লুটিয়াম থেকে প্রোজেস্টেরোন ক্ষরণে উদ্বুদ্ধ করে, ডিম্বাশয়ের হরমোন দ্বারা উত্তেজনাপ্রাপ্ত স্তনগ্রন্থি থেকে দুগ্ধ ক্ষরণে উদ্দীপনা জোগায়।

(iii) ফলিক্‌ল উদ্দীপন হরমোন (FSH)

- ডিম্বাশয় ফলিক্‌ল বৃদ্ধি সম্পাদন করে।
- শুক্রাশয়ের সারটোলি কোষে শুক্রাণুর পূর্ণাঙ্গতা।

(iv) লিউটিনাইজিং হরমোন (LH)

- শুক্রাশয়ের লিডিগকোষে টেস্টোস্টেরন সংশ্লেষ উদ্দীপিতকরণ।
- ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বনিঃসরণে উদ্দীপনা জোগায়।
- ইস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টেরণ ক্ষরণ উদ্বুদ্ধ করে।

(v) থাইরয়েড উদ্দীপন হরমোন (TSH)

- থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধিতে ও ক্ষরণে সাহায্য করে।
- হরমোনের হ্রাস ক্রিয়ায় পিট্যুইটারী মিক্সিডিমা (Myxedema) রোগ হয়।

(vi) অ্যাডরিনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন (ACTH)

- অ্যাডরেনাল গ্রন্থির কর্টেক্স থেকে কর্টিকো-স্টেরয়েড সংশ্লেষ বৃদ্ধি করে ও গ্রন্থি থেকে হরমোন ক্ষরণেও উদ্দীপনা জোগায়।
- গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোন উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং
- ACTH কে ''ডায়াবেটোজেনিক হরমোন' বলা হয়।

এই হরমোনের অতিক্রিয়ায় **কুশিং সিনড্রোমের (Cushing's syndrome)** লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(vii) মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন (MSH)

- দেহের মেলানিন রঙ্গকের বিস্তারে সাহায্য করে।

B. পশ্চাদ পিট্যুইটারী

(i) অ্যান্টিডিউরেটিক হরমোন (ADH) বা ভাসোপ্রেসিন (Vasopressin)

- বৃক্ক দ্বারা জল পুনঃশোষণ বৃদ্ধি পায়।
- রক্তবাহ সংকোচন ও রক্ত চাপ বৃদ্ধি ঘটায়।
- গ্লাইকোজেনোলাইটিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।
- হরমোনের হ্রাস ক্রিয়ায় বহুমূত্র (diabetes insipidus) রোগ হয়।

(ii) অক্সিটোসিন (Oxytocin) :

- স্তনগ্রন্থি থেকে দুগ্ধ ক্ষরণ ও জরায়ুর সংকোচন উদ্দীপিত করে।

3.2.2 থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland) ঃ

মানুষের থাইরয়েড গ্রন্থি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির মধ্যে একটি বৃহৎ ও অত্যন্ত কার্যকরী গ্রন্থি। গ্রন্থিটি ওজনে 25-40 গ্রাম। থাইরয়েড দুটি পার্শ্বীয় খণ্ডে গঠিত। পার্শ্বীয় খণ্ড দুটি সরু ইস্থমাস (isthmus) বা যোজকের সাহায্যে পরস্পর যুক্ত থাকে।

অবস্থান ঃ থাইরয়েড গ্রন্থি শ্বাসনালীর অগ্রে বা বাক্ যন্ত্রের নীচের দিকে অবস্থিত।

3.2.2.1 কলাস্থানিক গঠন ঃ

থাইরয়েড গ্রন্থি গোলাকার, 0.02-0.9 মিমি ব্যাসের আবদ্ধ ও পুঞ্জীভূত গোলাকার অথবা ডিম্বাকার থলিকায় আবৃত থলিকাগুলো আকারে বিভিন্ন প্রকারের এবং কোলয়েড পদার্থে ভূণ থাকে। থলিকাগুলি ঘনকাকার আবরণী কোষে নির্মিত। থলিকাগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে রক্তসমৃদ্ধ যোগকলার জালক থাকে। এখানে কিছু লিম্ফোসাইট ও হিস্টোসাইট থাকতে পারে। থলিকা আস্তরণের ঘনকাকার আবরণী কোশ থেকে ক্ষরণ পদার্থ থলিকার অভ্যন্তরে সঞ্চিত থাকে। হরমোনের বহিঃকোষীয় সঞ্চয় পদ্ধতি অত্যন্ত উন্নত মানসম্পন্ন। থলিকাসমূহ অতি-পাতলা ভিত্তি পর্দা পরিবেষ্টিত। রৌপ্য অভিরঞ্জনে বিরঞ্জিত অবস্থায় থলিকাগুলো সূক্ষ্ম জালকাকার তন্তুতে পরিবৃত থাকে।

পরাণুবীক্ষণ যন্ত্রে থাইরয়েড থলিকায় দু'প্রকার কোষ শনাক্ত করা যায়। যথা- **ফলিকিউলার আবরণী কোষ**

বা প্রধান কোষ এবং **প্যারাফলিকিউলার কোষ** (চিত্র নং 3)।

ফলিকিউলার আবরণী কোষ

আবরণী কোষের উচ্চতার তারতম্য থাকলেও এরা সাধারণত ঘনকাকার থেকে শল্কাকারে হয়।

নিউক্লিয়াস বৃত্তাকার, কেন্দ্রে অবস্থিত ও স্বল্প ক্রোমাটিনবিশিষ্ট এবং এক বা একাধিক নিউক্লিওলাস সমৃদ্ধ।

সাইটোপ্লাজম বেসোফিলিস প্রকৃতির।

মাইটোকনড্রিয়া সরু দন্ডাকার ও গলগিবডি সাধারণত নিউক্লিয়াসের ওপরের দিকে অবস্থিত।

সাইটোপ্লাজমে লিপিড বিন্দু থাকে। এই বিন্দুগুলি Aniline Blue এবং PAS রঞ্জকাযুক্ত হয়।

সাইটোপ্লাজমের শীর্ষদেশ অসংখ্য ঝিল্লীবন্ধ, ঘন ও 0.5μm থেকে 0.7μm ব্যাসের লাইসোসোমের সন্ধান পাওয়া যায়।

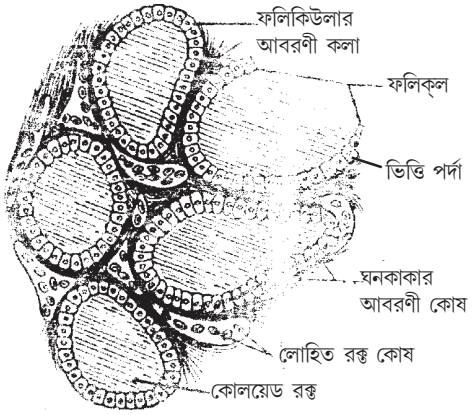

চিত্র নং 3 ঃ থাইরয়েড গ্রন্থির আণুবীক্ষণিক গঠন

প্যারাফলিকিউলার কোষ ঃ

থলিকা আবরণী ও আন্তঃথলিকা স্থানে অবস্থিত।

স্বল্প সংখ্যক।

এই কোষগুলি হাল্কা কোষ (light cell) মাইটোকনড্রিয়া সমৃদ্ধ, C-কোষ (C-cell) এবং অ্যালটিমোব্রাঙ্কিয়েল কোষ (Ultimobranchial cell) নামেও পরিচিত।

কোষগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে সিলভার নাইট্রেট রঞ্জন প্রথায় রঞ্জিত করা যায়। এর ফলে সাইটোপ্লাজমের দানাগুলি বাদামি অথবা কালো বর্ণ ধারণ করে।

কোষগুলি রক্তের ক্যালসিয়াম হ্রাসকারী হরমোন ক্যালসিটোনিন (Calcitonin) ক্ষরণ করে।

3.2.2.2 থাইরয়েড হরমোনগুলির জৈবসংশ্লেষ পদ্ধতি ঃ

থাইরয়েড হরমোন সংশ্লেষের জন্য অন্য একটি প্রয়োজনীয় রসায়ন হল আয়োডিন। শাকসব্জি, ফলমূল, এবং বিশেষত সামুদ্রিক মাছ আয়োডিনে ভরপুর থাকে। খাদ্যবস্তুর আয়োডিন আয়োডাইডে পরিণত হয়ে অন্ত্র দ্বারা শোষিত হয়। অগ্র-পিট্যুইটারী গ্রন্থি ক্ষরিত TSH থাইরয়েড গ্রন্থি দ্বারা আয়োডাইড গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করে (চিত্র নং 4)। থাইরয়েড গ্রন্থিতে আয়োডিন পরিবহন ও থাইরয়েড হরমোন সশ্লেষ প্রক্রিয়াটি নীচে বর্ণিত হলো—

3.2.2.3 থাইরয়েড হরমোনগুলির কার্যকারিতা ঃ

- থাইরয়েড হরমোন বহু বংশানুর প্রতিরূপন (প্রতিচয়ন) বৃদ্ধি ঘটায়।
- দেহের সমস্ত অথবা প্রায় সমস্ত কলার ক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি করে।
- থাইরক্সিনের প্রভাবে দেহের অধিকাংশ কোষের মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যা এবং আকার বৃদ্ধি পায়, মাইটোকনড্রিয়ার সামগ্রিক ঝিল্লী তলের ক্ষেত্রফল বর্ধিত হয়।

থাইরয়েড হরমোনের প্রভাবে Na, K—ATpase উৎসেচকের বৃদ্ধি ঘটে।

কোষে দ্রুত গ্লুকোজ গ্রহণ এবং কার্বোহাইড্রেট বিপাকের প্রায় সমস্ত দিক বর্ধিত গ্লাইকোলাইসিস, বর্ধিত গ্লুকোনিওজেনেসিস, খাদ্যনালীতে বর্ধিত শোষণ এবং বর্ধিত ইনসুলিন ক্ষরণ উদ্দীপিত করে।

দেহের সমস্ত কোষের বিপাক বৃদ্ধি করে।
কোষ দ্বারা মুক্ত মেদাম্ল জারণ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করে।

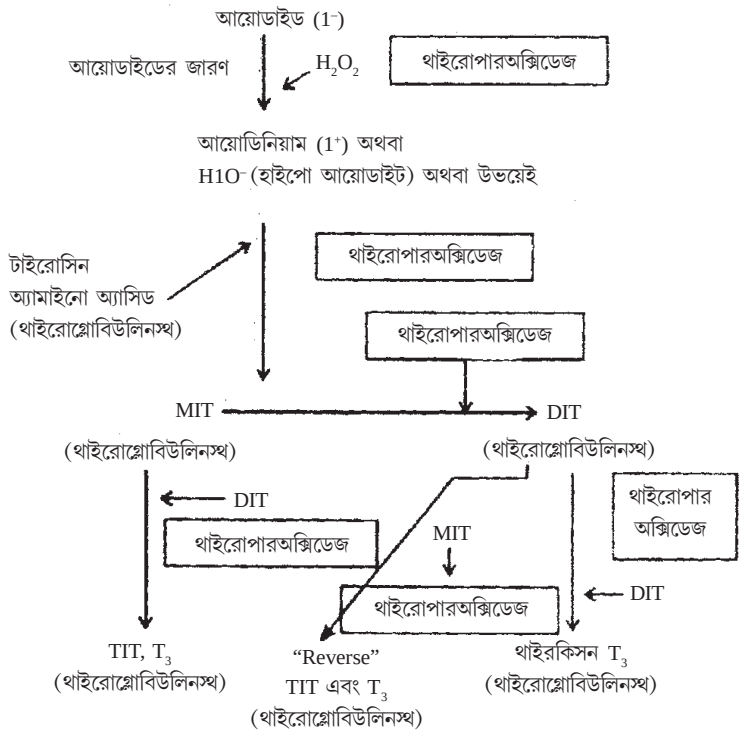

চিত্র নং 4 ঃ থাইরয়েড হরমোনগুলির জৈবসংশ্লেষ পদ্ধতি

দেহের সমস্ত কোষের বিপাক বৃদ্ধি করে।
হৃৎপিন্ডের উত্তেজিতার (excitability) উপর থাইরক্সিনের সরাসরি প্রভাব আছে।
মানসিক তৎপরতা ও স্মৃতিশক্তির বিকাশেও এই হরমোনের ভূমিকা আছে।
সক্রিয় কলার অধিকাংশের O_2 চাহিদা বৃদ্ধি করে। এর ফলে তাপ উৎপাদন ও B.M.R বাড়ে।
থাইরক্সিন হিমোপয়োসিসের (haemopoiesis) সঠিক মাত্রা বজায় রাখে।
ক্যালসিটোনিন অস্থিতে ক্যালসিয়াম সঞ্চয়ের উন্নতি ঘটায় ও বহিঃকোষীয় তরলে ক্যালসিয়াম আয়নের ঘনত্ব হ্রাস করে।

3.2.3 অনুশীলনী-1

প্রথম স্তম্ভে দেওয়া হরমোনের সঙ্গে দ্বিতীয় স্তম্ভে দেওয়া বৈশিষ্ট্য বা কার্যের মিল বার করুন।

১	২
(i) STH	কর্টিকোস্টেরয়েড সংশ্লেষ বৃদ্ধি করে।
(ii) ACTH	বৃক্ক দ্বারা জল পুনঃশোষণ বৃদ্ধি করে।

NSOU

(iii) ADH	কোষ ও কলার সার্বিক বৃদ্ধি।
(iv) থাইরক্সিন	ক্যালসিয়াম আয়নের ঘনত্ব হ্রাস করে।
(v) LH	দেহের বিপাকীয় হার বৃদ্ধি করে।
(vi) ক্যালসিটোনিন	ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বনিঃসরণ।

3.3 শ্বসনে হিমোগ্লোবিনের কার্যকারিতা

হিমোগ্লোবিন শ্বসনজনিত O_2 এবং CO_2 পরিবহনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 98% অক্সিজেন লোহিত রক্ত কণিকায় উপস্থিত হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যৌগ গঠন করে পরিবাহিত হয় এবং 20% কার্বন ডাই-অক্সাইড হিমোগ্লোবিনের দ্বারা পরিবাহিত হয়।

3.3.1 হিমোগ্লোবিনের রাসায়নিক গঠন

হিমোগ্লোবিন একটি অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড বহনকারী সংযুক্ত প্রোটিন। প্রতিটি হিমোগ্লোবিন অণুতে 96% গ্লোবিন (globin) নামক প্রোটিন এবং 4% লৌহঘটিত লাল রঞ্জক অণু 'হিম' বর্তমান। হিম এর উপস্থিতির

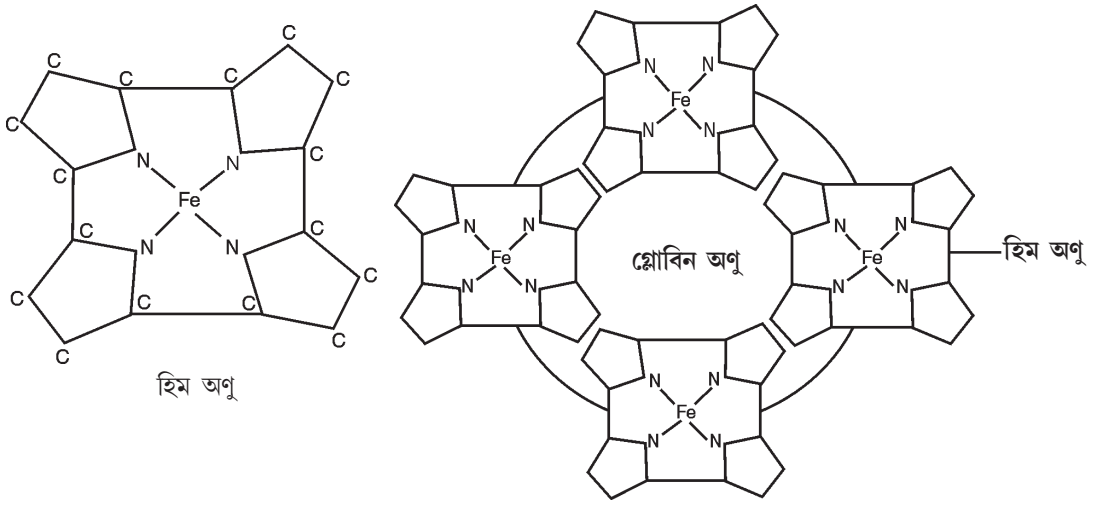

হিম অণু + গ্লোবিন অণু = হিমোগ্লোবিন

চিত্র নং 5 ঃ হিমোগ্লোবিনের গঠন

জন্য লোহিত কণিকার রং লাল হয়। হিম অংশ অতিরিক্ত ঘনত্বযুক্ত অক্সিজেনপূর্ণ স্থানে অর্থাৎ ফুসফুসের অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বল্প অক্সিজেন যুক্ত স্থানে অর্থাৎ কলায় বা কোষে ঐ অক্সিজেন মুক্ত করে। হিমোগ্লোবিনের প্রতিটি অণুতে চারটি লৌহঘটিত হিম অণু থাকে, অর্থাৎ প্রত্যেক হিমোগ্লোবিন অণুতে একটি গ্লোবিন প্রোটিন চারটি হিম অণুর সাথে যুক্ত থাকে। গ্লোবিন প্রোটিনে চারটি করে পলিপেপটাইড শৃঙ্খল থাকে (চিত্র নং 5)।

3.3.2 অক্সিজেন পরিবহনে হিমোগ্লোবিনের ভূমিকা

হিমোগ্লোবিনের প্রতিটি অণুতে চারটি লৌহঘটিত হিম অণু থাকে। একটি হিম অণু একটি অক্সিজেন অণুর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ এক অণু হিমোগ্লোবিন চার অণু অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হবার ক্ষমতা রাখে। যদি চারটি হিম অণুযুক্ত হিমোগ্লোবিন অণুকে Hb_4 দ্বারা চিহ্নিত করা হয় তাহলে ঃ—

$$Hb_4 + O_2\ Hb_4O_2 + O_2\ Hb_4O_4 + O_2\ Hb_4O_6 + O_2\ Hb_4O_8$$

কিন্তু একটি হিমোগ্লোবিন অণুর প্রত্যেকটি হিম অণু সব সময় অক্সিজেন যুক্ত হয় না। এটি নির্ভর করে শরীরে অক্সিজেনের চাহিদা এবং লভ্যতার উপর। যখন চারটি হিম অণুই অক্সিজেনযুক্ত হয় তখন 1 gm হিমোগ্লোবিন অণু 1.34ml O_2 বহন করতে পারে।

লোহিত রক্ত কণিকার অক্সিজেন ও হিমোগ্লোবিনের যৌগকে **অক্সিহিমোগ্লোবিন** বলে। এই অক্সিহিমোগ্লোবিন রূপেই হিমোগ্লোবিন রক্তে অক্সিজেন পরিবহন করে। অক্সিহিমোগ্লোবিন গঠনের পরিমাণ রক্তের আংশিক চাপের (partial pressure) উপর নির্ভর করে। ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন লোহিত রক্ত কণিকার কোষ পর্দা অতিক্রম করে হিমোগ্লোবিনের সান্নিধ্যে আসে এবং অক্সিহিমোগ্লোবিন গঠিত হয়। অক্সিজেন বিযুক্ত হিমোগ্লোবিন (Hb) অণুতে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) অক্সিজেনকে প্রতিস্থাপিত করে। এই হাইড্রোজেন আয়নকে সহজেই হিমোগ্লোবিন অণুর সাথে যুক্ত বা বিযুক্ত করা যায় এবং এটি নির্ভর করে রক্তের pH-এর উপর। যখন রক্তের pH কম হয় তখন H^+ হিমোগ্লোবিনের (Hb) সাথে যুক্ত থাকে। কিন্তু pH বেশী হলে Hb, হাইড্রোজেন আয়ন নিযুক্ত হয়। হিমোগ্লোবিন H^+ বিযুক্ত হলে, অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয় এবং অক্সিহিমোগ্লোবিন গঠন করে। বিক্রিয়াটি নিম্নে দেখানো হল ঃ

$H^+Hb^- + O_2 \longrightarrow HbO_2 + \longleftarrow H^+$

(হাইড্রোজেন আয়নযুক্ত হিমোগ্লোবিন) (অক্সিহিমোগ্লোবিন)

এই বিক্রিয়ার ফলে মুক্ত হাইড্রোজেন আয়ন লৌহ কণিকার পটাসিয়াম বাইকার্বোনেটের সাথে যুক্ত হয় $KHbO_2$ ও H_2CO_3 গঠন করে।

$$KHb + O_2 + KHCO_3 \longrightarrow KHbO_2 + H_2CO_3$$

(হিমোগ্লোবিন) (পটাশিয়াম বাইকার্বনেট) (কার্বনিক অ্যাসিড)

কার্বনিক অ্যাসিড ভেঙে কার্বনডাইঅক্সাইড (CO_2) ও জল (H_2O) তৈরী করে। এই CO_2 রক্তের সাহায্যে কলায় পরিবাহিত হয়।

98% অক্সিজেনই লোহিত রক্ত কণিকায় উপস্থিত হিমোগ্লোবিনের সাথে যৌগ গঠন করে পরিবাহিত হয়। অক্সিহিমোগ্লোবিন (HbO_2) রক্তের সাহায্যে কলায় পৌঁছালে অক্সিজেন মুক্ত হয় ও অক্সিহিমোগ্লোবিন পুনরায় হিমোগ্লোবিনে পরিণত হয়। কিন্তু অক্সিহিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন যুক্ত হওয়ার জন্য হাইড্রোজেন আয়নের প্রয়োজন হয়। এই হাইড্রোজেন আয়ন অক্সিহিমোগ্লোবিনের অক্সিজেনকে প্রতিস্থাপিত করে এবং অক্সিজেনকে মুক্ত করে। এই মুক্ত অক্সিজেন কলায় পরিবাহিত হয়। কোষের বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত কার্বন-ডাইঅক্সাইড ব্যাপন প্রক্রিয়ায় লোহিত রক্ত কণিকায় প্রবেশ করে এবং জলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরী করে। কিছু পরিমাণ কার্বনিক অ্যাসিড ভেঙে হাইড্রোজেন আয়ন ও হাইড্রোজেন কার্বনেট বা বাইকার্বনেট আয়নে পরিণত হয়।

$$CO_2 + H_2O = H_2CO_3 = H^+ + HCO_3^-$$

এই হাইড্রোজেন আয়নই অক্সিহিমোগ্লোবিনের অক্সিজেনকে প্রতিস্থাপিত করে। অক্সিজেন নিযুক্ত হিমোগ্লোবিন কার্বনিক অ্যাসিড থেকে হাইড্রোজেন আয়ন গ্রহণ করে হিমোগ্লোবিনিক অ্যাসিডে পরিণত হয় এবং বাফারের ন্যায় কাজ করে।

কোষে বিপাকীয় ক্রিয়া CO_2, H_2O $\xrightarrow[\text{অ্যানহাইড্রেজ}]{\text{কার্বনিক}}$ $H_2CO_3 + KHbO_2 \longrightarrow KHCO_3 + HHb + O_2$

উপরোক্ত বিক্রিয়া থেকে এটি পরিষ্কার যে কলায় CO_2 ও O_2 পরিবহন একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

অক্সিহিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন মুক্ত হওয়া নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর নির্ভরশীল ঃ—

(a) **অক্সিজেনের ঘনত্ব ঃ** অক্সিজেনের ঘনত্ব যত কম হবে তত বেশী অক্সিজেন মুক্ত হবে।

(b) **তাপমাত্রা ঃ** তাপমাত্রা বাড়লে বেশী অক্সিজেন মুক্ত হয়।

(c) **pH ঃ** কম pH অক্সিহিমোগ্লোবিন থেকে অক্সিজেন মুক্ত হতে সাহায্য করে।

(d) **কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব ঃ** কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব বাড়লে বেশী কার্বনিক অ্যাসিড (H_2CO_3) তৈরী হয়। এই কার্বনিক অ্যাসিড ভেঙে H^+ আয়নে পরিণত হয় এবং অক্সিহিমোগ্লোবিনের অক্সিজেনকে প্রতিস্থাপিত করে।

3.3.3 কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহনে হিমোগ্লোবিনের ভূমিকা ঃ কোষের বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড তিনভাবে রক্তে পরিবাহিত হয়।

(i) 5% কার্বন-ডাইঅক্সাইড ভৌত দ্রবণ রূপে প্লাজমা দ্বারা পরিবাহিত হয়।

(ii) 85% কার্বন-ডাইঅক্সাইড ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্তের লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে এবং জলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরী করে। কার্বনিক অ্যাসিড ভেঙে হাইড্রোজেন আয়ন ও হাইড্রোজেন বাইকার্বনেট আয়নে পরিণত হয়।

$$CO_2 + H_2O = H_2CO_3 = H^+ + HCO_3^-$$

হাইড্রোজেন আয়ন হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেনকে প্রতিস্থাপিত করে এবং অক্সিজেন বিযুক্ত হিমোগ্লোবিন কার্বনিক অ্যাসিড থেকে হাইড্রোজেন আয়ন গ্রহণ করে হিমোগ্লোবিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। হাইড্রোজেন কার্বনেটের বেশির ভাগ অংশই লোহিত রক্ত কণিকা থেকে বের হয়ে প্লাজমা বা রক্তরসে প্রবেশ করে এবং সোডিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট গঠন করে। হাইড্রোজেন কার্বনেট লোহিত রক্ত কণিকা থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ক্লোরাইড আয়ন রক্ত কণিকায় প্রবেশ করে ক্লোরাইড স্থানান্তর (Chloride shift) বলে।

(iii) শতকরা 10 থেকে 20 ভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড হিমোগ্লোবিন অণুর প্রোটিন বা পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের অ্যামাইনো গ্রুপ (NH_2)-এর সাথে যুক্ত হয়ে প্রথম কার্বামিনো-হিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন করে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের হিমোগ্লোবিনের সাথে যৌগ গঠন করার পরিমাণ নির্ভর করে হিমোগ্লোবিনে অক্সিজেনের পরিমাণের উপর।

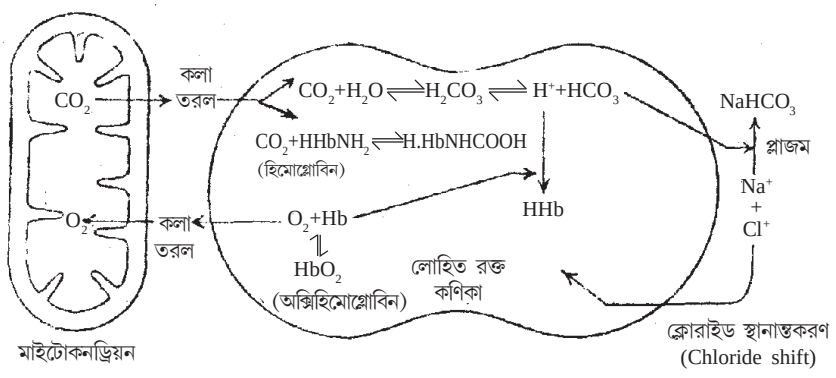

চিত্র নং 6 ঃ প্লাজমা ও লোহিত রক্ত কণিকা দ্বারা কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিবহন

লোহিত রক্ত কণিকায় CO_2 হিমোগ্লোবিনের গ্লোবিন প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে নিম্নোক্ত বিক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বমিনো-হিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন করে ঃ—

$$HbNH_2 + CO_2 \text{ —— } HbNHCOOH$$

হিমোগ্লোবিন কার্বমিনোহিমোগ্লোবিন

এই বিক্রিয়ায় কোন উৎসেচকের প্রয়োজন হয় না। কার্বামিনোহিমোগ্লোবিনের গঠন pH বা হাইড্রোজেন আয়নের (H^+) ঘনত্বের উপর নির্ভর করে pH কম বা H^+ এর পরিমাণ বেড়ে গেলে H^+ হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে $HbNH_3^+$ বা $HbNH_4^+$ গঠন করে। ফলে হিমোগ্লোবিন আর কার্বন-ডাইঅক্সাইডের সাথে যুক্ত হতে পারে না। কিন্তু রক্তে pH বেড়ে গেলে এবং H^+-এর পরিমাণ কমে গেলে কার্বামিনোহিমোগ্লোবিন গঠন হতে সাহায্য করে। আবার CO_2-এর বর্ধিত ঘনত্বও কার্বামিনোহিমোগ্লোবিনের গঠন সাহায্য করে। কার্বামিনোহিমোগ্লোবিন রক্তের সাহায্যে কলাকোষ থেকে ফুসফুসে পৌঁছুলে কার্বনডাইঅক্সাইড মুক্ত হয় এবং কার্বামিনোহিমোগ্লোবিন পুনরায় হিমোগ্লোবিনে পরিণত হয় (চিত্র নং 6)।

$$HbNHCOOH + O_2 \text{ ———— } NH_2HbO_2 + CO_2$$

কার্বামিনোহিমোগ্লোবিন হিমোগ্লোবিন ফুসফুসে মুক্ত হয়

কলায় অক্সিজেন বিযুক্ত হিমোগ্লোবিন, কার্বামিনোহিমোগ্লোবিন গঠনে সাহায্য করে।

3.2.3 অনুশীলনী-2

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১) Bohr shift কাকে বলে?

২) অক্সিহিমোগ্লোবিন অক্সিজেন মুক্ত হবার জন্য কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?

৩) অক্সিজেন পরিবহণে হিমোগ্লোবিনের ভূমিকা কি?

৪) হিমোগ্লোবিনের কোন অংশের সাথে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত হয়?

৫) হিমোগ্লোবিনের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করো।

3.4 ABO রক্তশ্রেণী ও Rh ফ্যাক্টর

3.4.1 রক্তশ্রেণী (ABO Blood Group)

লোহিত রক্ত কণিকা ঝিল্লীতে বিভিন্ন অ্যান্টিজেন থাকে যাদের রক্ত শ্রেণী (blood group) অ্যান্টিজেন বা অ্যাগ্লুটিনোজেন (agglutinogen) বলে। এক ব্যক্তির অ্যাগ্লুটিনোজেন একই প্রজাতির অন্য ব্যক্তির সিরামে উপস্থিত অ্যান্টিবডির সাথে বিক্রিয়া ঘটাতে পারে। ফলে লোহিত রক্ত কণিকা জমাট (clumping) বাধে বা অ্যাগ্লুটিনেশন (agglutination) ঘটে বা ভেঙে যায় (haemolysis)। রক্ত প্রদানে, লোহিত-কণিকা ঝিল্লীর অ্যাগ্লুটিনোজেনের সাথে অ্যান্টিবডির এই বিক্রিয়ার বর্ণনা সর্বপ্রথম ল্যান্ডস্টিনার (Landsteiner, 1905) উল্লেখ করেন। তিনি ABO রক্ত শ্রেণীর আবিষ্কর্তা।

সংজ্ঞা ঃ লোহিত রক্ত কণিকাও (RBC) A ও B অ্যাগ্লুটিনোজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ভিত্তিতে বিভাজনকে রক্তের ABO রক্তশ্রেণী বলে। রক্ত শ্রেণী প্রধান চারটি ভাগে বিভক্ত A, B, AB এবং O।

বৈশিষ্ট্য ঃ মানবগোষ্ঠীর রক্তে দুটি প্রধান অ্যাগ্লুটিনোজেন A ও B এবং সম্পর্কিত অ্যাগ্লুটিনিন বা অ্যান্টিবডি a ও b বর্তমান।

A শ্রেণীর ব্যক্তির ক্ষেত্রে লোহিত রক্ত কর্ণিকা ও অন্যান্য কোষ ঝিল্লীতে **A-অ্যাগ্লুটিনোজেন** থাকে এবং সিরামে β অ্যাগ্লুটিনিন থাকে।

B শ্রেণীর ব্যক্তিতে লোহিত রক্ত কর্ণিকা ও অন্যান্য কোষ ঝিল্লীতে **B-অ্যাগ্লুটিনোজেন** ও সিরামে **α-অ্যাগ্লুটিনিন** থাকে।

AB শ্রেণীর ব্যক্তিতে লোহিত কর্ণিকা ও অন্যান্য কোষ ঝিল্লীতে AওB উভয়প্রকার অ্যাগ্লুটিনোজেন বর্তমান। কিন্তু কোন **অ্যাগ্লুটিনিন** নেই।

O শ্রেণীর ব্যক্তিতে **অ্যাগ্লুটিনোজেন অনুপস্থিতি** কিন্তু সিরামে a ও b উভয় অ্যাগ্লুটিনিন বর্তমান।

টেবিল-1 : জনগোষ্ঠীতে ABO রক্তশ্রেণী

রক্তশ্রেণী (Blood group)	লোহিত কণিকা ঝিল্লীতে উপস্থিত অ্যাগ্লুটিনোজেন	সিরামে উপস্থিত অ্যাগ্লুটিনিন
A	A	β
B	B	α
AB	A এবং B	O (অনুপস্থিত)
O	O (অনুপস্থিত)	α β

ABO রক্ত গ্রুপের বংশগতি (Inheritance of ABO blood group) : বাবা ও মায়ের রক্তের গ্রুপের ভিত্তিতে সন্তানের রক্তের গ্রুপ অনুমান করা সম্ভব— এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করার পর থেকেই বলা যায় যে, ABO রক্তের গ্রুপগুলি জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বার্নস্টিন (Bernstain) উল্লেখ করেন যে রক্তের ABO গ্রুপ নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয় একই জীনের তিনটি অ্যালিল A,B,O দ্বারা। জীনটি 'I' নামে খ্যাত। 'I' অর্থাৎ আইসো-অ্যাগ্লুটিনোজেন (issagglutinogen)। এটি অ্যান্টিজেনের আর একটি নাম এবং এর তিনটি অ্যালিল হল যথাক্রমে I^A, I^B এবং I^D। এখানে যেহেতু একই অবস্থানে বা লোকাসে (locus) দুই এর অধিক অ্যালিল বর্তমান তাই ABO রক্ত গ্রুপ 'মালটিপল্ অ্যালিল' তন্ত্র গঠন করে। তিনটি অ্যালিলের মধ্যে I^O অ্যালিলটি প্রচ্ছন্ন, I^A এবং I^B অ্যালিলদ্বয় প্রকট এবং উভয় একত্রে উভপ্রকট (Codominant)। মানুষের ক্ষেত্রে ABO রক্ত গ্রুপের নিয়ন্ত্রক জীনটির নবম (9) ক্রোমোসোমে বর্তমান।

টেবিল 2 : ABO রক্তশ্রেণীর ফেনোটাইপ ও জেনোটাইপ

জেনোটাইপ	অ্যান্টিজেন	জেনোটাইপ বা রক্তের গ্রুপ
I^AI^A	A	A
I^AI^B	A	A
I^BI^B	B	B
I^BI^O	B	B
I^AI^B	A,B	AB
I^OI^O	—	O

লোহিত রক্ত কণিকার অ্যাগ্লুটিনোজেন ও সিরামে উপস্থিত অ্যাগ্লুটিনিন বিক্রিয়ার ছক ঃ

দাতার (donor) রক্তের অ্যাগ্লুটিনোজেনের সাথে গ্রহীতার (recepient) সিরামে উপস্থিত অ্যাগ্লুটিনিন অসহযোগী হলে বিক্রিয়া হয়ে হিমোলাইসিস ঘটে। সুতরাং রক্ত প্রদানের আগে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের রক্ত মেলানো

(matching) অত্যাবশ্যক। রক্ত প্রদানের সময় দাতার অ্যাগ্লুটিনোজেন অধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ গ্রহীতার অ্যাগ্লুটিনিন দাতা অ্যাগ্লুটিনোজেনের অসহযোগী হলে দাতার RBC গুলির হিমোলাইসিস ঘটে। দাতার সিরামে উপস্থিত অ্যাগ্লুটিনিন যদি গ্রহীতার অ্যাগ্লুটিনোজেনের সাথে অসহযোগী হয় তবে তা গ্রহীতার সিরাম দ্বারা তরলীকৃত হয় ফলে বিক্রিয়া ঘটে না বা ঘটলেও নামমাত্র ঘটে।

টেবিল 3 : দাতার রক্ত কণিকার অ্যাগ্লুটিনোজেন ও গ্রহীতার সিরামে উপস্থিত অ্যাগ্লুটিনিনের বিক্রিয়ার ছক

দাতার অ্যাগ্লুটিনোজেন	a	b	ab	O
A	+	—	+	—
B	—	+	+	—
AB	+	+	+	—
O	—	—	—	—

+ = বিক্রিয়া ঘটেছে – = বিক্রিয়া ঘটেনি

'O' শ্রেণীর রক্তে কোন অ্যাগ্লুটিনেজেন থাকে না। ফলে A, B, AB যে কোন শ্রেণীর গ্রহীতাকে রক্ত প্রদান করতে পারে। এছাড়া নিজশ্রেণী অর্থাৎ O শ্রেণীকেও রক্ত প্রদান করতে পারে। সেহেতু 'O' শ্রেণীর রক্তকে সার্বজনীন দাতা বলা হয়।

AB শ্রেণীর রক্তে কোন অ্যাগ্লুটিনিন থাকে না। ফলে A, B, AB, O সকল শ্রেণীর দাতার অ্যাগ্লুটিনোজেনের সাথে গ্রহীতার কোন অ্যাগ্লুটিনিন না থাকায় বিক্রিয়া ঘটে না। তাই AB রক্তশ্রেণী **সার্বজনীন গ্রহীতা** রূপে যে কোন শ্রেণীর রক্ত গ্রহণ করতে পারে।

রক্ত গ্রুপের আইনগত তাৎপর্য (Legal Significance of blood group) : সন্তানের পিতৃত্বের বা মাতৃত্বের দাবিব সমস্যা অনেক সময় উভয়ের রক্তের গ্রুপ নির্ধারণের দ্বারা সমাধান করা যায়। তবে রক্তের গ্রুপ নির্ধারণ করে নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় যে এই ব্যক্তিই বা মহিলাই সন্তানের বাবা অথবা মা। কিন্তু তারা মা অথবা বাবা হলেও হতে পারেন এটি বলা যায়। তাই বর্তমানে শুধুমাত্র রক্তের গ্রুপের উপর নির্ভর না করে DNA বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঠিক করা হয় যে কে সঠিক মা অথবা বাবা।

রক্ত প্রদানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দাতা ও গ্রহীতার উভয়ের একই ABO রক্তশ্রেণী হওয়া বাঞ্ছনীয় তা নয়, সেই সঙ্গে Rh ফ্যাক্টরও এক হওয়া আবশ্যিক।

3.4.2 Rh ফ্যাক্টর (Rh factor) :

ল্যান্ডস্টিনার ও উইনার (Landsteiner & Wiener, 1940) মানুষের লোহিত রক্ত কণিকার ঝিল্লীতে আরেক ধরনের অ্যাগ্লুটিনোজেন আবিষ্কার করেন। এ অ্যাগ্লুটিনোজেন ভারতীয় *Rhesus* বানরে প্রথম পাওয়া যায়। তাই একে Rh-factor বলে। এর কোন সহযোগী অ্যাগ্লুটিনিন সিরামে নেই। এই Rh ব্লাড গ্রুপ কমপক্ষে তিনটি জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (C, D, E) এবং প্রতিটি জীনের দুটি করে অ্যালিল বর্তমান (C,c, D,d, E,e)। তবে C জীন ও E জীন খুবই দুর্বল জীন। ফলে কার্যত D জীনের দুটি অ্যালিল দ্বারাই Rh রক্ত গ্রুপটি নিয়ন্ত্রিত, DD বা Dd জেনোটাইপ যুক্ত ব্যক্তিদের Rh অ্যান্টিজেনযুক্ত হয় এবং এদের Rh ধনাত্মক (Rh+) রূপে বর্ণনা করা হয়। dd জেনোটাইপযুক্ত ব্যক্তিরা Rh অ্যান্টিজেন বিহীন এবং এদের Rh ঋণাত্মক (Rh–) বলা হয়। জনগোষ্ঠীতে Rh– এর সংখ্যা যথেষ্ট কম।

Rh-এর নিদানিক গুরুত্ব (Clinical importance of Rh) : (i) Rh-গ্রহীতাকে Rh+ রক্তদান করলে 12 দিনের মধ্যে গ্রহীতার রক্তে অ্যান্টি Rh+ রক্ত দিলে দাতার RBC গুলিতে হিমোঅ্যাগ্লুটিনেসন ঘটে অর্থাৎ পূর্বের

সহযোগী (Compatible) রক্ত তখন অসহযোগী হয়ে পড়ে। সুতরাং রক্ত প্রদানের পূর্বে Rh ফ্যাক্টর মিলিয়ে নেওয়া অত্যাবশ্যক।

(ii) Rh (জেনোটাইপ) মা যদি Rh^+ (জেনোটাইপ DD বা Dd) সন্তান ধারণ করেন তখনই Rh শর্তের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। ভ্রূণের Rh^+ অ্যান্টিজেন মায়ের শরীরে সংবহনের মাধ্যমে প্রবেশ করে এবং তার ফলে মায়ের শরীরে Rh অ্যান্টিজেনের সাপেক্ষে অ্যান্টিবডি গঠিত হয়। গর্ভাবস্থায় যেহেতু প্লাসেন্টার দ্বারা মা ও ভ্রূণের রক্ত আলাদা থাকে, তাই সেই সময় Rh-মায়ের রক্তে Rh+ ভ্রূণের অ্যান্টিজেনের কোনও প্রভাব সাধারণত লক্ষ্য করা যায় না। প্রসবকালে, মায়ের ও ভ্রূণের বা সন্তানের রক্তের কিছুটা মিশ্রণ ঘটে। প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে মায়ের

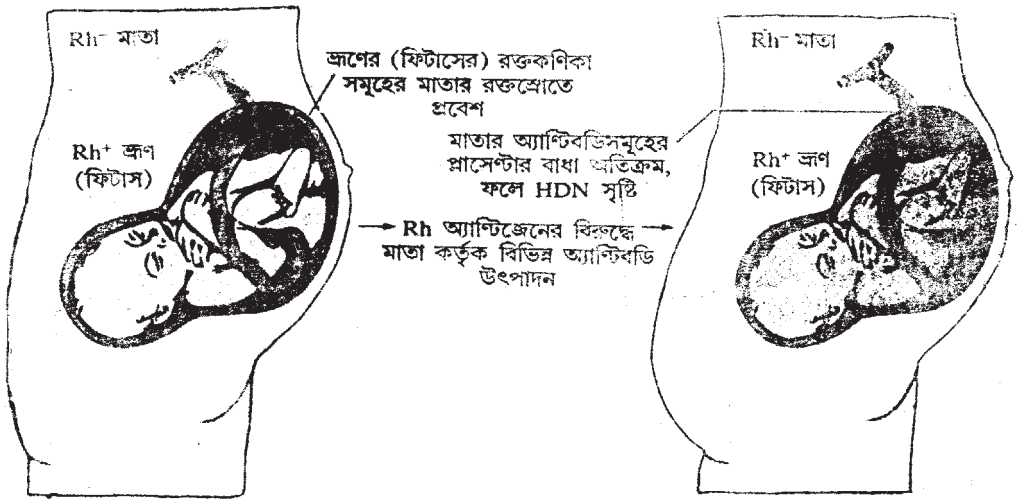

চিত্র নং 7 ঃ নবজাতকে হিমোলাইটিক রোগসমূহের সৃষ্টি

রক্তে সৃষ্ট অ্যান্টিবডির কোনও প্রভাব দেখা যায় না। পরবর্তী Rh+ সন্তান সৃষ্টি হলে মায়ের অ্যান্টিবডি প্লাসেন্টা ভেদ করে ঐ সন্তানের লোহিত কণিকাগুলিকে নষ্ট করে দেয়। এর দ্বারা সৃষ্ট অ্যানিমিয়া ভ্রূণকে জন্মের আগেই নষ্ট করে দেয় বা লোহিত কণিকার হিমোলাইসিসের ফলে যে হিমোগ্লোবিন সৃষ্টি হয় তা একটি অন্য পদার্থে পরিণত হয় এবং মস্তিষ্কে জমা হয়ে সন্তানের মৃত্যু ঘটায়। কোন কোন ক্ষেত্রে সন্তান যদি বাঁচেও তাহলে সে মানসিক প্রতিবন্ধী (mentally retarded) হয়। এই প্রকার সন্তানের এক বিশেষ ধরনের রক্তাল্পতা ও জন্ডিস দেখা দেয়। এই অবস্থাকে নবজাতকের **হিমোলাইটিক রোগ (Haemolytic disease of the new born—HND)** বা **এরিথ্রোব্লাস্টোসিস্ ফিটালিস্ (erythroblastosis fetalic)** বলা হয়।

এই অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে বা প্রতিরোধক হিসাবে প্রথম Rh+ সন্তানের জন্মের 72 ঘন্টার মধ্যে Rh– মাকে, Rh শর্তের প্রতিরোধক অ্যান্টিবডি ইঞ্জেকশান দেওয়া অতি প্রয়োজন (চিত্র নং 7)।

3.4.3 অনুশীলনী-3

শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(i) _____ গ্রুপকে সার্বজনীন দাতা এবং _____ গ্রুপকে সার্বজনীন গ্রহীতা বলা হয়।

(ii) A শ্রেণীর ব্যক্তির সিরামে _____ থাকে।

(iii) _____ মা যদি _____ সন্তান ধারণ করে তখনই Rh শর্তের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

(iv) রক্তের ABO গ্রুপ _____ জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়।

(v) _____ জেনোটাইপযুক্ত ব্যাক্তিরা Rh অ্যান্টিজেন বিহীন হয় এবং এদের _____ বলা হয়।

3.5 স্নায়ু ও স্নায়ুসন্নিধির মধ্য দিয়ে উদ্দীপনা পরিবহন (Physiology of nerve impulse and Synaptic transmission)

উদ্দীপনা গ্রহণ, পুষ্টি ও পরিবহন যে বিশেষ কলার মাধ্যমে হয় তাকে স্নায়ুকলা এবং এ কলা সহযোগে যে তন্ত্র গঠিত হয় তাকে **স্নায়ুতন্ত্র** বলে। সাধারণতঃ প্রক্ষেপণ সহ স্নায়ুকোষের গ্রহণকারী বা সংজ্ঞাবহ জোট শাখাকে **ডেনড্রাইট** ও বৃহৎ প্রেরণকারী বা চেষ্টীয় বড় শাখাকে **অ্যাক্সন** (Axon) বলে। উদ্দীপনা ডেনড্রাইটের সাহায্যে গ্রহীত এবং অ্যাক্সনের সাহায্যে প্রেরিত হয়।

বিভিন্নভাবে স্নায়ুতন্তুর শ্রেণীবিন্যাস করা হয় ঃ

(১) গঠনগত বা কলাস্থানিক দিক থেকে ঃ (i) মায়োলিন আবরণীযুক্ত, (ii) মায়োলিন আবরণীবিহীন।

(২) প্রেরক বস্তু নিঃসরণ অনুযায়ী ঃ (i) অ্যাড্রিনার্জিক, (ii) কোলিনার্জিক।

(৩) কার্য অনুযায়ী ঃ (i) সংজ্ঞাবহ বা অন্তঃবাহী (Sensory or afferent), (ii) চেষ্টীয় বা বহির্বাহী (Motor or efferent), (iii) মিশ্র (সংজ্ঞাবহ ও চেষ্টীয়)

(৪) স্নায়ু তন্তুর ব্যাস ও উদ্দীপনা পরিবহন গতিবেগের ভিত্তিতে ঃ (i) A শ্রেণী, (ii) B শ্রেণী, (iii) C শ্রেণী।

3.5.1 স্নায়ুতন্ত্রুর গঠন ও বৈশিষ্ট্য ঃ

(i) **মায়োলিন যুক্ত স্নায়ুতন্তু ঃ** প্রান্তীয় এ তন্তুগুলি তিনটি উপাদানে গঠিত।

(a) কেন্দ্রীয় অ্যাক্সন অক্ষ নল বা অক্ষ স্তম্ভ (Axis Cylinder), এই নলটি থকথকে অন্তঃকোষীয় তরল, অ্যাক্সোপ্লাজম (axoplasm) পূর্ণ।

(b) অ্যাক্সন লিপিড বস্তুর আবরণী। মায়েলিন (myelin) দ্বারা আবৃত।

(c) মায়েলিন আবরণী চ্যাপ্টা কোষস্তর দিয়ে আবৃত। একে নিউরোলিমা বলে এবং কোষগুলিকে সোয়ান কোষ (Cells of Schwann) বলে।

(d) মায়েলিন আবরণী সমগ্র তন্তু বরাবর একই রকম থাকে না, মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট দূরত্বে বাধাপ্রাপ্ত হয় ও **র‍্যানভিয়ার পর্ব** (Node of Ranvier) পরিলক্ষিত হয়।

(ii) **অমায়েলিন তন্তু ঃ** এই তন্তু কেন্দ্রীয় অক্ষ বা অ্যাক্সন ও নিউরোলিমা নিয়ে গঠিত। মায়েলিন আবরণী এবং র‍্যানভিয়ার পর্ব অনুপস্থিত। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্তুতে নিউরোলিমা থাকে না।

স্নায়ু তন্তুর শরীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য (Physiological properties of nerve fibre) :

ক্যাথোড রে অসিলোস্কোপ (Cathode Ray Oscilloscope) দিয়ে স্নায়ু তন্তু শরীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ করা যায়।

(i) উদ্দীপনশীলতা (Excitability) : যান্ত্রিক, রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক ও তাপীয় উদ্দীপনায় স্নায়ু সাড়া দেয়। যে কোন উদ্দীপনার তীব্রতা এবং স্থায়িত্বের উপরই তন্তুর উদ্দীপনাশীলতা নির্ভরশীল। ন্যূনতম উদ্দীপনা শক্তি যা স্নায়ু (এবং পেশী) কে উদ্দীপিত করতে পারে তাকে রিওবেস (Rheobase) বলে। ন্যূনতম উদ্দীপনা শক্তির দ্বিগুণ শক্তি প্রয়োগ করলে যে সময়ের মধ্যে স্নায়ু উদ্দীপিত হয় তাকে ক্রোনাক্সি (Chronaxic) বলে।

(ii) পরিবাহিতা (conductivity) ঃ স্নায়ু উদ্দীপিত হলে উদ্দীপনা স্নায়ু তন্তুর মধ্যে পরিবাহিত হয়। স্নায়ু কোন স্থানে উদ্দীপিত হলে উদ্দীপনা উভয় দিকেই পরিবাহিত হয় তবে স্বাভাবিক অবস্থায় কেবলমাত্র স্নায়ু সন্নিধির দিকে উদ্দীপনা দ্রুত অগ্রসর হয়।

(iii) সব কিছু অথবা কিছুই না প্রতিক্রিয়া (All or none response) : খুব দুর্বল উত্তেজনা নার্ভকোষ ক্রিয়া বিভব তৈরী করতে পারে না। ক্রিয়া বিভব সৃষ্টি করার জন্য একটি নির্দিষ্ট মানের বা শক্তির উত্তেজনা প্রয়োজন, যাকে সীমারেখা বা সীমানা শক্তি (threshold strength) বলা হয়। সীমানা শক্তির উপরের মানের যে কোনও উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন ক্রিয়া বিভবের পরিমাণ একই হয়। শারীরবিদ্যায় এই ধরনের প্রতিক্রিয়াকে সব কিছু অথবা কিছুই না প্রতিক্রিয়া (All or none response) বলা হয়।

(iv) ক্রিয়াশীল অন্তর্বর্তী সময় (Refractory period) : একটি স্নায়ুতন্ত্র একবার উত্তেজিত হলে আবার কিছুক্ষণ পরে তাকে উত্তেজিত করা যায়। এই সময়ের মধ্যে যত শক্তিশালী উদ্দীপনাই প্রয়োগ করা হোক না কেন, তবুও স্নায়ুতন্তু উত্তেজিত হয় না। এই সময়টিকে ক্রিয়াহীন অন্তবর্তী সময় (Refractory period) বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে একবার ক্রিয়া বিভব সৃষ্টি হলে কিছুক্ষণের জন্য সোডিয়াম ও ক্যালসিয়াম যাতায়াতের পথ বন্ধ থাকে, তাই এই সময়ের মধ্যে আর ক্রিয়া বিভব সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না।

(v) সংকলন (Summation) : দুটি অধঃমাত্রিক (subminimal) উদ্দীপনা পর পর প্রয়োগ করলে সায়ু উদ্দীপিত হয়। একে সংকলন বলে।

(vi) অভিযোজন (Adaptation) : উদ্দীপনা পরিবহনে স্নায়ু দ্রুত অভিযোজিত হয়ে পড়ে। ফলে একই রকম উদ্দীপনা প্রয়োগে উদ্দীপিত হয় না যখন হঠাৎ উদ্দীপনা শক্তি ও স্থায়িত্ব পরিবর্তন করা হয় তখন উদ্দীপিত হয়। তবে ধীরে ধীরে উদ্দীপনা প্রয়োগ করলে তা যতই শক্তিশালী হোক না কেন স্নায়ু উদ্দীপিত হয় না।

(vii) অনগাড়ত্ব (Indefatigability) : পেশীর মত স্নায়ুর বারবার উদ্দীপিত হলে অসাড় বা অবসন্ন (fatigue) হয় না। পেশীর সাথে যুক্ত স্নায়ুতে পরপর উদ্দীপনা প্রয়োগে পেশী অবসন্ন হয় কিন্তু এই স্নায়ুকে অন্য একটি সতেজ পেশীতে যুক্ত করে উদ্দীপনা প্রয়োগে সাড়া দেয়। সুতরাং স্নায়ু কখনও অবসন্ন বা অসাড় হয় না।

3.5.2 স্নায়ুতন্তুর বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য (Electrical prosperties of Nerve Fibre) :

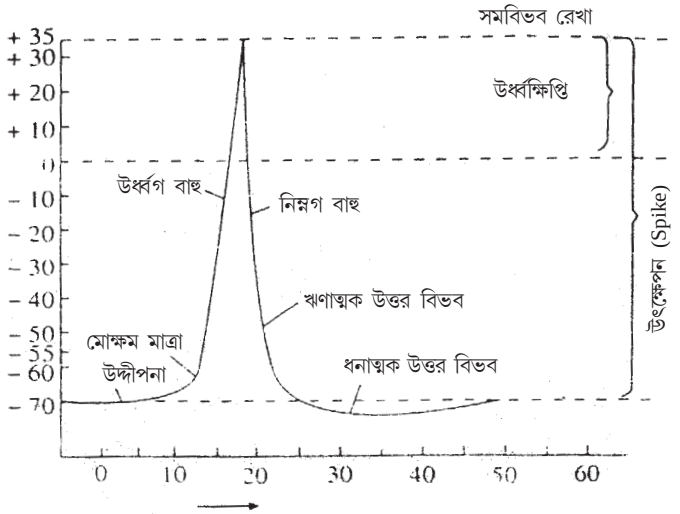

চিত্র নং 8 ঃ তড়িৎদ্বারের সাহায্যে স্নায়ুকোষের উৎক্ষেপ বিভবের (ক্রিয়াবিভবের) রেখচিত্র

স্নায়ু তন্তু মধ্যস্থ তরল ও স্নায়ুতন্তু বহিঃস্থ (কোষ বহিঃস্থ) তরলে দ্রবীভূত আয়নের বিভিন্নতা আছে। অন্তঃস্থ তরলে K+ আয়ন অধিক ও Na^+ Cl^- আয়নের পরিমাণ কম থাকে। স্নায়ুতন্তু ও স্নায়ুকোষ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বাইরে ধনাত্মক (+) ও ভিতরে ঋণাত্মক (–) আধান যুক্ত হয়। স্নায়ুতন্তু ঝিল্লীর উভয় পার্শ্বে আধান বা আয়নের পার্থক্যের ফলে একটি স্থির বিভব

পার্থক্য সৃষ্টি হয়। একে স্থিতি বিভব বা ঝিল্লি বিভব (Resting potential or membrane potential) বলে।

স্নায়ুতন্তু উদ্দীপিত/সক্রিয় হলে স্থিতি বিভবের পরিবর্তন ঘটে তখন বাইরে ঋণাত্মক (-) ও ভিতরে ধনাত্মক (+) আধান থাকে। একে ক্রিয়া বিভব (Action potential) বলে। ক্রিয়া বিভবই স্নায়ুতন্তুতে স্নায়ুপ্রবাহ (nerve impulse) রপে বাহিত হয়। তবে ক্রিয়া বিভবের স্থায়িত্ব কাল 0.5-5.0 মিলি সেকেন্ড মাত্র। স্নায়ুতন্তু সক্রিয় হলে স্থিতি বিভবের পরিবর্তন হয়ে ক্রিয়াবিভব উৎপন্ন হয় অর্থাৎ আধানের পরিবর্তন ঘটে একে বিসমবর্তন (Depolari sation) বলে ও স্বল্প কাল পরেই আবার পূর্ববর্তী দশায় (স্থিতি বিভব) ফিরে আসে, একে পুনঃসমবর্তন (Repolarisations) বলে (চিত্র নং 8)।

সূক্ষ্ম তড়িৎদ্বারের (Microelectrode) সাহায্যে স্থিতিবিভব থেকে ক্রিয়া বিভবে পরিবর্তন ও বিপরীতমুখী পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় সহজে অনুধাবন করা যায়।

3.5.3 নার্ভতন্তুতে আবেগের উৎপত্তি (Origin of action potential or nerve impulse) :

(i) বিশ্রামরত অবস্থায় স্নায়ুতন্তু সমবর্ত (Polarised) অবস্থায় এবং ঝিল্লী বিভব-90mv থাকে।

(ii) এই অবস্থায় স্নায়ুতন্তু ঝিল্লির বহিঃতল ধনাত্মক (+) এবং ভিতরের অন্তঃতল ঋণাত্মক (-) থাকে। ভিতরের K^+ আয়নের ঘনত্ব বাইরের Na^+ আয়নের তুলনায় বেশী থাকে।

(iii) বিশ্রামরত বা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ঝিল্লীতে K^+ আয়নের ভেদ্যতা থাকে কিন্তু Na^+ প্রবেশ করতে পারে না।

(iv) স্নায়ুতন্তু উদ্দীপিত হলে Na^+-এর ভেদ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং এই ক্রিয়া বিভব উৎপত্তির সূচনা।

(v) স্নায়ু বিভবের পর্যায়নুক্রমিক পরিবর্তনগুলি হলো বিসমবর্তন, পুনঃসমবর্তন, ঋণাত্মক উত্তর বিভব এবং ধনাত্মক উত্তর বিভব।

(vi) তন্তু উদ্দীপিত হলে Ca^{++} স্থানচ্যুত হয় ও Na^+ এর ভেদ্যতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং Na^+ প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিসমবর্তন শুরু হয়। Na^+ এর ভেদ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ বিশ্রামকালীন বিভব—90mv নষ্ট হয়ে যায়। বিভবের মান আস্তে আস্তে ঋণাত্মক (–) মান থেকে হ্রাস পেয়ে O মান ছাড়িয়ে ধনাত্মক (+) মানের দিকে যায়। এই প্রক্রিয়াকেই বিসমবর্তন বা ডিপোলারাইজেশন বলা হয়। বড় স্নায়ুতন্তুতে ঝিল্লী বিভব O মান অতিক্রম করে ধনাত্মক মানে পৌঁছায়, একে ওভারশুট (Overshoot) বলা হয়।+35mv পর্যন্ত উর্ধ্বক্ষিপ্ত (overshoot) হয়।

(vii) ভিতরে ধনাত্মক আধান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে Na^+ এর ভেদ্যতা হ্রাস পায় এবং Ca^{++} স্বস্থানে ফিরে আসে অর্থাৎ ঝিল্লী গাত্রের ছিদ্রে প্রোটিনের সাথে সংযুক্ত হয়ে Na^+ প্রবেশের পথ বন্ধ করে।

(viii) কিন্তু সে মুহূর্তে সক্রিয় বিভব + 35mv মাত্রায় পৌঁছায় তখন ঝিল্লীর ভিতর থেকে K^+ বাহির হয়ে আসতে থাকে। ফলে বাইরে আবার ধনাত্মক ও ভিতরে ঋণাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়। একে পুনঃসমবর্তন পর্যায় বা রিপোলারাইজেশন বলে ও এ সময় K^+ ভেদ্যতা সর্বোচ্চ থাকে।

(ix) অনুমান করা হয় যে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় Ca^{++} আয়ন ঝিল্লী ছিদ্র বন্ধ করে রাখে ফলে Na^+ প্রবেশ করতে পারে না।

(x) K^+ পরিবহনের ব্যাখ্যার অধিকাংশই অনুমান ভিত্তিক। Na^+ ভিতরে আসার ফলেই তা ধনাত্মক হয় এবং পুনঃসমবর্তনের সময় K^+ বাহিরে আসে এবং ধীরে ধীরে স্থিতি বিভব ফিরে আসে।

(xi) ক্রিয়া বিভবের উত্থান পতনকে স্পাকইক পোটেনসিয়াল (spike potential) বলে। স্পাইক পোটেনসিয়াল বা উৎক্ষেপ বিভবের শেষে K^+-এর ভেদ্যতা হ্রাস পায় ও ঝিল্লি বিভব স্বাভাবিক হতে কয়েক মিলি সেকেন্ড প্রয়োজন হয়, একে ঋণাত্মক উত্তর বিভব বা নেগেটিভ আফটার পোটেনশিয়াল বলা হয়। এর কারণ বাইরে অধিক K^+ এর উপস্থিতি। K^+ এর অধিক ঘনত্ব, K^+ কে বাধা দেয়।

(xii) ধনাত্মক উত্তর বিভব পর্যায় শেষ হলে স্থিতি ঝিল্লী বিভব স্থাপিত হয় কিন্তু আয়নিক সমতা স্থাপিত হয় না। এ Na^+ পাম্প প্রক্রিয়ার সাহায্যে ঘটে ও Na^+ ভিতর থেকে বাইরে আসতে শুরু করে ফলে আবার ঝিল্লীর মধ্যে অধিক ঋণাত্মক অবস্থা সৃষ্টি করে। একে **ধনাত্মক উত্তর বিভব বা পজিটিভ আফটার পোটেনশিয়াল বলে।**

(xiii) Na^+ পাম্প প্রক্রিয়ায় ধনাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং K^+ ব্যাপন ক্রিয়ার ভিতরে প্রবেশ করে।

(xiv) Na^+ ও K^+ পাম্প সক্রিয়তার জন্য ATP অনু ব্যবহৃত হয় এবং এই পদ্ধতির দ্বারা বিশ্রামকালীন অবস্থায় স্নায়ুঝিল্লী মাধ্যমে তিনটি Na^+ আয়ন বাইরে বের হয় ও দুটি K^+ আয়ন অ্যাক্সন ঝিল্লী বা স্নায়ুঝিল্লীর ভিতরে প্রবেশ করে।

(xv) ধনাত্মক উত্তর বিভব পর্যায়ে আয়নিক সমতা ফিরে আসে।

3.5.4 স্নায়ু আবেগের পরিবহন (Conduction or propagation of nerve impulse) : স্নায়ুকোষের কোন স্থানে যখন উত্তেজনার ফলে বিপরীত বিভব (reverse polarity) তৈরী হয় তখন স্নায়ুঝিল্লীর ঐ স্থানে ও সংলগ্ন স্থানের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চলাচল করতে থাকে। এই তড়িৎ-প্রবাহ উত্তেজিত স্থানের সংলগ্ন স্থানে সোডিয়াম আয়নের দ্বারকে (Sodium gate) খুলে দেয় ও সেই অঞ্চলের বিভব বিপরীত (polarity reverse) হয়। এই চক্রটির পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং ক্রিয়া বিভবও স্নায়ুঝিল্লী বরাবর পরিবাহিত হয়। স্নায়ু আবেগ স্নায়ুতন্তুতে কি গতিতে প্রবাহিত বা পরিবাহিত হবে তা নির্ভর করে অ্যাক্সনের ব্যাস (diameter)-এর উপর। যে অ্যাক্সনের ব্যাস যত বেশী তাতে বৈদ্যুতিক রোধের পরিমাণ তত কম, ফলে সেই অ্যাক্সনগুলি দ্রুত ডিপোলারাইজ করে ও স্নায়ু আবেগকে দ্রুত পরিবাহিত করে।

মায়োলিন আবরণীযুক্ত এবং মায়েলিন আবরণীবিহীন স্নায়ুতন্তুতে স্নায়ু আবেগের পরিবহনের তফাৎ আছে।

1. মায়েলিন আবরণীবিহীন স্নায়ুতন্তুতে স্নায়ু আবেগের পরিবহন ঃ 2(a) চিত্রে বিশ্রামরত অবস্থায় স্নায়ুতন্তুর অবস্থা দেখানো হয়েছে। 2(B) চিত্রে নার্ভতন্তুর মধ্যাংশের উত্তেজিত অবস্থা দেখানো হয়েছে, অর্থাৎ অ্যাক্সনের মধ্যাংশে সোডিয়াম আয়নের ভেদ্যতা হঠাৎ বেড়ে যায়। তীরচিহ্নিত অংশগুলি স্থানীয় তড়িৎ-প্রবাহের পথ (total circuit) নির্দেশ করে যা ডিপোলারাই জড় অ্যাক্সন ঝিল্লী ও বিশ্রামরত অ্যাক্সন ঝিল্লীর মধ্যে প্রদক্ষিণ করে। ধনাত্মক বৈদ্যুতিক শক্তি ঝিল্লীর ডিপোলারাইজড অংশে মাধ্যমে সোডিয়াম আয়নের দ্বারা ঝিল্লীর ভেতরে প্রবেশ করে। এই ধনাত্মক শক্তি সীমারেখা মান (threshold value) অতিক্রম করলে ক্রিয়া বিভব সৃষ্টি হয়। ফলে ঐ উত্তেজিত স্থানটি সক্রিয় বা উদ্দীপিত হয়। চিত্র 2C ও D তে দেখানো হয়েছে কিভাবে ক্রিয়া বিভব আস্তে আস্তে অ্যাক্সনঝিল্লী বরাবর বিস্তারিত হয়। সর্বদাই ডিপোলারাইজড অঞ্চল ও তার সংলগ্ন অ্যাক্সনঝিল্লীর মধ্যে স্থানীয় তড়িৎ-প্রবাহের পথ (local circuit) সৃষ্টি হয় ও সংলগ্ন অঞ্চলটি

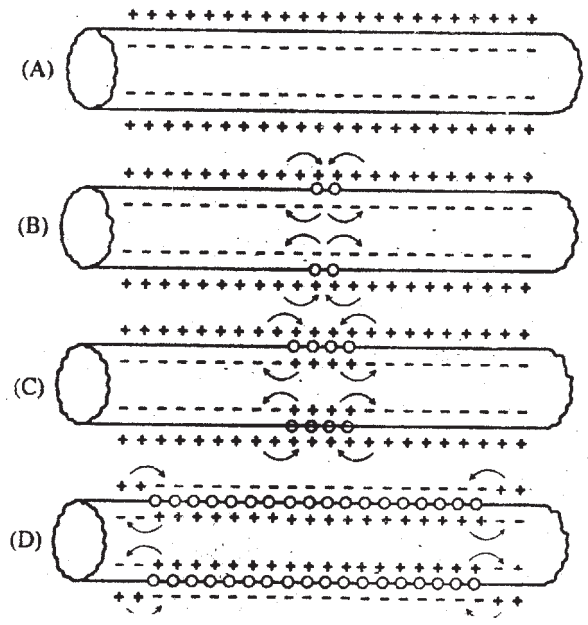

চিত্র নং 9 ঃ পরিবহনকারী তন্তু বরাবর ক্রিয়াবিভবের দ্বিমুখী বিস্তারণ

ডিপোলারাইজড অঞ্চলে পরিণত হয়। এইভাবে ডিপোলারাইজেশন পদ্ধতিটি পুরো অ্যাক্সনতন্তু বরাবর প্রবাহিত হয় (চিত্র নং 9)।

2. **মায়েলিন আবরণীযুক্ত স্নায়ুতন্তুকে স্নায়ু আবেগের পরিবহণ ঃ** সাধারণত বড় স্নায়ুতন্তুগুলি মায়েলিন আবরণীযুক্ত এবং অপেক্ষাকৃত ছোট স্নায়ুতন্তুগুলো মায়েলিন আবরণীবিহীন। একটি সাধারণ স্নায়ুকান্ডে মায়েলিন আবরণীবিহীন স্নায়ুতন্তুর সংখ্যা মায়েলিন আবরণীযুক্ত স্নায়ুতন্তুর সংখ্যার দ্বিগুণ হয়।

মায়েলিন আবরণীটি স্ফিংগোমায়েলিন নামক লিপির দ্বারা নির্মিত। স্ফিংগোমায়েলিন হল আয়ন কুপরিবাহী পদার্থ। ফলে অ্যাক্সনঝিল্লীর মায়েলিন আবরণী দ্বারা আবৃত অংশের মাধ্যমে কোনও আয়নের চলাচল ঘটে না। আয়নের চলাচল একমাত্র র‍্যানভিয়ার পর্বের মাধ্যমেই ঘটে। ফলে শুধুমাত্র এই পর্বের ক্রিয়া বিভব সৃষ্টি হয়। ক্রিয়া বিভব এক পর্ব থেকে পরবর্তী পর্বে উল্লম্ফন পদ্ধতিতে পরিবাহিত হয় (Saltatory conduction) এক্ষেত্রে

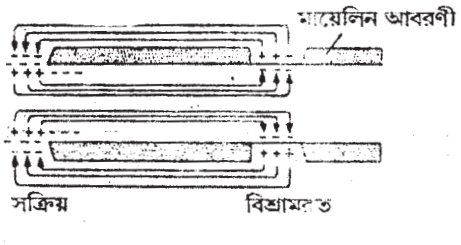

চিত্র নং 10.1 ঃ উল্লম্ফন পরিবহন

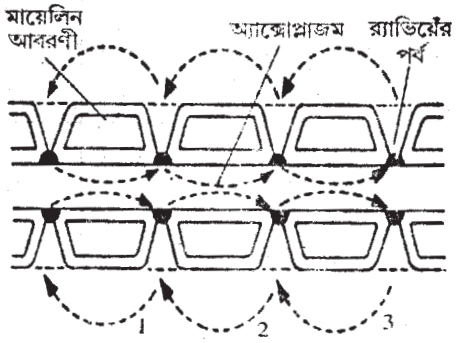

চিত্র নং 10.2 ঃ উল্লম্ফন প্রেরণ

তড়িৎ-প্রবাহ এক পর্ব থেকে পরবর্তী পর্বের মধ্যে চক্রাকারে প্রবাহিত হয়। ফলে স্নায়ু আবেগ অ্যাক্সন বরাবর এক পর্ব থেকে পরবর্তী পর্বে লাফিয়ে চলে, সেই কারণেই এই পদ্ধতিতে স্নায়ু আবেগ পরিবহনকে উল্লম্ফন পরিবহন (Saltatory conduction) বা পর্ব থেকে পর্ব-পরিবহন (Node to node conduction) বলা হয় (চিত্র নং 10.1 & 10.2)।

এই পদ্ধতিতে স্নায়ু আবেগের পরিবহনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন—

1. অ্যাক্সন বরাবর পর্ব থেকে পরবর্তী পর্বে লাফিয়ে চলে বলে এই পদ্ধতিতে স্নায়ু আবেগ পরিবহনের গতি অনেক বেশি, প্রায় 5 থেকে 50 গুণ। এছাড়া অমায়েলিন তন্তুর তুলনায় র‍্যানভিয়ার পর্বের ভেদ্যতা 500 গুণ বেশি কারণ এই স্থানে Na নালীর (Na+ channel) সংখ্যা সর্বাধিক। এই কারণেও অমায়েলিন তন্তুর তুলনায় মায়েলিন তন্তুতে উদ্দীপনা পরিবহনের গতি প্রায় 50 গুণের অধিক।

2. স্নায়ু আবেগের উল্লম্ফন পদ্ধতিতে পরিবহন অ্যাক্সনের জন্য শক্তি সঞ্চয় করে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্নায়ুতন্তুর পর্বগুলি ডিপোলারাইজড হয় ফলে আয়নের চলাচলের পরিবর্তন খুব কম জায়গায় ঘটে। সেক্ষেত্রে মায়েলিন আবরণহীন অ্যাক্সনে প্রতিটি বিন্দু ডিপোলারাইজড হয়।

3. মায়েলিন আবরণী অত্যন্ত কুপরিবাহী হওয়ায় এবং ধারণ ক্ষমতা শতকরা 50 ভাগ কমে যাওয়ায় রিপোলারাইজেশন পদ্ধতির সময় খুবই সামান্য পরিমাণ আয়নের চলাচল ঘটে। সেই কারণে ক্রিয়া বিভব সৃষ্টির শেষে যখন সোডিয়াম চলাচলের পথ (Na channels) বন্ধ হতে শুরু করে তখন রিপোলারাইজেশন অতি দ্রুত ঘটে যে পটাসিয়ামের যাতায়াতের পথ (Potassium channel) রুদ্ধ থাকে। ফলে মায়েলিন আবরণীযুক্ত স্নায়ুতন্তুতে আবেগের পরিবহনে পটাসিয়াম আয়নের সেরকম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই।

3.5.5 স্নায়ুসন্ধি ঃ

স্নায়ুতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল এক স্নায়ুকোষ থেকে অপর স্নায়ুকোষে বার্তা (information) প্রেরণ করা। সংবাদ বা সঙ্কেত (signal) স্নায়ুকোষের অ্যাক্সনের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। একটি অ্যাক্সনের অন্য নার্ভকোষের সঙ্গে মিলন বিন্দুকে **সন্ধিস্থান** বা **স্নায়ুসন্ধি (Synapse)** বলা হয়। অর্থাৎ দুটি স্নায়ুকোষের সংযোগকারী অঞ্চলকে **স্নায়ুসন্ধি (Synapse)** বলা হয়। স্নায়ুসন্ধির মাধ্যমে একটি স্নায়ুকোষ থেকে অপর একটি স্নায়ুকোষে আবেগ (impulse) প্রেরিত হয়। স্নায়ুসন্ধির মাধ্যমে স্নায়ু আবেগের পরিবহনকে স্নায়ু সন্ধিগত প্রেরণ ব্যবস্থা (Synaptic transmission) বলা হয়।

3.5.5.1 স্নায়ুসন্ধির গঠন (Structure of Synapse) :

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে স্নায়ুসন্ধির গঠন বিস্তারিতভাবে জানা গেছে।

(i) স্নায়ুসন্ধিতে স্নায়ুকোষের অ্যাক্সন শাখাপ্রশাখা সৃষ্টি করে; শাখাপ্রান্তগুলির শেষ অংশ স্ফীত ও ডিম্বাকৃতি। স্ফীত অঞ্চলকে সন্ধিস্ফীতি (Synaptic knob) বলা হয়।

(ii) সন্ধিস্ফীতি অন্য স্নায়ুকোশের কোষদেহ বা ডেনড্রাইটের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে। যদিও সাধারণত স্নায়ুকোষ দুটির মধ্যে কোনও প্রোটোপ্লাজমীয় যোগসূত্র থাকে না, তবে কোনও কোনও সন্ধিস্থানে কতগুলি আন্তর সন্ধিসমূহের (Intersynaptic filament) সন্ধান পাওয়া যায়।

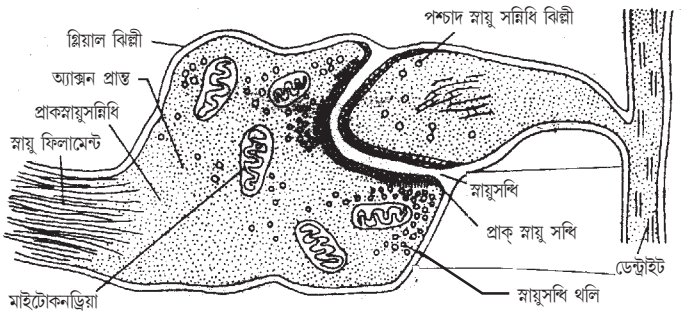

চিত্র নং 11 ঃ স্নায়ুসন্ধির গঠন

(iii) সন্ধিস্ফীতির কোষঝিল্লীকে প্রাক্স্নায়ুসন্ধি ঝিল্লী (Postynaptic membrane) বলে।

(iv) পরবর্তী স্নায়ুকোষের কোষ দেহ বা ড্রেনড্রাইটের কোষ পর্দাকে অধঃ স্নায়ুসন্ধি বা পশ্চাৎ স্নায়ুসন্ধি ঝিল্লী (Post Synaptic membrane) বলা হয়।

(v) যে স্নায়ুসন্ধিতে আন্তর সন্ধিসূত্র উপস্থিত সেটাই প্রাক্ স্নায়ুসন্ধি ঝিল্লী। এই ঝিল্লী অধঃসন্ধি ঝিল্লীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে।

(vi) প্রাক্স্নায়ুসন্ধি ঝিল্লী ও অধঃসন্ধি ঝিল্লীর মধ্যে 200A দূরত্ব থাকে। এই ফাঁককে স্নায়ুসন্ধি ফাটল (Synaptic cleft) বলা হয়।

(vii) সন্ধিস্ফীতিকে প্রচুর সংখ্যক মাইটোকন্ড্রিয়া এবং ঝিল্লী সংলগ্ন অংশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলি (vesicles) দেখতে পাওয়া যায়। এই থলিগুলিকে **স্নায়ুসন্ধি থলি (Synaptic vesdicle)** বলা হয়।

(viii) থলিগুলি বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ বা প্রেরক পদার্থে পূর্ণ থাকে। এই পদার্থগুলিকে প্রেরক বা ট্রান্সমিটার (transmitter) বস্তু বলা হয়। এই প্রেরক বস্তুর নিঃসরণের মাধ্যমে উদ্দীপনা এক স্নায়ুকোষ থেকে অপর স্নায়ুকোষে প্রেরিত হয় (চিত্র নং 11)।

3.5.5.2 স্নায়ুসন্ধির মাধ্যমে উদ্দীপনা পরিবহন (Mechanism of Synaptic transmission) : স্নায়ুসন্ধির মাধ্যমে আবেগ বা সংবাদ প্রেরণ দু'ভাবে হতে পারে— (i) বৈদ্যুতিক পদ্ধতি ও (ii) রাসায়নিক পদ্ধতি।

(i) **বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে স্নায়ুসন্ধির মাধ্যমে আবেগ প্রেরণ ব্যবস্থা ঃ** এক্ষেত্রে স্নায়ুসন্ধির প্রি ও পোষ্ট

সাইন্যাপ্টিক ঝিল্লীর ব্যবধান অত্যন্ত কম হয়। দুই ঝিল্লীর এই মধ্যবর্তী ফাঁকা অংশটিকে ফাঁক সন্ধিস্থান (gap junction) বলা হয়। এই অঞ্চলে রোধশক্তি (resistance) খুব কম এবং স্নায়ুসন্ধির চারপাশে রোধশক্তি বেশী থাকায় আবেগ শুধুমাত্র এই অভিমুখে গমন করে, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে না। বৈদ্যুতিক স্নায়ুসন্ধিগত প্রেরণ ব্যবস্থায় আবেগ সঞ্চালিত হতে বেশী দেরী হয় না এবং প্রেরণ ব্যবস্থার কোনও প্রেরক বস্তু নিঃসৃত হয় না। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে এই ধরনের আবেগ প্রেরণ ব্যবস্থা দেখা যায় (চিত্র নং 12)।

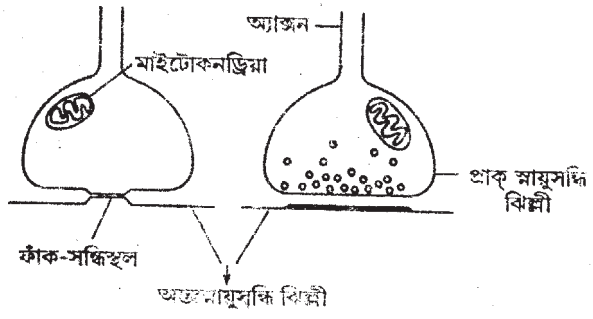

চিত্র নং 12 ঃ বিভিন্ন স্নায়ুসন্ধির প্রেরণগত পার্থক্য— বৈদ্যুতিক (বাঁদিকে) ও রাসায়নিক (ডানদিকে)

(ii) **রাসায়নিক পদ্ধতিতে স্নায়ুসন্ধির মাধ্যমে আবেগ প্রেরণ ব্যবস্থা ঃ** অ্যাক্সন প্রান্তে স্নায়ু ক্রিয়া বিভব (Nerve action potential) আসার পর কতকগুলি ঘটনা ঘটে ফলে উদ্দীপকধর্মী বা প্রতিরোধধর্মী প্রেরক পদার্থ নিঃসরিত হয়ে স্নায়ুসন্ধিতে স্নায়ুপ্রবাহ প্রেরিত হয়।

সম্ভবত প্রেরক পদার্থ অ্যাক্সন প্রান্তে সংশ্লেষিত হয়ে স্নায়ুসন্ধি থলিতে জমা থাকে। বিশ্রামরত অবস্থায় প্রেরক বস্তু ধীরে ধীরে স্নায়ুসন্ধি থলি থেকে নির্গত হয় ফলে স্নায়ু উদ্দীপনা প্রেরণ করতে পারে না। কিন্তু ক্রিয়া বিভব অ্যাক্সন প্রান্তে আসার পরই অধিক পরিমাণে প্রেরক বস্তু নিঃসৃত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রেরক বস্তু হিসাবে অ্যাসিটাইল কোলিন কাজ করে, এছাড়া নরএপিনেফ্রিন বা নরঅ্যাড্রিনালিন, সেরোটোনিন, ডোপামিন, গ্লুটাসিক অ্যাসিড, r- অ্যামাইনো বিউটেরিক অ্যাসিড (GABA) ইত্যাদি উদ্দীপক প্রেরক পদার্থরূপে কাজ করতে পারে।

উদ্দীপনা পরিবহনে প্রেরক বস্তুর ভূমিকা ঃ

(i) অ্যাক্সন বরাবর স্নায়ু উদ্দীপনা প্রাক্সন্ধি অঞ্চলে পৌঁছায়।

(ii) প্রাক্সন্ধি ঝিল্লীর ভেদ্যতা (membrane permeability) পরিবর্তিত হয়।

(iii) Na^+ ও Ca^{++} সন্ধিস্ফীতিতে প্রবেশ করে।

(iv) Ca^{++} এর প্রভাবে স্নায়ুসন্ধি থলি থেকে প্রেরক পদার্থের নিঃসরণ ঘটে।

(v) প্রেরক পদার্থগুলি 'স্নায়ুসন্ধি ফাটল' (Synaptic cleft) অতিক্রম করে অধঃসন্ধি ঝিল্লীতে অবস্থিত গ্রাহক স্থানের (receptor site) সঙ্গে যুক্ত হয়।

(vi) অধঃসন্ধি ঝিল্লী ভেদ্যতা পরিবর্তিত হয়।

(vii) Na^+ — K^+ নালী উন্মুক্ত হয়।

(viii) কোষ বহিঃস্থ তরল থেকে প্রধানতঃ Na^+ অধঃসন্ধি ঝিল্লী ভেদ করে স্নায়ুকোষে প্রবেশ করে।

(ix) স্নায়ুসন্ধির পরের স্নায়ুকোষটি উদ্দীপিত হয় এবং ক্রিয়া বিভবের সৃষ্টি হয়। প্রাক্স্নায়ুসন্ধি অঞ্চলেই প্রেরক পদার্থ থাকে বলে উদ্দীপনা সর্বদা প্রাক্স্নায়ুসন্ধি অঞ্চল থেকে অধঃসন্ধি অঞ্চলের দিকে পরিবাহিত হয়।

(x) সন্ধিস্ফীতি স্নায়ুসন্ধি থলি থেকে প্রতিরোধধর্মী প্রেরক পদার্থ নিঃসৃত হয় এবং অধঃস্নায়ুসন্ধি ঝিল্লীতে Cl^- আয়নের ভেদ্যতা বৃদ্ধি পায়।

(xi) অধঃস্নায়ুসন্ধির স্থিতিবিভব— 90m দেখায়।

(xii) উদ্দীপনা সৃষ্টির স্বল্পকালের মধ্যেই উৎসেচক দ্বারা প্রেরক পদার্থ বিনষ্ট হয় ও অধঃস্নায়ুসন্ধি ঝিল্লী পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়।

3.5.4 অনুশীলনী ঃ

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

(১) বিশ্রামকালীন বিভব কি ও তার পরিমাপ কত?

(২) ক্রিয়াবিভব কি? ক্রিয়াবিভবকালীন পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনগুলি কি?

(৩) সব কিছু বা কিছুই না প্রতিক্রিয়া এবং স্নায়ু আবেগ সৃষ্টির সীমারেখা বলতে কি বোঝ?

(৪) উল্লম্ফন পদ্ধতিতে স্নায়ু আবেগের পরিবহন কি ধরনের স্নায়ুতন্তুতে দেখা যায় এবং এটিকে কেন উল্লম্ফন পদ্ধতি বলা হয়।

(৫) স্নায়ুসন্ধি এবং স্নায়ুসন্ধিগত আবেগ প্রেরণ বলতে কি বোঝ?

3.6 সারাংশ

- পিট্যুইটারী গ্রন্থি কমপক্ষে দশটি হরমোন ক্ষরণ করে এবং অন্যান্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণে অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই এই গ্রন্থিটিকে 'মাস্টার গ্ল্যান্ড' (master gland) বলা হয়।
- মানুষের বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির মধ্যে থাইরয়েড হরমোন একটি বৃহৎ গ্রন্থি। এটির দুই প্রকারের কোষ বর্তমান— ফলিকিউলার ও প্যারাফলিকিউলার। প্রথমোক্ত কোষগুলি T3 ও T4 যাদের থাইরক্সিন বলে, সেই হরমোন ক্ষরণ করে। দ্বিতীয় কোষটি ক্যালসিটোনিন ক্ষরণ করে। বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় থাইরয়েড হরমোনগুলির ভূমিকা আছে।
- উদ্দীপনা গ্রহণ, সৃষ্টি ও পরিবহন যে বিশেষ কলার মাধ্যমে হয় তাকে স্নায়ুকলা বলে।
- স্নায়ু উদ্দীপিত হলে উদ্দীপনা স্নায়ু তন্তুর মধ্যে পরিবাহিত হয়।
- মায়েলিন আবরণীযুক্ত এবং মায়েলিন আবরণীবিহীন স্নায়ুতন্তুতে স্নায়ু আবেগের পরিবহনের তফাৎ আছে।
- মায়েলিন আবরণীযুক্ত স্নায়ুতন্তুতে স্নায়ু আবেগের পরিবহন পদ্ধতিকে উল্লম্ফন পরিবহন বা পর্ব থেকে পর্ব পরিবহন বলা হয়।
- দুটি স্নায়ুকোষের সংযোগকারী অঞ্চলকে স্নায়ুসন্ধি (Synapse) বলে।
- স্নায়ুসন্ধির মাধ্যমে আবেগ বা সংবাদ প্রেরণ দুইভাবে হতে পারে— বৈদ্যুতিক পদ্ধতি ও রাসায়নিক পদ্ধতি।
- হিমোগ্লোবিন শ্বসনজনিত গ্যাস অর্থাৎ অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- অক্সিজেন হিমোগ্লোবিনের 'হিম' অণুর সাথে যুক্ত হয় অক্সিহিমোগ্লোবিন গঠন করে এবং রক্তে অক্সিহিমোগ্লোবিন হিসাবে পরিবাহিত হয়।
- কার্বন ডাই অক্সাইড হিমোগ্লোবিনের গ্লোবিন প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয় কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন গঠন করে এবং রক্তে কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন হিসাবে পরিবাহিত হয়।
- লোহিত রক্ত কণিকাকে A ও B অ্যাগ্লুটিনোজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ভিত্তিতে বিভাজনকে রক্তের ABO রক্তশ্রেণী বলে।
- এই রক্ত শ্রেণী চারটি ভাগে বিভক্ত— A, B, AB এবং O।
- AB রক্তশ্রেণীকে সার্বজনীন গ্রহীতা এবং O রক্তশ্রেণীকে সার্বজনীন দাতা বলা হয়।

- মানুষের লোহিত কণিকায় আর একটি অ্যান্টিজেন পাওয়া যায় যার নাম 'Rh শর্ত' (Rh factor)।
- Rh ব্লাড গ্রুপ তিনটি জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (C,D,E) কার্যত D জীনের দুটি অ্যালিল দ্বারাই Rh রক্ত গ্রুপটি নিয়ন্ত্রিত হয়।
- DD বা Dd জেনোটাইপ যুক্ত ব্যক্তিরা Rh^+ হয়। dd জেনোটাইপ যুক্ত ব্যক্তিরা Rh হয়।

3.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১) অগ্রপিট্যুইটারী গ্রন্থি ক্ষরিত বিভিন্ন হরমোনের নাম উল্লেখ কর এবং এদের যে কোন দুটি কাজ ব্যাখ্যা কর।

২) থাইরয়েড নিঃসৃত হরমোনের কাজ বর্ণনা কর।

৩) স্নায়ুকোষে ক্রিয়াবিভবকালীন পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনগুলিকে বর্ণনা কর।

৪) স্নায়ুসন্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার স্নায়ু আবেগের প্রেরণের বর্ণনা দাও।

৫) শ্বসনজনিত গ্যাস অর্থাৎ অক্সিজেন ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড পরিবহন কিভাবে রক্তের মাধ্যমে ঘটে তা বর্ণনা কর।

৬) তিন প্রকার অ্যালিনের ভিত্তিতে ABO রক্তশ্রেণীর বিভিন্ন জেনোটাইপ ও ফেনোটাইপের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

৭) Rh ফ্যাক্টরের গুরুত্ব কি?

3.8 উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

STH — কোষ ও কলার সার্বিক বৃদ্ধি।

ACTH — কর্টিকোস্টেরয়েড সংশ্লেষ বৃদ্ধি করে।

ADH — বৃক্ক দ্বারা জল পুনঃশোষণ বৃদ্ধি করে।

থাইরক্সিন — দেহের বিপাকীয় হার বৃদ্ধি করে।

LH — ডিম্বাশয় থেকে ডিম্ব নিঃসরণ।

ক্যালসিটোনিন — ক্যালসিয়াম আয়নের ঘনত্ব হ্রাস।

অনুশীলনী ২

(১) 3.3.2 দ্রষ্টব্য, (২) 3.3.2 দ্রষ্টব্য, (৩) 3.3.2 দ্রষ্টব্য, (৪) অক্সিজেন হিমোগ্লোবিনের 'হিম' অণুর সাথে যুক্ত হয় এবং কার্বনডাইঅক্সাইড হিমোগ্লোবিনের গ্লোবিন অংশের সাথে যুক্ত হয়। (৫) 3.3.1 দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী ৩

(i) O শ্রেণী রক্ত, AB শ্রেণী রক্ত।

(ii) B অ্যাগ্লুটিনিন

(iii) Rh^-, Rh^+

অনুশীলনী ৪

(১) স্নায়ুতন্তু ঝিল্লীর উভয় পার্শ্বে আধান বা আয়নের পার্থক্যের ফলে একটি স্থির বিভব পার্থক্য সৃষ্টি হয়। একে স্থিতি বিভব বা বিশ্রামকালীন বিভব বলে।এর পরিমাপ (–90)mv.

(২) 3.5.2 এবং 3.5.3 দ্রষ্টব্য
(৩) 3.5.1 দ্রষ্টব্য
(৪) 3.5.4 দ্রষ্টব্য
(৫) 3.5.5 দ্রষ্টব্য

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

(১) 3.2.1.2 দ্রষ্টব্য
(২) 3.2.2.3 দ্রষ্টব্য
(৩) 3.5.3 দ্রষ্টব্য
(৪) 3.5.5.2 দ্রষ্টব্য
(৫) 3.3.2 দ্রষ্টব্য
(৬) 3.4.1 দ্রষ্টব্য
(৭) 3.4.2 দ্রষ্টব্য